তরঙ্গ ওঠে

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

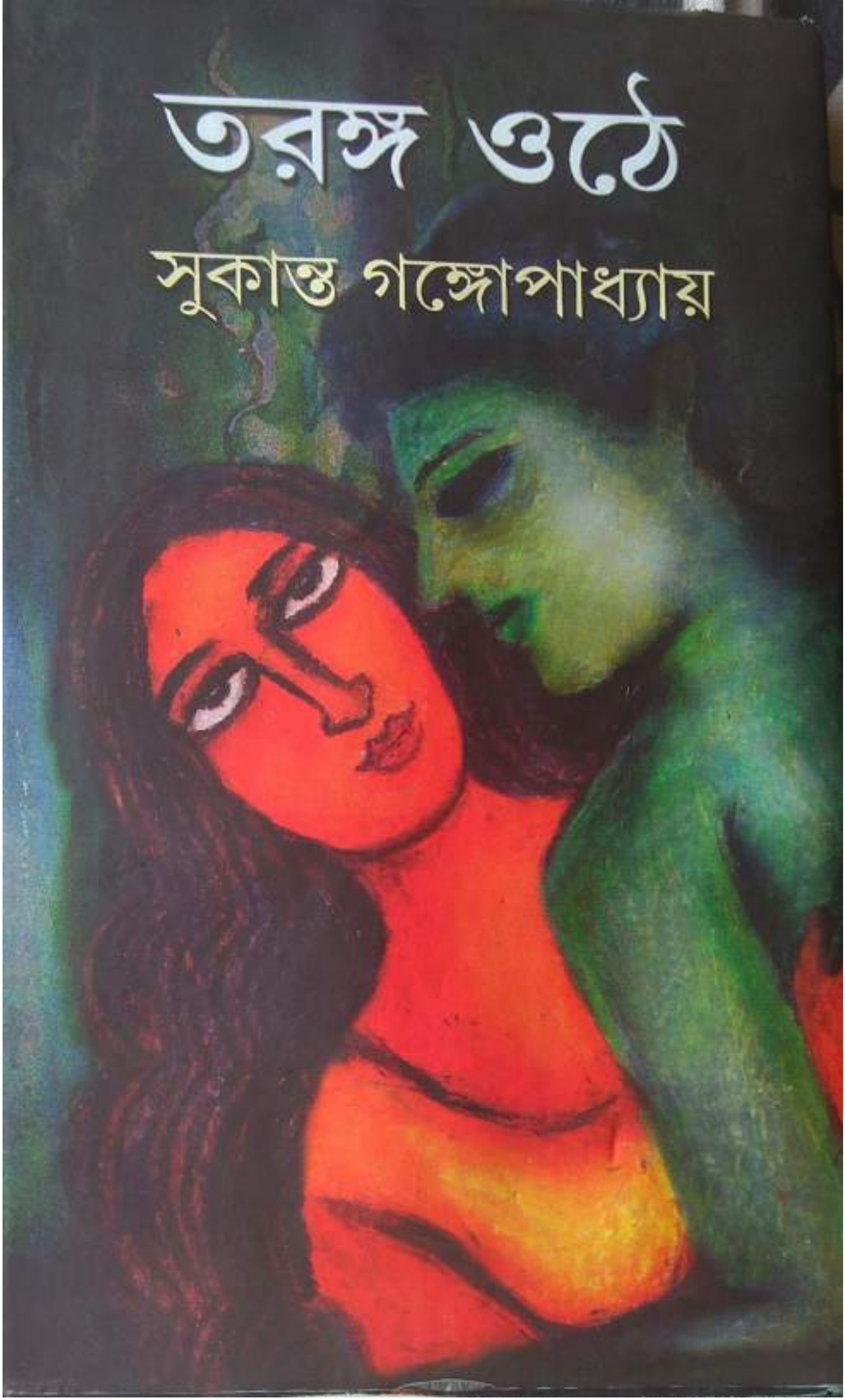

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তবুও বেঁচে

সুকান্ত ভট্টাচার্য

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তরঙ্গ ওঠে

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

সদ্য মাতৃহারা হয়েছে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র সায়র। প্রেমিকা হিমিকার মায়ের কাছে সে জানতে পারে তার বাবা দেবাংশুর জীবনে রয়েছে দ্বিতীয় এক নারী, জয়িতা নাগ। তিনি কি এবার আসছেন মায়ের জায়গা নিতে? প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে সায়রের মনে। জয়িতা নাগকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ভাড়াটে খুনির সন্ধানে বেরোয়... এভাবে কাহিনিটি টানটান উত্তেজনার মধ্যে এসে পড়লেও, তা শেষমেশ সমস্ত অস্থিরতাকে অতিক্রম করে এক সুগভীর রূপ ধারণ করে। মানুষের মনের জটিল নকশা আঁকতে শুরু করেন লেখক।

দাম্পত্য জীবনের আপাত শান্ত স্বচ্ছতার আড়ালেও যে লুকিয়ে থাকে গোপনীয়তার এক অমোঘ খেলা, একথা বলতে গিয়ে লেখক টান দিয়েছেন জীবন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার মর্মমূলে। প্রিয়জন চলে গেলেও, ভালবাসা মায়া মমতা কিন্তু থেকে যায় পৃথিবীতে। মানুষের চাওয়া না চাওয়ার ওপর নির্ভর না করে জীবনে তরঙ্গ ওঠে আবার, অনিবার্যভাবে। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা কি পারবে তা প্রতিহত করতে, নাকি ভেসে যেতে হবে জীবনের বহমানতায়?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তরঙ্গ ওঠে

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

No. ৩২৭৭.১৮-২
Date ২২/৩/২৮

BALLYGUNGE INSTITUTE LIBRARY

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ত র ঙ্গ ও ঠে
প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪২০

— একশ পঞ্চাশ টাকা—

প্রচ্ছদপট অঙ্কন :
দেবযানী রায় ঘোষাল

TARANGA OTHE
A novel by Sukanta Gangopadhyay.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan De Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 150/-

ISBN : 978-93-5020-115-2

Website : www.mitraandghosh.co.in
www.golposwalpo.com

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শব্দগ্রন্থন
টেকনোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ম্যাজিক প্রিন্টার্স, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ কর্তৃক মুদ্রিত

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

উৎসর্গ

শ্রীমতী জয়ন্তী বৈরাগী
শ্রী গৌর বৈরাগী
প্রীতিভাজনেষু

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তরঙ্গ ওঠে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book

boierpathshala.blogspot.com

BALLYGUNGE INSTITUTE LIBRARY
No. 32599. ১৮৯
Date ২৯/৩/২৫

পার্ক স্ট্রিটের বার কাম রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল সায়র আর রনো। রোদের তেমন তেজ নেই। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চারপাশে সতর্ক চোখ বোলায় সায়র, তাকে কেউ লক্ষ করছে না তো? না, সেরকম কাউকে চোখে পড়ল না। পড়ার কথাও না, তবু সজাগ থাকা ভালো। সামনে রনো একমনে হেঁটে যাচ্ছে, পিঠে ব্যাকপ্যাক। সায়রেরও তাই। যে কেউ দেখলেই বুঝবে কলেজস্টুডেন্ট। সায়রের সতর্কতা কিন্তু ছাত্রবয়সে বার থেকে বেরোনোর জন্য নয়, এখানে সে আগেও এসেছে। মদ খাওয়া নিয়ে তার কোনও সঙ্কোচ বা অপরাধবোধ নেই। এখন এই মুহূর্তের সাবধানতার কারণ অন্য। আজ থেকে সায়রের জীবনে একটা প্রিকশনারি পিরিয়ড শুরু হচ্ছে। এমনটা কতদিন চলবে, জানে না।

—কী হল, পা চালা! পিছন ফিরে তাড়া দিল রনো। দুজনের মধ্যে গ্যাপ পড়ে গেছে খানিকটা। তড়িৎপায়ে গ্যাপটা মেকআপ করল সায়র। আর একবার আশপাশটা দেখে নিতে গিয়ে চোখ আটকাল সিগারেটের দোকানে, একটা টুপি পরা লোক তার দিকে চেয়ে আছে।

—চলে আয় তাড়াতাড়ি। এখানে প্যাসেঞ্জার তুলতে দেয় না।

ট্রাফিক পুলিশের কথা বলছে রনো। ফুটপাত থেকে নেমে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছে। পিছনের দরজা খুলে ঢুকে গেল ভিতরে। সায়রও দৌড়ে গিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

উঠে পড়ে। দরজা বন্ধ করার পর দেখে, বারমুডা, ব্লেজার, কালো পানামা হ্যাট পরা লোকটা এখনও তাকে চোখ ছাড়া করেনি। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করল, কোথায়...?

—মানিকতলা। বলল রনো।

গিয়ার চেঞ্জ করে গাড়িতে স্পিড দিল ড্রাইভার। সামনে ক্রসিং। সিগন্যাল গ্রিন। টুপিপরা লোকটা কে? সায়রের চেনা বৃত্তে পানামা হ্যাট পরা কেউ নেই। লোকটা কেন ওভাবে দেখছিল সায়রকে? মাঝবয়সী লোকটার চোখে ছিল লোলুপ দৃষ্টি। হোমো হতে পারে। সায়রকে টার্গেট হিসেবে দেখছিল। এই অভিজ্ঞতা হামেশাই হয় সায়রের। এর জন্য তার চকলেট বয় চেহারাটা দায়ী। এইসব দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে সেকেন্ডখানেকের মধ্যে মানুষটাকে ভুলে যায় সায়র। কিন্তু পানামা হ্যাটকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়েও পারছে না। যে উদ্দেশ্যেই লোকটা ওকে দেখুক, সাক্ষী তো থেকে গেল। দেখল, দুটি স্কুল অথবা কলেজে পড়া ছেলে, একটার সময় পার্ক স্ট্রিট থেকে ট্যাক্সিতে উঠল। ট্যাক্সির নাম্বারটাও কি খেয়াল করেছে? কোনও অভিসন্ধি না থাকলেও, তথ্যটা রয়ে গেল লোকটার কাছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের জন্য ওইটুকুই যথেষ্ট। সায়ররা যে অভিযানে বেরিয়েছে আইনের চোখে তা মারাত্মক অপরাধ। যদিও রনো সম্ভাব্য অপরাধকাণ্ডের পুরোটা জানে না। জানলে হয়তো আসতে চাইত না সঙ্গে। অপরাধটা নিজে ঘটাবে না সায়র, বরাত দিতে যাচ্ছে একজনকে। লোকটা রনোর চেনা পরিচিত। কন্ট্র্যাক্টটা দেওয়ার পরই সায়র ফ্রি। অপরাধটার সংঘটনে তার আর কোনও অ্যাক্টিভিটি থাকবে না। ঘটনাটা ঘটে গেলে বরাতপ্রাপ্তকে টাকা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই। সংঘটিত অপরাধের সমস্ত সূত্র ধরে একদিন ঠিক পৌঁছে যাবে পানামা হ্যাট পরা লোকটার কাছে। লোকটা শনাক্ত করে দেবে রনো, সায়র এবং ট্যাক্সিটাকে... ভাবনার উসখুসানি ছড়িয়ে পড়ে সায়রের শরীর জুড়ে। ওর নড়াচড়ায় রনো বলে উঠল, ফিলিং টেনসড? বি কুল ইয়ার। যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, মাখনের মতো কাজ হয়ে যাবে।

—ইট্‌স অলরাইট। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে সায়র চলন্ত ট্যাক্সির জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। কাজটা ঠিক কী, পুরোপুরি জানলে রনো এত রিল্যাক্সড মুডে থাকতে পারত না। যতই পেটে বিয়ার থাকুক। আবার এই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বিয়ারের কারণেই কি সায়র একটু বেশিই উদ্বিগ্ন হচ্ছে? সে কী ভেবেছিল, বার থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে পা রাখলেই চারপাশের লোক চোখ বুজে নেবে? ওরা ট্যাক্সি করে বেরিয়ে গেলে চোখ খুলবে পাবলিক? অপরাধ কখনও ফুল প্রুফ হয় না। একটু আধটু ঝুঁকি থেকেই যায়। দুনিয়ায় নিরন্তর কত অপরাধই তো ঘটে চলেছে, শাস্তি পায় ক'জন? শতাংশের হিসেবেও হয়তো আসবে না। পৃথিবীর কোনও দেশেরই প্রশাসনের সেই স্ট্রেংথ নেই যে, ধরে ধরে প্রত্যেক অপরাধীকে শাস্তি দেবে। এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে তো নয়ই। মানুষ অজান্তেই আড়াল করে রাখে দুষ্কৃতীকে। নেহাত কপাল খারাপ থাকলে, উপরমহলের স্বার্থে ঘা অথবা মিডিয়ার নজর পড়ে গেলে, পুলিশ গন্ধ শুঁকে শুঁকে পৌঁছে যায় অপরাধী অবধি। এক্ষেত্রে সায়র অনেক সাবধানতা নিয়েছে, অপরাধটা নিজের হাতে করবে না। টাকা দিয়ে করাবে। বিষয়টা থাকবে দুজনের মধ্যে, সে এবং যাকে দেওয়া হচ্ছে বরাত। যদি ক্ষীণতম সম্ভাবনা দেখে ব্যাপারটা তিনকান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রাস্তা থেকে পিছিয়ে আসবে সায়র। তখন অন্য পন্থা খুঁজতে হবে। রণদেবকে এই অপারেশনে সে ইনভলভ করতে চায় না। বাধ্য হয়ে প্রাথমিক স্টেজে সাহায্য নিতে হচ্ছে। রণদেব তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। সেই অর্থে সায়রের কোনও প্রিয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই। স্কুলবেলার গোড়ার দিকে ছিল। যত বড় হয়েছে, ফিকে হয়ে গেছে সেসব সম্পর্ক। তাদের সঙ্গে সায়রের ওয়েভ লেংথ এখন আর ম্যাচ করে না। সায়রের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ একজনই। তাকে বন্ধু, অভিভাবক, আইকন যেমন ইচ্ছে ভাবা যায়। সেই মানুষটাই এখন শত্রু হতে চলেছে সায়রের। তাকে এতটাই ভালোবাসে সায়র, শত্রুতা করার সুযোগই দেবে না। শত্রুতার সমস্ত সম্ভাবনা নস্যাৎ করতেই সায়র দ্বারস্থ হয়েছে রনোর। ব্যক্তিগত এই সংকটের কথা রনোকে জানায়নি সায়র, অন্য একটা গল্প খাড়া করে সাহায্য চেয়েছে।

কলেজে রনো সেকেন্ড ইয়ার, সায়রের চেয়ে এক বছরের সিনিয়ার। ডিপার্টমেন্ট একই, তুলনামূলক সাহিত্য। রনোর লুক দেখে সাবজেক্ট আন্দাজ করা যাবে না। ছোট চুল, কানে দুল। বেশ ডাকাবুকো স্বভাবের। ইউনিয়ন-বাজি, অন্য কলেজে গিয়ে মারদাঙ্গা, সবেতেই সামনের সারিতে থাকে। সায়ররা কলেজে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রনো রীতিমতো মাস্তানি করে প্রায় নব্বই শতাংশের নাম নিজেদের ইউনিয়নে লিখিয়ে নেয়। ফ্রেশার্স

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ওয়েলকামে সায়র অনেকের মতো রনোর চোখে পড়ে। বাংলা ব্যান্ডের একটা পপুলার গান গেয়েছিল সায়র। প্রফেসার, স্টুডেন্ট সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করছিল। তখনই এক সময় রনো এসে পিঠ চাপড়ে বলেছিল, তুই তো শালা ট্যালেন্টেড পাবলিক। হেব্বি গাইলি! নাম করবি শিওর।

এরপর থেকে কমপ্লিমেন্টস্বরূপ রনো একটা ঠাট্টার নাম দিয়ে দিল সায়রকে, 'ব্যান্ডু' বলে ডাকত। কখনও সখনও কালীচরণ বলেও হাঁক দিত। ব্যান্ডের গান গেয়েছিল বলে 'ব্যান্ডু'। সংস্কৃতিবান অর্থাৎ কালচারাল ছেলে বলে 'কালীচরণ'। এই নাম অবশ্য কলেজে কমন, যারা কবিতা-টবিতা লেখে, ছবি আঁকে, গুরুগম্ভীর প্রোজ লেখে, এদের প্রায় সকলকেই খেয়ালখুশিমতো ওই নামে টন্ট করা হয়। মাস ছ'য়েক আগে সায়র ন্যাড়ামাথায় সদ্য গজানো চুল নিয়ে যখন কলেজে এল, টন্ট করে ডাকা নামগুলোও মরে গেল মায়ের মতো। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে মা-হারানো সায়রের কেয়ার নিতে শুরু করল নিজেদের ডিপার্টমেন্ট তো বটেই, অন্য ডিপার্টমেন্টেরও কয়েকজন। এই সহানুভূতির আবহে বড় শান্তি পেত সায়র। সম্প্রতি কলেজের বাইরের একটা ঘটনায় অসম্ভব অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে সায়রের মনে। গত রাতের আগের দু'রাত প্রায় নির্ঘুম কেটেছে তার। লাল চোখ নিয়ে কাল কলেজ মাঠে ক্লাস বাঙ্ক করে একা বসে ছিল সায়র। সামনে এসে উদয় হয় রণদেব, কীরে বস, কোনও লাফড়া? এত ফ্রাস্টু লাগছে কেন?

রনোর গলায় ছিল আন্তরিক উদ্বিগ্নতার ছোঁয়া। মুহূর্তে রনোকে ব্যবহার করার আইডিয়া মাথায় এসেছিল সায়রের। গল্প বানাতে শুরু করে, আমাদের এলাকার একটা ছেলেকে টাইট দিতে হবে, বুঝলি। এমন ঝাড় দিতে হবে, হিমিকার দিকে যেন ভুলেও না তাকায়।

হিমিকা সায়রের ফিঁয়াসে, ডিপার্টমেন্টের অনেকেই জানে। ইলেভেনের হিমিকাকে কলেজে একদিন নিয়ে এসেছিল সায়র। হিমিকার জোরাজুরিতে আনা। বলেছিল, কলেজে আমায় ইন্ট্রো করা জলদি। তোর প্রেমে পড়তে দেব না কাউকে তোকে যা দেখতে, হেভি টেনশন হয়।

হিমিকাও দামী শপিংমল-এর শো-কেস সুন্দরী। কলেজের বন্ধুরা সব কাত। বান্ধবীরা বলেছিল, না, সায়র এই মেয়ের সঙ্গে তোকেই একমাত্র মানায়। রনোর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছিল হিমিকার। রনো সায়রকে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বলেছিল ইউ আর সো লাকি ডুড। চারা অবস্থায় ভালো জাতের গাছ পেয়ে গেছিস! এখন খালি পরিচর্যা করে যাও।

সেই হিমিকাকে অন্য কোনও ছেলে বিরক্ত করছে শুনে স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে রনো বলেছিল, চল, মালটাকে কেলিয়ে দিই। এত টেনশন নিয়ে বসে আছিস কেন!

সায়র তখন বোঝায়, এলেবেলে ছেলে হলে তো আমিই পাঙ্গা নিয়ে নিতাম। এ শালা পার্টির অ্যাকশন স্কোয়াডের ছেলে। দু'চারটে লাশ নামিয়েছে শোনা যায়। একে আমাদের শায়েস্তা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। প্রফেশনাল গুণ্ডা-মাস্তান লাগাতে হবে।

গল্পটা খেয়ে গেল রনো। বলেছিল, সেরকম লোক আমার হাতে আছে। খরচ করতে পারবি?

ঠিক এই কানেকশনটাই চাইছিল সায়র। বলে উঠেছিল, খরচ নিয়ে ভাবিস না। কিন্তু তোর লোক কি কলকাতা থেকে আমাদের চাঁদপাড়ায় গিয়ে অ্যাকশন করে আসতে পারবে?

—আরেঃ, তোদের চাঁদপাড়া তো সেন্ট্রাল ক্যালকাটা থেকে গাড়িতে আধঘণ্টা বড়জোর চল্লিশ মিনিটের রাস্তা। আমার লোক ওয়েস্টবেঙ্গলে যেখানে বলবি, অ্যাকশন করে দিয়ে আসবে। অন্য রাজ্যে যায় না, পুলিশের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা নেই বলে। পার্টি থেকে ওকে দিয়ে রেগুলার কাজ করানো হয়।

রনোর কথায় ভরসা পেয়েছিল সায়র। মনে হয়েছিল তার অভিসন্ধির সফল প্রয়োগ রনোর মাধ্যমেই সম্ভব। গতকালই দুজনের কথা হয়ে গিয়েছিল, পার্ক স্ট্রিটে দু বোতল বিয়ার মেরে নিয়ে মানিকতলায় জলিদার কারখানায় যাবে। জুতোর কারখানা। জলিদাও নিজের হাতে কাজটা করবে না, করাবে অন্য কাউকে দিয়ে। কাকে দিয়ে করানো হল জানবে না পার্টি, এক্ষেত্রে সায়র। তার বিজনেস শুধু জলিদার সঙ্গে। তার মানে নিজের সামনে আর একটা বাফার পেয়ে গেল সায়র। অপরাধী যদি ধরা পড়েও যায়, সায়রের দিকে আঙুল তুলবে না। কারণ সায়রকে চেনেই না সে। আর জলিদার দিকে আঙুল যদি ওঠে, নিজেকে বাঁচানোর রাস্তা নিশ্চয়ই জানা আছে লোকটার। কারণ, এটাই তার প্রফেশন। মাথাটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে সায়রের। অপরাধটা অবশ্যই সাংঘাতিক, কিন্তু তার দিক থেকে ঝুঁকিটা এখন কম বলেই মনে হচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

প্রচুর সিগন্যাল খাচ্ছে তাদের ট্যাক্সি। এখনও অবধি পার্কসার্কাস পৌঁছতে পারল না। রনোর দিকে ঘাড় ফেরায় সায়র, বিয়ারের ধুনকি লেগে গেছে ব্যাটার। চোখ বুজে আরামে ঠেস দিয়ে আছে ট্যাক্সির সিটে। সায়রের ইচ্ছে রনো তাকে জলিদার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করিয়েই যেন চলে যায়। সায়রই বলবে তাকে যেতে। ট্যাক্সি ভাড়াও দেবে। বলবে, তুই আর এর ভিতর থাকিস না। খামোকা জড়িয়ে পড়বি কেন? বাকিটা আমি একাই হ্যান্ডেল করতে পারব।—আশা করা যায় প্রস্তাবে রাজি হবে রনো। তাদের তো আর গলায় গলায় বন্ধুত্ব নয়। রনো তার জন্য যতটা করল, এটাই অনেক। এই অনুগ্রহের পিছনেও কাজ করছে অসময়ে সায়রের মাতৃবিয়োগ। বন্ধুরা আর কতদিন এই শোকের কথা মনে রাখবে, কে জানে। সায়রের মনেও ফিকে হয়ে আসবে মায়ের স্মৃতি। বুক ভার-করা মন খারাপ বেশিদিন থাকবে না। এমনটাই হয় পৃথিবীতে। অতি আপনজনকেও দিব্যি ভুলে থাকে মানুষ। না থাকলে জীবন চলবে কী করে! এ সবই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। মায়ের অন্যান্য প্রিয়জনের মতো সায়রও 'মা' না থাকাটা মানিয়ে নেবে। সন্তান বলে হয়তো একটু দেরি হবে। বাড়তি এই কষ্টটুকু সে মাথা পেতে নিতে রাজি। কিন্তু শুধুমাত্র সন্তান পরিচয়ের কারণেই সায়র এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চলেছে যা তাকে নিক্ষিপ্ত করবে আত্মাবমাননার ভয়ঙ্কর গ্লানিতে। কেন এই শাস্তি মেনে নেবে সায়র? সে তো নিজের ইচ্ছেতে কারোর সন্তান হয়ে পৃথিবীতে আসেনি। মাত্র পাঁচদিন আগে সায়র তার জীবনে নেমে আসা আসন্ন বিপর্যয়ের কথা জানতে পেরেছে। বলেছেন হিমিকার মা। সেদিন ছিল সোমবার। হিমিকার ডান্স ক্লাস। প্রত্যেক সোমবারের মতো কলেজ থেকে ফিরে, চাঁদপাড়া স্টেশন থেকে নিজের বাইক নিয়ে সায়র গিয়েছিল হিমিকার ডান্স স্কুলে। হিমিকাকে বাইকের পিছনে বসিয়ে খানিকক্ষণ এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে বাবুঘাটে বসে নদীর দিকে তাকিয়ে আধঘণ্টা মতো গল্প। তারপর হিমিকাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। এই হল সায়রের প্রতি সোমবারের রুটিন। দুজনের সম্পর্ক দু'বাড়িতেই জানে। কখনও কোনও আপত্তি ওঠেনি। লাস্ট সোমবারটা রুটিনমাফিক কাটল না। হিমিকা ক্লাস করে বেরিয়ে সায়রকে বলেছিল, আজ কোথাও যাব না। স্ট্রেট বাড়ি। মায়ের কী যেন কথা আছে তোর সঙ্গে।

—হঠাৎ কী কথা রে? কোনও সুপাত্র পেয়ে তোর বিয়ে ঠিক করে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ফেললেন নাকি? আমাকে এবার নিজের পথ দেখতে বলবেন। হাসতে হাসতে বলেছিল সায়র। হিমিকা অযথাই সেন্টু খেয়ে গেল। বলল, তুই আমাদের ফ্যামিলিকে এত আনকালচার্ড ভাবিস নাকি? ক্লাস ইলেভেনে মেয়ের বিয়ের কথা ভাববে! তোর সঙ্গে মায়ের কী কথা, মা-ই জানে। আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলে নিশ্চয়ই বলত।

হিমিকা এরকমই। ফালতু কিউরিয়োসিটি ওর মধ্যে একেবারে নেই। সবকিছু স্ট্রেট ব্যাটে হ্যান্ডল করে। সায়র একটু টেনশনে ছিলই। কাকিমার তাকে এমন কী দরকার পড়ল, যে কথা তিনি মেয়েকেও বলেননি!

বাদামতলায় হিমিকাদের দোতলা বাড়ি। বাবা নামী উকিল। নীচের তলায় চেম্বার। সায়র দোতলায় উঠতেই কাকিমা এমন সহাস্য অভ্যর্থনা জানালেন, টেনশন অনেকটাই রিলিজ হয়ে গিয়েছিল সায়রের। হিমিকা বলল, আমি স্টাডিতে আছি। তুই মায়ের সঙ্গে কথা বল।

সায়র রইল ড্রয়িংরুমে। কাকিমা স্ন্যাক্স, চা সামনে রেখে আলতো করে একটা প্রশ্ন তুললেন, জয়িতা নামের কাউকে চেনো?

দ্রুত ভেবে নিয়েছিল সায়র, না, ওই নামের কাউকে সে চেনে না। কেউ কি তার নামে মিথ্যে কেস খাওয়াল কাকিমাকে? জয়িতার সঙ্গে জুড়ে দিল সায়রের নাম? জয়িতা নামটা পুরনো দিনের। এই জেনারেশনের না হওয়ার চান্স বেশি। খবরটাকে কাকিমার গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হয়নি।

সায়রের চোখমুখের বিভ্রান্তি দেখে কাকিমা বলেছিলেন, ভেবেছিলাম নামটা বললেই তুমি চিনবে। বাকি কথা আমাকে বলতে হবে না। বলাটা আমার পক্ষে খুব একটা স্বস্তিকর নয়। তোমার শুভানুধ্যায়ী এবং আমার মেয়ের সঙ্গে যেহেতু একটা স্টেডি রিলেশনশিপ আছে তোমার, কথাটা জানানো আমার কর্তব্য।

থেমেছিলেন কাকিমা। নিজের জন্যও এনেছিলেন চা, চুমুক দিতে দিতে কথা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন হয়তো। বলতে শুরু করলেন, তোমার বাবার অফিসে আমাদের এক রিলেটিভ চাকরি করে। রিপোর্টার। জয়িতার কথা সে অনেক আগেই আমাদের বলেছিল। যখন জেনেছিল হিমিকার সঙ্গে তোমার রিলেশন তৈরি হয়েছে। জয়িতা নাগ চাকরি করে কলেজ স্ট্রিটে এক পাবলিশিং হাউসে। তোমার বাবা যে পত্রিকায় কাজ করেন, তার পাঁচমিনিট দূরত্বে ওদের অফিস। গত চার-পাঁচ বছর ধরে তোমার বাবা দেবাংশুবাবু

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আর জয়িতার মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধুত্ব লক্ষ করেছে অফিস কলিগরা। ছুটির পর দেবাংশুবাবুকে জয়িতার সঙ্গে কলেজ স্কোয়ার, কফি হাউসে প্রায়ই দেখা যায়। একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটান তাঁরা। আমার আত্মীয় যখন খবরটা আমাকে দিয়েছিল, গুরুত্ব দিইনি। একজন বিবাহিত মানুষের বান্ধবী থাকা মোটেই অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যারা এটাকে নিন্দের চোখে দেখে, তাদেরই মনে হয় দু'জন একটু বেশি সময় একসঙ্গে কাটাচ্ছে। কিন্তু তোমার মা গত হওয়ার পর বিষয়টা নিয়ে আমি নতুন করে ভাবতে বসি।

চুপ করে গিয়েছিলেন কাকিমা। হয়তো অপেক্ষা করছিলেন সায়রের রিঅ্যাকশনের। ভিতর তোলপাড় হয়ে গেলেও সায়র বসে ছিল পাথরের মূর্তির মতো। হিমিকার মায়ের একটা কথাও বিশ্বাস হচ্ছিল না। নিজের বাবাকে সে বিলক্ষণ চেনে। মা ছাড়া বাবার কোনও বিশেষ বান্ধবী ছিল না। মায়ের সঙ্গে সম্পর্কও ছিল ভীষণ ভালো। মিষ্টি খুনসুটি চলত দু'জনের মধ্যে। 'জয়িতা' নামটা কোনওদিন মা, বাবার মধ্যে উচ্চারিত হতে শোনেনি। সায়রের তখন ইচ্ছে করছিল তার কাপের আধখাওয়া চা-টা হিমিকার মায়ের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, মেয়ের জন্য আমাকে যদি উপযুক্ত না মনে হয়, সরাসরি বলুন। বাবাকে নিয়ে গল্প বানাবেন না।—চা কাপেই রয়ে গেল। কাকিমা বলতে থাকলেন, তোমার মায়ের মৃত্যুর মাসখানেক বাদে আমার সেই রিলেটিভকে ডেকে পাঠাই। জিজ্ঞেস করি, দেবাংশুবাবু, জয়িতার সম্পর্কটা এখন কোন পর্যায়ে? সে বলে, আগের মতোই।—কদিন আগে আবার ফোন করে জানাল, অফিসে ফিসফিসানি চলছে, দেবাংশুবাবু নাকি জয়িতাকে বিয়ে করতে চলেছেন।

—ভদ্রমহিলার বাড়ি কোথায়? কান, চোখ গরম অবস্থায় এই প্রশ্নটা শুধু করতে পেরেছিল সায়র।

—পরে বলছি। বলে হিমিকার মা আসল কথায় এসেছিলেন, দেখো, এই বিয়েটা যদি হয়, সেটাকেও অস্বাভাবিক বা অনুচিত বলব না আমি। শুধু প্রেক্ষাপটটাকে নিয়ে চিন্তা। এই ঘটনা যদি কলকাতার কোনও পশ এলাকায় কিংবা এখানকার কোনও সদ্য তৈরি হওয়া হাউজিং-এ ঘটত, সমস্যা হত না। সেখানে কারওর ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। কিন্তু তোমরা তো যৌথ পরিবার। পুরোহিত পাড়ার ওয়েলনোন ফ্যামিলি। দেবাংশুবাবুর বিয়ে তোমাকে ঘরে বাইরে একটা অপ্রীতিকর অবস্থায় ফেলে দেবে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আমাদের ফ্যামিলিও বেশ খানিকটা এফেক্টেড হবে এই ঘটনায়। চাঁদপাড়ায় হিমিকার বাবাকে প্রায় সকলেই চেনে। তোমার সঙ্গে হিমিকার সম্পর্কটাও এখন আর গোপন নেই। দেবাংশুবাবু বিয়ে করলে বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে আমাদেরও। আমরা কী উত্তর দেব, সেটা নির্ভর করছে হিমিকার সিদ্ধান্তের ওপর। আমরা এখনও হিমিকাকে কিছু জানাইনি। আমি চাই তুমিই জানাও। দুজনে মিলে প্রস্তুত হও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য...কাকিমা প্রায় শৈল্পিক নিপুণতায় বাবার কেচ্ছা আর সায়রের সংকট তুলে ধরেছিলেন। পরে আরও অনেক কথা বলেছিলেন, সবটা কানে ঢোকেনি সায়রের। তার পা, হাতের চেটো ঘামছিল, গলা শুকিয়ে কাঠ, মুণ্ডুটা যেন গরম তোয়ালে দিয়ে চেপে ধরেছিল কেউ। প্রায় টলতে টলতে হিমিকাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল সায়র। হিমিকাকে 'বাই' জানানো হয়নি। বাইকটা নিয়ে চাঁদপাড়ার সমস্ত গলি, বড়রাস্তায় বোধহয় ঘুরে বেড়িয়েছিল। হিমিকার মায়ের কথা বিশ্বাস না করলেও, বাইক চালানো অবস্থায় চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছিল সায়রের। বাড়ি ফিরেছিল রাত আটটারও পর। সায়ররা থাকে তেতলায়। বাবা নিজের বিছানায় বুকে পাশবালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে বই পড়ছে। দেওয়ালে মায়ের হাসিমুখের ফটো। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল হিমিকার মায়ের সঙ্গে কথোপকথন আসলে স্বপ্ন। বাবাকে নিয়ে কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু তখনও যে তার গালে, কানে আগুনের আঁচ। ঘরে ঢুকে বাবার সেলফোনটা তুলে নিয়েছিল, বাবার সামনে থেকেই। ঘটনা নতুন কিছু নয়, বাবা এতটুকু আশ্চর্য হয়নি। বাবার ফোনসেট নিয়ে নাড়াচাড়ার অধিকার সায়রের আছে। সেলফোনের অনেক ফিচার্স বাবা জানেও না। সায়রকে দেখিয়ে দিতে হয়। ফের ভুলে যায় বাবা। ফোনসেটটা নিয়ে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে সায়র, বাবা বলেছিল, এত দেরি হল! বিকেলে কিছু খেয়েছিস?

উত্তর না দিয়ে ঘর ছেড়েছিল সায়র। নিজের ঘরে এসে বাবার ফোনে সেভ করা সমস্ত নাম চেক করেছিল। খুব বেশি নাম নেইও। জয়িতা নামের কাউকে পাওয়া গেল না। শর্ট ফর্মেও কোনও নাম সেভ করা নেই, যেখান থেকে মহিলাকে আন্দাজ করা যায়। বেশ কিছু মেয়েদের নাম আছে, যাদের প্রায় সকলকেই চেনে সায়র। ইনবক্স খুলেও প্রেমভাষার আলতো কোনও মেসেজও পাওয়া গেল না। এরপর কম্পিউটার খুলে বসেছিল সায়র। বাবার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মেল আই-ডি, পাসওয়ার্ড তার জানা। অ্যাকাউন্টটা সায়রই ক্রিয়েট করে দিয়েছিল বাবাকে। মেল বক্স-এ জয়িতা নামের কারও অস্তিত্ব পাওয়া গেল না। না পাওয়াতে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিল না সায়র। চাইছিল মহিলার পাঠানো এক-দু'লাইনের নির্দোষ, নিরীহ কোনও বার্তা। যা থেকে বোঝা যায় বাবার সঙ্গে ওর আলাপ আছে ঠিকই, সম্পর্কটা বিশেষ পর্যায়ের নয়। হিমিকার মায়ের কাছে খবরটা পৌঁছেছে ফেব্রিকেটেড হয়ে। নামটা না পাওয়াতে মনে হচ্ছিল, বাবা কনশাসলি মহিলার কোনও প্রমাণ রাখেনি। ফোন বা কম্পিউটারে কল, মেসেজ এসে থাকলে রিপ্লাই দিয়ে ডিলিট করে দিয়েছে নাম। তাহলে কি হিমিকার মায়ের সব কথাই সত্যি? দমচাপা অস্থিরতার মাঝে বাবা এসেছিল ঘরে। কম্পিউটার টেবিলে চা, পেস্ট্রি নামিয়ে বলেছিল, খেয়ে নে।

চা বাবা বানিয়ে এনেছে। নিজের জন্যও করেছে এক কাপ। এক ছাদের তলায় কাকা, জ্যাঠারা থাকলেও, প্রত্যেক ফ্যামিলির রান্নাঘর আলাদা। রান্নার মাসি দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যায় সায়রদের। মাঝে চা বা টুকটাক কিছু করার থাকলে, করে নেয় বাবা। সায়রের টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল বাবা। আসলে অপেক্ষা করছিল পেস্ট্রিটা সায়র খায় কিনা দেখতে। ধরেই নিয়েছে ছেলের পেটে অনেকক্ষণ কিছু পড়েনি। সায়রের ইচ্ছে করছিল ঘুরে গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে, জয়িতা কে? তোমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?—প্রশ্নটা করতে পারেনি। বাবা যদি স্বীকার করে নেয় সব! তখন কী করবে সায়র! মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাবা হয়তো চাইছে জয়িতার প্রসঙ্গটা সায়রকে বলতে। লজ্জা কাটিয়ে তুলতে পারছে না কথাটা। প্রশ্নটা করে সেই সুযোগ বাবাকে দেবে না সায়র। বাবা যাতে চলে যায়, সে কারণেই পেস্ট্রিটা তুলে কামড় বসিয়েছিল সায়র। ফিরে গিয়েছিল বাবা। অতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়েছিল, কম্পিউটার স্ক্রিনেও চোখ পড়েছিল নিশ্চয়ই, বুঝতেই পারেনি সেখানে বাবার ইনবক্স সাবজেক্টের পরপর লাইন দেখা যাচ্ছে। খেয়াল করলে একবার অন্তত নিস্পৃহ গলায় জানতে চাইত, আমার ইনবক্সে কী দেখছিস বা খুঁজছিস? একেবারেই কম্পিউটার ফ্রেন্ডলি নয় বাবা। হওয়ার চেষ্টাও নেই। অথচ কত সতর্কতার সঙ্গে ওই মহিলাকে আড়ালে রেখেছে!

সে রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না সায়রের। টয়লেট গেল বেশ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কয়েকবার। ঘাড়ে মাথায় জল দিল। যতবার বারান্দা ধরে বাথরুমের দিকে গেছে, ঢাকা দেওয়া খাঁচার ভিতর ডানা ঝাপটেছে পাখিটা। মা মারা যাওয়ার পর ওরও কি পাতলা হয়ে গেছে ঘুম?

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সায়র। সেটাও নষ্ট হল টিয়াটার চেঁচামেচিতে। এখনও মায়ের নাম ধরে ডাকে, লোপা...ও লোপা...লোপা এল...লোপা খেতে দে...মা অনেক সময় সাড়া দিত না। রাগ হত বাবার। মাকে বলত, অত করে ডাকছে, সাড়া দিচ্ছ না কেন?

মায়ের সময় থেকেই বারান্দায় ঝোলানো আছে খাঁচা। এখন পাখিটার যত্ন নেয় বাবা। খেতে দেয়, খাঁচায় কাপড় চাপা দেয় রাতে। কোমরসমান সিমেন্টের জাফরি দেওয়া বারান্দার পাঁচিল। দু'তলা নীচে উঠোন। পাখিটা যখন মায়ের নাম ধরে ডাকে, সারা বাড়ি জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয় নামটা। বাবা যদি বিয়ের প্ল্যান করে থাকে, পাখিটাকে অতি অবশ্যই তাড়াবে। ঘটনাটা থেকেই সায়র বুঝে যাবে, সিদ্ধান্ত পাকা।

হিমিকার মা জয়িতা নাগের বাড়ির ঠিকানা বলেছেন। বাড়ির সামনেটায় গ্রসারি শপ। ওঁদের ফ্যামিলি বিজনেস। মহিলা অবিবাহিত। বয়সে বাবার থেকে অনেকটাই ছোট। ওঁর ঠিকানায় গিয়ে সায়র দেখে আসতেই পারত মহিলাকে। তাতে খবরের সত্যতা প্রমাণ হত না। সায়র তাই বাবার অফিস ছুটির সময়টা ক্যালকুলেশন করে, গিয়েছিল কফি হাউস, কলেজ স্কোয়ারে। কফি হাউসে পাওয়া গেল না। বেরিয়ে বিধান সরণিতে এসে ছোট গেট দিয়ে ঢুকেছিল কলেজ স্কোয়ারে। বেশিদূর এগোতে হয়নি। এদিক ওদিক বসে থাকা যুগলদের মধ্যে বাবা আর যাঁকে চোখে পড়েছিল, ধরেই নেওয়া যায় 'জয়িতা নাগ'। পরনে চুড়িদার। ছোটোখাটো চেহারা। সামনে লেকের জলে সন্ধে নেমে গেছে।

কর্পোরেশনে বাতির তেমন জোর নেই। অথচ মহিলার মুখটা লাগছিল অসম্ভব উজ্জ্বল। সেটা কি বাবা পাশে বসে আছে বলে? বাবাকেও বেশ ঝরঝরে লাগছিল। মা চলে যাওয়ার পর থেকে বাবাকে ওই মুডে বাড়িতে আর পাওয়া যায় না। ভীষণ অচেনা ঠেকছিল বাবাকে। সায়রের থেকে হাজার মাইল দূরের কেউ! লেকের কংক্রিটের রাস্তায় গেঁথে গিয়েছিল সায়রের পা। বাবার সঙ্গে দূরত্বটা বাড়ছিল। বাবারা কিন্তু প্রকাশ্যেই বসে ছিল, খাঁজে খোঁজে বসেনি, তার মানে নিজেদের লুকোনোর ইচ্ছে নেই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মহিলাকে যতটা সুন্দরী মনে হচ্ছিল, ততটা বোধহয় নন। বাবা পাশ থেকে সরে গেলেই আসল রূপটা ধরা পড়ে যাবে। বাবা ঘাড় ফেরালেই দেখতে পেত সায়রকে। চিনতে পারত কি? দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে যে।

কাকিমার কথা অনুযায়ী সম্পর্কটা অনেকদিনের। দু'জনের আলাপচারিতা দেখে তেমনটাই মনে হচ্ছিল। অথচ রিলেশনটার কথা কতদিন পর জানতে পারল সায়র। বাড়ির কেউ এখনও জানে না। সায়রদের আত্মীয় পরিজনরাও অবহিত নয়। তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার ইতি টেনে দিতে পারলে, সায়রকে কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে না। মারাত্মক এক লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচবে সে। মহিলাটিকে সরিয়ে দিতে হবে। মা-ও তো সরে গেছে পৃথিবী থেকে। মহিলার সরে যাওয়াটাও হবে স্বাভাবিক, ধরা যাক গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট। রনোর অবর্তমানে জলিদাকে এই কন্ট্র্যাক্টটাই দেবে সায়র। টাকা দেওয়ার ক্ষমতাও তার আছে।...নাকে সিগারেটের গন্ধ আসতে সম্বিত ফিরল, ঘাড় ফিরিয়ে সায়র দেখে সিগারেট ধরিয়েছে রনো। ট্যাক্সির জানলার বাইরের দোকানপাট দেখে মনে হচ্ছে মানিকতলা এসে পড়ল প্রায়। বেশ খানিক আগে শিয়ালদার উড়ালপুল ক্রস করেছে সায়ররা। মাঝ বিকেলেই আজ আশ্চর্যভাবে ঝিম ধরা আলো। কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্রের আভাস।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

No. ৬২৫৭৭.১৮-৮
Date ২২/৩/২৫

দুই

—কী রে, আজ এত তাড়াতাড়ি চলে এলি! ভালো করে সন্ধেই তো নামেনি। বলল মা।

কাঁধব্যাগ বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে আয়নার সামনে গেল জয়িতা। চুলে বাঁধা ক্লিপ, গার্টার খুলতে খুলতে বলল, অফিসে তেমন চাপ ছিল না। ছুটি চাইতেই দিয়ে দিল।

—দেবাংশুবাবু আজ অফিস যাননি?

মায়ের এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না জয়িতা। ড্রেসিং টেবিলের পাশের জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখল, হ্যাঁ, সন্ধে এখনও পুরোপুরি নামেনি। আজ যেন একটু দেরি করছে। বাড়ির সামনে হাইরোডের অনেকদূর অবধি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। নিভতে চলা হলুদ বিষণ্ণ আলো ছেয়ে আছে চারপাশে। এই আলো আসলে মন্ত্রণার, কানে ফিসফিস করে বদ মতলব দেয়। মা এখন মন্ত্রণাই দিচ্ছে। প্রশ্নের আড়ালে বলছে, ছুটি পেলি তো বাড়ি চলে এলি কেন! দেবাংশুর অফিসে চলে যেতে পারতিস।...ঠিক কেন যে মা 'বাবু' জুড়ে দেবাংশুকে সম্বোধন করে জানে না জয়িতা। এখনও অবধি স্বচক্ষে দেখেনি তাকে। জয়িতার থেকে ছবি দেখেছে, গল্প শুনেছে। তাতে

৫৮২৬০

boierpathshala.blogspot.com
Scanned by CamScanner

ওর প্রাজ্ঞ, গম্ভীর রূপটাই প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভ্রম থেকেই মা বোধহয় 'বাবু' শব্দটা জুড়ে দেয়। মা তো জানে না মানুষটা কী অসম্ভব রোমান্টিক! সেই পরিচয়টা জয়িতাই দিয়ে উঠতে পারেনি মাকে। এমনিতে মায়ের সঙ্গে তার সমস্তরকম কথাবার্তাই হয়। দেবাংশু যেহেতু বিবাহিত, জয়িতার প্রতি তার আবেগটা পুরোপুরি বলতে পারেনি মাকে। কোথায় যেন বেধেছে। সবকিছু বলে দিলে, দেবাংশুকে বোধহয় ছোট করা হবে। না বলা অংশগুলো মা নিশ্চয়ই নিজের মতো ভরাট করে নেয়। সেই কল্পনা ছুঁতে পারে না দেবাংশুর রোমান্টিকতাকে, তাই যোগ হয় 'বাবু'।

বাবুকে আজ বেশ প্যাঁচে ফেলেছে জয়িতা, কথা ছিল ছুটির পর কফি হাউসে দেখা করবে দু'জনে। জয়িতার অফিসে ফার্স্ট আওয়ারে খবর এল রিটায়ার্ড এক কর্তাব্যক্তি মারা গেছেন। ভদ্রলোককে জয়িতা কোনওদিন দেখেনি। অফিস ছুটি হয়ে গেল। পুরনো স্টাফেরা চলল হাসপাতালে, ভদ্রলোকের শেষযাত্রায় যোগ দিতে। জয়িতাও যেতে পারত। টাইমে এসে মিট করত দেবাংশুকে। কেন জানি মনে হল বাড়ি ফিরে যাই এবং দেবাংশুকে কিছু না জানিয়ে। তাকে না পেয়ে দেবাংশু কতটা ছটফট করে, দেখা যাক। অনেকদিন টানটা পরীক্ষা করা হয়নি। জয়িতা ঘুরপথে দেবাংশুর অ্যাটেনশন পাওয়ার চেষ্টা করছে। মা একই জিনিস চাইছে, তবে সরাসরি। মন্ত্রণার আকারে ওসকাচ্ছে, বাড়ি না এসে দেবাংশুর অফিসে চলে যেতে পারতিস।

আলমারি থেকে অর্ডিনারি সালোয়ার কামিজ, বারান্দার তারে ঝোলানো গামছা নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে জয়িতা। অফিসেও সালোয়ার বা বিভিন্ন ড্রেস পরে যায়, শাড়ি কদাচিৎ। বাড়ি ফিরে কাফতান বা ম্যাক্সি। এখন সালোয়ার কামিজ পরবে বাড়ির দোকানে ভিজিট দেবে বলে। ছোট বোনের বর দোকানটা চালায়। সে এ বাড়ির ঘরজামাই। লাল্টু যা ছেলে, জয়িতা বিজনেসে নজর না রাখলে, খুব দ্রুত লাটে তুলে দেবে।

কলকাতায় শীত এখনও না এলেও, একঘণ্টার উপর দূরত্বে তাদের মফস্সলে সকাল, সন্ধে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব থাকছে। অফিস থেকে ফিরে তবু স্নান করে জয়িতা। শাওয়ার চালিয়ে নয়, চুল বাঁচিয়ে কয়েকমগ জল ঝপাঝপ গায়ে ঢেলে নেয়। ধুয়ে যায় যাতায়াতের পথের ধুলোময়লা। এমনকী লোকাল ট্রেন এবং কলকাতার হইচই পর্যন্ত। বাড়িতে যতই সমস্যা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

থাকুক, নিজেদের এলাকায় ফিরে এলে আলাদা একটা শান্তি পায় জয়িতা। শান্তির মেয়াদ কি কমে আসছে? নাকি যেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, অপেক্ষা করছে আরও পরিতুষ্টি?

গায়ে দু'মগ জল ঢালতেই সারা শরীর কেঁপে উঠল। সেটা ঠাণ্ডার কারণে, নাকি নতুন জায়গায় যাওয়ার আশঙ্কায় বোঝে না জয়িতা। তবে গরম জলের জন্য এবার গিজার লাগাতেই হবে বাথরুমে। টাকা জমা করে কেনা হয়ে উঠছে না। সংসার খরচ বাঁচিয়ে টাকা জমেই-বা কোথায়। অফিস যাওয়ার আগে মা বালতিতে ইমার্শান হিটার ডুবিয়ে জল গরম করে দেয়। অফিস থেকে ফেরার টাইমের কোনও ঠিক নেই। জল গরম হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করে না জয়িতার, তাই ঠাণ্ডা জলে চান। ইনস্টলমেন্টে হলেও এ মাসে গিজার কিনে নেবে জয়িতা। পরের শীতে সে হয়তো এ বাড়িতে থাকবে না। গিজারটা থাকবে। বাড়ির লোক বলবে, মেয়েটা স্বার্থপর নয়। চলে যাবে জেনেও, মাত্র একবছর আগে গিজারটা লাগিয়েছে। আমাদের ব্যবহারের জন্যই লাগানো।—এতটা ভাবা একটু বেশিই কাঙালপনা হয়ে যাচ্ছে। এ বাড়ির সকলেই তো সর্বক্ষণ হাবেভাবে বুঝিয়ে যাচ্ছে তারা জয়িতার প্রতি কৃতজ্ঞ। যথেষ্ট সম্ভ্রম দেখায়। সমস্ত নির্দেশ মানে।

গামছায় গা মুছে কাপড়-জামা পরতে পরতে জয়িতার চোখ যায় বাঁ-পাশের দেওয়ালে। প্রায় বডিসাইজ একটা আয়না ছিল ওখানে। বছর কয়েক আগে নিজেকে বয়স্ক দেখতে লাগায় জয়িতাই আয়নাটা সরিয়ে দিয়েছে। ইদানীং আয়নাটার অভাব বোধ করছে। অনেকদিন হয়ে গেল নিজেকে নিরাবরণ দেখা হয়নি। সে কি আদৌ দেখার মতো আছে? যে মুগ্ধদৃষ্টির অপেক্ষা শেষ হতে চলল, কতক্ষণ খোলা থাকবে সেই চোখ?

—দিদি, এতক্ষণ কী করছিস তুই? বন্ধ দরজার ওপারে মলির অধৈর্যের ডাক। মেজো বোন। বাথরুমে ঢুকবে বলে তাড়া দিচ্ছে না। দিদির সঙ্গ চাইছে। জয়িতা বাড়ি থাকলে চোখছাড়া করতে চায় না। আবার ডাকল, অ্যাই দিদি, এত টাইম লাগছে কেন?

—বেরোচ্ছি। চিল্লাসনি। বাথরুমের ভিতর থেকে ধমক দিল জয়িতা।

মলি সঙ্গে সঙ্গে চুপ। মানে নিশ্চিন্ত হয়েছে। জয়িতা সাড়া না দিলে অধৈর্য হওয়া ছাড়াও আশঙ্কাতেও ভোগে। কিছু হয়ে যায়নি তো? পাঁচবছর

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

হয়ে গেল বাবা মারা গেছে তিন বোনের। শারীরিক প্রতিবন্ধী বোনটা তাই বড় আঁকড়ে থাকে দিদিকে।

বাথরুমের দরজা খুলে বাইরে আসে জয়িতা। দাঁড়িয়ে আছে মলি। জন্মাবধি দুটো হাত নেই। কাঁধ থেকেই নেই। কিন্তু এমনভাবে তাকায় দিদির দিকে, হাতের থেকেও বেশি আঁকড়ে ধরা থাকে তাতে। ভেজা হাতটা বোনের মাথায় রাখে জয়িতা। বলে, মাকে চা দিতে বল।

—সালোয়ার কামিজ পরলি! কোথাও বেরোবি নাকি?

—দোকানে বসব একটু। অনেকদিন বসা হয়নি। তুই স্টকে চোখ রাখছিস তো? বলতে বলতে ঘরের দিকে এগোয় জয়িতা।

পিছনে রইল মলি। উত্তরটা দিল না। চা হয়েছে কিনা দেখতে বোধহয় রান্নাঘরের দিকে গেল। নিজের ঘরে ফিরে অফিসব্যাগটা থেকে মোবাইল বার করল জয়িতা। ব্যাগ এখন বিছানায় নেই, মা তুলে রেখেছে দেওয়ালের হুকে। আরও দুটো মিসড কল দেবাংশুর। ফোনসেট সাইলেন্ট মোডে রাখে জয়িতা। রিং হলেই মা, মলি বড্ড কৌতূহল দেখায়। জিজ্ঞেস করে, কার ফোন? দেবাংশুর কল কিনা, সেটা জানাই আসল উদ্দেশ্য।

দেবাংশুর ফোন এলে মা খুশি হয়, মলি সামান্য বিষণ্ণ। কফি হাউসে জয়িতাকে না পেয়ে পাঁচবার ফোন করল দেবাংশু। শেষের দুটো ধরার প্রশ্ন নেই, বাথরুমে ছিল জয়িতা। আগের তিনটেও ধরেনি। হোক উতলা। লোপা বউদি যতদিন বেঁচে ছিল নিজের ব্যাকুলতাকে অনেকবার গলা টিপে আটকে রাখতে হত জয়িতাকে। হয়তো খুব ইচ্ছে করছে দেখা করে কিছুক্ষণ গল্প করার, ওঁর সময় নেই। বাড়ি ফিরে বউকে নিয়ে আত্মীয়বাড়ি যাবে অথবা শপিং-টপিং। বিয়ে করা মেয়ে বলে কথা, তার প্রায়োরিটি থাকবেই। ফোনে কথা বলতে চাইলে, মিসড কল মেরে বসে থাকতে হবে। বাবুর যখন সময় হবে, মানে পাশে যখন বউ-ছেলে থাকবে না কলব্যাক করবেন। সময়টা এক ঘণ্টা পর হতে পারে, চার ঘণ্টা বাদে হলেও বলার কিছু নেই। কারণ, এই সতর্কতার সায় জয়িতারও ছিল। তাদের রিলেশন যখন বেশ পাকাপোক্ত আকার নিয়েছে, জয়িতা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের সম্পর্কের পরিণতি কী?

—তুমি কীরকম পরিণতি চাও? জানতে চেয়েছিল দেবাংশু। জয়িতা বলেছিল, তোমাকে নিয়ে সংসার করতে চাই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—তাহলে আমাকে আগের সংসার ছেড়ে আসতে হয়। কোন মুখে আসব? লোপার বিরুদ্ধে তো আমার কোনও অভিযোগ নেই।

লোকটা অদ্ভুত, বউয়ের নিন্দে করে কোনওদিন প্রেমিকার মন পাওয়ার চেষ্টা করেনি। জয়িতার ওপর কোনও ব্যাপারেই অধিকার ফলায়নি কখনও। রিলেশন রাখতে চাও, রাখো। নয়তো রেখো না, ভাবটা এইরকম। জয়িতা বলেছে, আমি যদি তোমাকে ছেড়ে চলে যাই, কষ্ট হবে না?

—কষ্ট হবে। ভীষণই হবে। সহ্য করব। এরকম একটা ভবিষ্যতের কথা ভেবেই, আমি তোমাকে ভালোবেসে যাচ্ছি।

উত্তর শুনে জয়িতা দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দেয়, আমিও কারোর সংসার ভাঙতে চাই না। বাজে মেয়ের তকমা নিয়ে আমারও ভালো লাগবে না বাঁচতে। প্রেমিকা হয়ে থাকাই আমার ভবিতব্য। কিন্তু কত বয়স অবধি আমাকে প্রেমিকা হিসেবে মানা যাবে, সেটা নিয়েই চিন্তা।

—বয়স কি আমারও থেমে থাকবে? বলেছিল দেবাংশু।

মুড়ির বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকল মা। জয়িতার হাতে দিয়ে বলল, খা, ততক্ষণ। চা দিচ্ছি।

ফিরে গেল মা। মুড়ির সঙ্গে দুটো বেগুনি ভেজে দিয়েছে। বিছানায় এসে বসেছিল জয়িতা, রিমোট টিপে কখন যে টিভি চালিয়েছে খেয়াল নেই। টিভিতে বাংলা সিরিয়াল চলছে। মা, মলি খুব দেখে। লালির এসবে ঝোঁক নেই। সে পাড়া বেড়ায়, কখনও-সখনও দোকানে গিয়ে বরকে হেল্প করে। এই মুহূর্তে কোথায় কে জানে। সাত মাস হল পেটে বাচ্চা এসেছে। কোনও হুঁশ নেই তার। ভারী পেট নিয়ে ধিঙ্গি মেয়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চ্যানেল পাল্টে জয়িতা এখন নিউজ দেখছে। কী খবর যে বলে যাচ্ছে মেয়েটা, মাথায় ঢুকছে না কিছুই। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে সামনে রাখা ফোনটার দিকে, এই বুঝি আলো জ্বলে ডাইব্রেট হতে শুরু করল। সম্পর্কের গোড়ার দিকে মাঝে মাঝে ফোন ধরা বন্ধ করে দিত জয়িতা। সেটা টান বোঝার জন্য নয়। দ্বিধায় ভুগত রিলেশনটা নিয়ে। কখনও মনে হত, অন্যায় হচ্ছে। কখনও-বা পরিণতির প্রশ্নটা আসত মাথায়। দেবাংশু ফোন করে যেত দিনে চার-পাঁচবার। পর পর দু'দিন এরকম ফোন করত। খুব অস্থির হয়ে নয়, অনেকক্ষণ অন্তর। তৃতীয় দিন থেকে আর ফোন করত না। তখন নদীর স্রোত বইত নদীর উল্টো পানে, জয়িতার মনে হত, কেন ফোন করছে না?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সম্পর্কটার কি ইতি টেনে দিল? দেবাংশুও হয়তো ভাবছে দিশাহীন এই বন্ধনের কোনও অর্থ হয় না। ভাঁটার জলের মতো জয়িতার বুক শূন্য করে ফিরে যাচ্ছে দেবাংশু; অথবা শীত ফুরোলে ছাতিম ফুলের গন্ধের মতো দূরে সরে যাচ্ছে। জয়িতা আগ বাড়িয়ে ফোন করতে পারছে না, নিজেকে ছোট করা হবে তাতে। যেন বলা হবে, আমার জন্য যতটুকু ভালোবাসা রেখেছ, তাতেই আমি খুশি। আমাকে ভুলে যেও না। ভালোবাসার ভিক্ষা চাইতে সে রাজি নয়। তার ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য ফেলনা নয় এত। কিশোরীবেলা পেরোতে না পেরোতেই জয়িতা দেখেছে, ছেলেরা তার করুণা পেতে কেমন পাগলপারা হয়ে ওঠে। এই দোলাচলের মধ্যে জয়িতাকে ঘিরে থাকত মনখারাপ করা বাতাস। কিছু ভালো লাগত না তখন। বারবার চোখ চলে যেত মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে। মিসড কল হয়ে বসে নেই তো সে। হয়তো পনেরো কিংবা কুড়িদিন পর ফোনের পরদায় ফুটে উঠল তার নাম, জয়িতা বুভুক্ষুর মতো রিসিভ করত কল। ফোন ধরে 'হ্যালো' বলা মানা ছিল দেবাংশুর। এটা ছিল সাবধান বিধি। দেবাংশু বলেছিল, আমার ঘনিষ্ঠ কেউ তোমার নাম্বারটা ট্রেস করে, আমার মোবাইল থেকে তোমাকে যদি ফোন করে, তোমার 'হ্যালো' বলার ধরন থেকেই দু'জনের সম্পর্কের গভীরতা বুঝে যাবে। তাই ফোন ধরে কোনও সাড়া দেবে না তুমি। প্রথম কথা আমি বলব।—দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ফোন এলে সাবধান বিধি মনে থাকত না জয়িতার, পিপাসার্তের গলায় 'হ্যালো' বলেই ফেলত। ওপ্রান্ত থেকে কোনও অভিযোগ, উদ্বেগ কিচ্ছু নেই। একবারও জিজ্ঞেস করত না, কেন ফোন ধরোনি বা করোনি। খুশ মেজাজ গলায় জিজ্ঞেস করত, কী করছ এখন?

—আপনার ফোন ধরেছি মশাই। বাঁধাগতের উত্তর ছিল জয়িতার।

লাগসই কথা জোগাতে না পেরে হেসে ফেলত দেবাংশু। তবু বহুদিন বাদে ফোন করলে প্রতিবার ওই প্রশ্নটাই করত। আসলে হয়তো জানতে চাইত, আমার কথা কি ভাবছিলে এখন? কেন স্বীকার করবে জয়িতা, দিনের তারার মতো দেবাংশুর কথা মনের মধ্যে মিশে থাকে তার। দেবাংশু কেজো কথাবার্তা শুরু করত। জয়িতা এতদিন পর ফোন ধরেছে দেখে মন ভেজানো ফ্ল্যাটারি করত না। যেন জানতই জয়িতা খুব বেশিদিন ফোন না ধরে থাকতে পারবে না। ওর আত্মবিশ্বাস নাকি উদাসীনতায় রাগ হয়ে যেত জয়িতার। বলত, আমি কেন ফোন ধরছিলাম না, জানতে চাইলে না তো! এতদিন

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পরে কেনই বা রিসিভ করলাম কল, সে-ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করছ না কিছু!

—আমি তো জানি, ফোন কেন ধরোনি। আজও আশা করিনি ধরবে। এরকম একটা অঙ্গীকারহীন সম্পর্ক নিয়ে সংশয়ে তুমি থাকবেই। ভাবতে সময় নেবে। ফোন না ধরে থাকতে পারছ কিনা, দেখবে। আমি তোমায় ভাবতে সময় দিয়ে আবারও ফোন করে যাব। ভালোবাসা ছাড়া আর এই সময়টুকুই তোমাকে আমি উপহার দিতে পারি।

জয়িতার অভিযোগের উত্তরে এই কথাগুলোই দেবাংশু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে যেত। একসময় এই অঙ্গীকারহীন ভালোবাসায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল জয়িতা। ফোন এলেই ধরত। দেখা করতও দেবাংশুর সময় সুযোগমতো। খারাপ লাগলেও পরাধীনতাটা মেনে নিয়েছিল দেবাংশুকে না ভালোবেসে পারে না বলে। লোপা বউদি মারা যাওয়ার পর কড়াকড়ি অনেকটা কমেছে। এখন দেখা হয় বেশি, সময় কাটানো যায় অনেকটা। ছেলে সায়রের জন্য একটু অ্যালার্ট থাকে দেবাংশু। এখনও ফোন ধরে জয়িতার 'হ্যালো' বলা নিষেধ আছে। দেবাংশু বোধহয় ধরতে পারছে না সায়র এই রিলেশনটা কেমনভাবে নেবে। ম্যাচিওরড নয় সে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট। মা হারানোর শোক এখনও গাঢ় ছায়ার মতো ঘিরে রয়েছে তাকে।

বউয়ের হঠাৎ মৃত্যুতে দেবাংশুদাও ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিল। নিজেই স্বীকার করে তুমি পাশে না থাকলে আমি ওই মানসিক বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম না। জয়িতার অবস্থা কতটা নিদারুণ ছিল, সেটা কি এখনও পুরোপুরি অনুভব করে দেবাংশু? বউ হারিয়ে একেবারে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল কী পরিমাণ ভালোবাসত লোপা বউদিকে। ভালোবাসায় গো-হারান হেরে গিয়েও, পিছিয়ে আসেনি জয়িতা। জানত এখন পাশ থেকে সরে গেলে মানুষটা ভেসে যাবে। হয়তো কোনও স্যানাটোরিয়ামে স্থান হবে তার। কত অপমানজনক কথাই না তখন বলেছে দেবাংশু। বিষণ্ণ চঞ্চল দৃষ্টিসহ মাথা নাড়তে নাড়তে বলত, আমার মনে হয় লোপা টের পেয়ে গিয়েছিল, আমি অন্য একজনকে ভালোবাসছি। তাই শরীরের কষ্টের কথা আমাকে জানায়নি। চেয়েছিল তাড়াতাড়ি সরে যেতে।

লোপা বউদি হার্টঅ্যাটাকে মারা যায়। ব্লাডপ্রেশার হাই ছিল, ওষুধও খেত নিয়মিত। দুম করে মারা যাওয়ার কারণ হিসেবে ডাক্তার আন্দাজ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দিয়েছে, হার্টের অবস্থা খারাপ ছিল অনেক আগে থেকেই। ইকো কার্ডিয়োগ্রাম করা থাকলে সাবধানতা নেওয়া যেত। সিম্পটম বলতে বাড়ির তিনতলা সিঁড়ি ভাঙতে বর ও ছেলের তুলনায় হাঁপাত বেশি। ফিগার ছিল সামান্য ভারীর দিকে। হাঁপানোটা শারীরিক ধকলের ফল বলেই ধরে নিয়েছিল বাড়ির লোকে। এসবের মধ্যে তার মরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রমাণ হয় কী করে? দেবাংশু-জয়িতার সম্পর্কের কারণে যেন লোপা বউদি বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। এভাবেই স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য নিজের সঙ্গে জয়িতাকেও দায়ী করেছে দেবাংশু। মুখ বুজে অপমান সহ্য করেছে জয়িতা। বুঝেছে, লোকটার মাথার ঠিক নেই, তাই এসব বলছে। পাশে থেকে বুঝিয়েছে নিকট কারোর মৃত্যুতে মানুষ নিজেকেই প্রথমে দোষী সাব্যস্ত করে। মনে হয় কর্তব্যে অবহেলা হয়েছে। সত্যিই কি সমস্ত কর্তব্য করা মানুষের পক্ষে সম্ভব! কত কিছুই তো চোখের আড়ালে থেকে যায়। তুমি তো আর ইচ্ছে করে স্ত্রীর প্রতি উদাসীন থাকোনি। সেটা আমার চেয়ে আর কে বেশি জানে!—এরকম নানান কথায়, যুক্তি, সান্ত্বনায়, সাহচর্যে জয়িতা মানুষটাকে এখন একেবারেই স্বাভাবিক করে তুলেছে। এবার তার টার্ন, সমস্ত অপমান দেবাংশুকে ভোলাতে হবে ভালোবাসা দিয়ে।

মোবাইলের দিকে চোখ যায়, অনেকক্ষণ হয়ে গেল ফোন আসেনি। আবার কি তা হলে কাল? আজ আর করবে না। কাল যদি জয়িতা রিসিভ না করে কল? ফের প্রতীক্ষা? মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে জয়িতার। আচ্ছা, মা এখনও চা নিয়ে এল না কেন? মুড়ি-বেগুনি অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে জয়িতার। চা-পাতা কি বাড়ন্ত, মলিকে আনতে পাঠাল নিজেদের দোকান থেকে? ভাবনা শেষ হতেই মা ঢুকল দু'কাপ চা নিয়ে। একমুখ হেসে বলল, আর বলিস না, চিনির কৌটোটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিছুতেই।

মায়ের পিছু পিছু মলিও এসে বসল বিছানায়। জয়িতার গায়ে গা লাগিয়ে থাকল। মায়ের সঙ্গে মলিও খুঁজেছে কৌটো, চোখেমুখে ক্লান্তি। হাত নেই তো, খুঁজতে বেশি পরিশ্রম হয়। মায়ের দেওয়া কাপে চুমুক মেরে জয়িতা তাকিয়ে থাকে টিভির পরদায়। এখন অ্যাড চলছে। মা চা খাচ্ছে, কাপটা বাড়িয়ে দিচ্ছে মলির দিকে। চুমুক দিচ্ছে মলি। মা বলল, 'কাজললতা'টা একটু দিবি?

সিরিয়ালের কথা বলছে মা। গলায় অনুরোধের সুর। চ্যানেল বদলে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

টিভিতে 'কাজললতা' এনে দেয় জয়িতা। পাশে বসা বোনের উদ্দেশে বলে, দোকানের স্টক দেখছিস কিনা, বললি না তো!

—আমার দোকানে যাওয়া লাল্টু পছন্দ করে না। রাগ দেখায়। বলে কাস্টমারের মন নাকি আমার দিকে চলে যায়। আমার আড়ালে লাল্টুকে তারা জিজ্ঞেস করে, ও কীভাবে খায়, জামাকাপড় বদলায়, বাথরুম...

জয়িতা বলে ওঠে, লাল্টু বলে না কেন, ও যেভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল, সেভাবেই সব সামলে নেয়। পা দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার যে ছবিটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, সেটা দোকানে টাঙিয়ে রাখতে বলবি। উত্তরও দিতে হবে না। আঙুল তুলে ছবিটা দেখিয়ে দিলেই হবে।

মেয়ে রেগে গেছে দেখে টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিল মা। জয়িতা ফের বলে, ওসব লাল্টুর চালাকি। তুই স্টক না মেলালে ওর সুবিধে হবে চুরি করতে। দাঁড়া আজ আমি যাই। টাইট দেব ভালো করে।

—খুব বেশি রাগারাগি করিস না। তুই চলে গেলে তো... জয়িতার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মা। ইঙ্গিতটা পছন্দ হয়নি জয়িতার। দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে শাসানি।

মলি ব্যস্ত গলায় বলে ওঠে, দিদি, তোর ফোন এসেছে। ধর তাড়াতাড়ি।

আলো দপদপ করা মোবাইলটা কাঁপছে। ভাইব্রেশনের চাপা আওয়াজ। সেটটা তুলে নেয় জয়িতা, হ্যাঁ, উনি। কেটে দেয় কল। মা অবাক গলায় জানতে চায়, কী হল, কেটে দিলি! কার ফোন ছিল?

উত্তর দেয় না জয়িতা। চায়ের ফাঁকা কাপটা বাটির মধ্যে রেখে বিছানা থেকে নেমে আসে। হাতে রইল ফোন। এবারেরটা নিয়ে ছ'বার কল করল দেবাংশু। টেনশন করছে। করুক গিয়ে।

চটি পায়ে দিয়ে গায়ে পাতলা চাদর জড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল জয়িতা। বাবা মারা যাওয়ার মাস চারেক বাদে ঢোকা বেরোনোর রাস্তা হয়েছে পাঁচিলঘেরা এই উঠোনের গেট। বাড়ির একটা সাইড এটা। এগিয়ে গেলে বড়রাস্তা, বাড়ির সামনেটা সেখানেই। বাবার চেম্বার ছিল। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। চেম্বার ঘরের দরজাটা তখন সদর। লালি পাড়ার ওঁচা ছেলে লাল্টুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল। বাবা যতদিন বেঁচে ছিল,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ওদের মুখদর্শন করেনি। লালি খুব কষ্টে ছিল শ্বশুরবাড়িতে। উঠোনের এই গেট দিয়ে ঢুকে দুঃখ করে যেত মায়ের কাছে। বাবা থাকত চেম্বারে, লালির আসার খবর জানতে পারত না। পরিবেশ ভালো ছিল না লালির শ্বশুরবাড়ির। ওদের বিল্ডিং মেটেরিয়ালের বিজনেস। এককালে ভালো চলত। তারপর শুধুই পড়তির দিকে। লাল্টুর দুই দাদা, সে নিজে, এক ভাই এবং বাবা, পাঁচজনের রোজগার ওই বিজনেসের উপরেই। ওদের একটা মোটরবাইক। পাঁচজনই ক্লেম করত, বাইকটা তার। বেশ ধুয়ে মুছে রাখত। ওই বাইকটাই লালিকে বাড়ি থেকে বার করে নিল। বাবা মারা যাওয়ার পর চেম্বারটা দোকানঘর বানাল জয়িতা। বন্ধ হয়ে গেল বড়রাস্তার দিকে সদর। মুদিখানা খুলে বসাল লাল্টুকে। লালি পাততাড়ি গুটিয়ে চলে এল শ্বশুরবাড়ি থেকে। লাল্টু হয়ে গেল এ বাড়ির ঘরজামাই। ছেলেটা এমনিতে নির্বিরোধী টাইপ। হাঁকডাক নেই। তর্ক করে না। বাস্তববোধ কিন্তু একেবারেই নেই। আড্ডা, আর ফুটানি মারার ঝোঁকটা এখনও কাটেনি। লালিকে দোকানে বসিয়ে রেখে আড্ডা মারতে চলে যায়। একান্ত যেতে না পারলে বন্ধুরা চলে আসে দোকানে। তবে ভিতরে ঢোকানোর সাহস করে না লাল্টু। কাউন্টারে দাঁড়িয়েই গল্প করে। কাস্টমাররা তখন এড়িয়ে যায় দোকান। অতগুলো লোফার টাইপ ছেলে দেখলে কোন খদ্দের আসতে চাইবে? এইসব দোকানে মহিলা কাস্টমার বেশি।

লাল্টু সবসময় টিপটপ থাকতে পছন্দ করে, ব্র্যান্ডেড শার্ট-প্যান্ট। চান্স পেলেই বন্ধুদের দু'হাত খুলে খাওয়ায়। কেন বন্ধুরা ভিড়বে না ওর কাছে। মাঝেসাঝে মদ-টদও বোধহয় চলে। এখনও অবধি হাতেনাতে প্রমাণ পায়নি জয়িতা। কেমন যেন সন্দেহ হয়। লালিকে জিজ্ঞেস করলে পক্ষ নেয় বরের। বলে, না না, ওসব দোষ নেই।

তো এই ছেলের ওপর কী করে যে ভরসা করছে মা! ধরেই নিয়েছে লোপা বউদি যখন নেই, জয়িতা কিছুদিনের মধ্যেই চলে যাবে দেবাংশুর কাছে। তখন বাড়ির গার্জেন হবে লাল্টু। এখন থেকেই তাকে তুতিয়ে পাতিয়ে চলা ভালো। চটালে চলবে না। লাল্টুর ওপর কোনও বিশ্বাস নেই জয়িতার। নজরদারি না রাখলে বিজনেস নয়ছয় করে দেবে। মলিকে তাই এবার থেকে নিয়মিত দোকানে বসার ব্যবস্থা করবে জয়িতা।...গেট থেকে নেমে জয়িতা কিন্তু এক পাও এগোয়নি বড়রাস্তার দিকে। কাঁচারাস্তায় দাঁড়িয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তাকিয়ে আছে উঁচু রেলরাস্তার দিকে। খানিক আগে ট্রেনের হেডলাইটের আলো দেখেছে জয়িতা। এতক্ষণে ট্রেনটা এসে পড়ার কথা। নৈহাটি ব্যান্ডেল লাইন। ট্রেন ব্রিজে ওঠার আগে যখন উঁচু রাস্তাটা দিয়ে যায়, ছায়া পড়ে কাঁচারাস্তার উল্টোদিকে ঝিলের জলে। সন্ধের পরে দৃশ্যটা সবচেয়ে ভালো লাগে। আলোজ্বলা কামরাগুলো প্রতিফলিত হয় জলে। দ্রুত হারিয়ে যায় তারা। যেন ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন! ছোট থেকেই ওই পথে ট্রেন দেখা জয়িতার নেশা। দিনের বেলাতেও দেখতে ছাড়ে না। ট্রেন না আসা অবধি দোকানে যেতে পারছে না জয়িতা। সিগন্যালে আটকে আছে হয়তো ট্রেনটা।

মায়ের জন্য চিন্তা হচ্ছে জয়িতার। আবার আশায় বুক বাঁধছে মা, বড়মেয়েটার শেষমেষ হিল্লে হবে। বিয়ে করবে দেবাংশুকে। এতটা শিওর হতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না মাকে। বিয়ে নিয়ে কোনও কথাই হয়নি দেবাংশু-জয়িতার মধ্যে। এখন হওয়া উচিতও নয়। মাত্র ছ'মাস হয়েছে লোপা বউদি নেই। তার অস্তিত্ব এত অল্প সময়ে মিলিয়ে যাবে না দেবাংশুর মন এবং ওদের বাড়ি থেকে। সায়রের তো অনেকটাই সময় লাগবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, বিয়ের কথা জয়িতা কিছুতেই মুখ ফুটে বলবে না। বলতে হবে দেবাংশুকে। পুরোটাই ওর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। অযথাই তাড়াহুড়ো করছে মা। দোষও দেওয়া যায় না। বড়মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন ছিল অনেক। ছোট থেকে ফুটফুটে সুন্দরী জয়িতা। চেহারায় বড়ঘরের ছাপ। এই আধা গ্রাম-মফস্সলে এরকম রূপসী মেয়ে দেখাই যায় না প্রায়। ছোটবেলায় মা স্কুলে দিয়ে আসত, ক্লাস টুয়েলভ্ অবধি ছোটকাকা। তখন ছোটকাকা এ বাড়িতে থাকত। পরে চাকরি পেয়ে চলে গেছে মুম্বাই। কলেজেও মা পাহারা রাখতে চেয়েছিল। চেঁচামেচি করে সেই উদ্যোগ থেকে মাকে বিরত রেখেছিল জয়িতা। কলেজ, ইউনিভার্সিটি দুটোই তার কল্যাণীতে। ওখানে গিয়ে বেশ কিছু সুন্দরীর দেখা পেল জয়িতা। তারা কয়েকজন সৌন্দর্যে জয়িতাকেও টেক্কা দেবে। কিন্তু ব্যক্তিত্বে যাবে হেরে। একথা একবাক্যে স্বীকার করত কলেজবন্ধুরা। ওরা জানত না মায়ের থেকে ছেলেদের এড়ানোর শিক্ষা নিতে গিয়ে তার চেহারায় স্থায়ী গাম্ভীর্যের ছাপ পড়ে গেছে। সেটাকেই ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়। দু'বছরের সিনিয়ার। এম.এ-র ফার্স্ট ইয়ার প্রকাশের প্রেমে পড়ল জয়িতা। হাবুডুবু প্রেম নয়, আশপাশে প্রায় সব বান্ধবীই প্রেম করছে, জয়িতা হেডমিস্ট্রেসের মতো মুখ করে ঘুরছে একা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

একা। প্রকাশ পিছনে পড়েই ছিল, আগ্রহ ছিল আরও অনেকে ছেলের। স্মার্ট, চৌখস প্রকাশকেই বেছে নিয়েছিল জয়িতা। লোক দেখানো প্রেম যদি করতেই হয় স্মার্ট, সুন্দর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা উচিত। প্রকাশকে ভালো লাগাটা যে মনের নয়, চোখের, সেই বয়সেই বুঝতে পারত জয়িতা। ভেবেছিল সঙ্গে থাকতে থাকতে মনেও প্রবেশ করবে প্রকাশ। এমনটাই হয়তো হয়। হতে দিল না প্রকাশ। ওর একটু তাড়াতাড়ি ছিল। ছুতোনাতায় শরীর পেতে চাইত। অল্পেতে পোষাচ্ছিল না। একদিন ডে আউটে নিয়ে গেল শান্তিনিকেতন। বলেছিল, ঘুরে ফিরে চলে আসব। বোলপুরে নেমে একটা হোটেলে উঠল। অজুহাত, চান-ফান করে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। বাথরুমে যাওয়ার আগেই এমন হামলে পড়েছিল জয়িতার ওপর, বোঝা যাচ্ছিল গতিক সুবিধের নয়। জয়িতা বলেছিল, যাও না। আগে চান করে এসো। বড় ধুলোময়লা গায়ে।

বাথরুমে ঢুকেছিল প্রকাশ। জয়িতা হোটেল থেকে বেরিয়ে স্টেশন। ট্রেন ধরে সোজা বাড়ি। তারপর আর কখনও কথা বলেনি প্রকাশের সঙ্গে। কলেজে জয়িতার কাছের এক বান্ধবীর সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করল প্রকাশ। জয়িতার মনে জ্বলুনি আনাই ছিল উদ্দেশ্য। কোনও ফিলিংসই হয়নি জয়িতার। বন্ধু আলপনা দেখতে ছিল একেবারেই সাধারণ। প্রকাশকে পেয়ে খুশি হয়েছিল খুব। এম.এ. করে বেরোনোর পর ওদের আর খোঁজ রাখেনি জয়িতা। নিম দাঁতনের মতো প্রকাশের চুমুর স্বাদ অনেকদিন অবধি জয়িতার মুখে রয়ে গিয়েছিল। শরীরে হাত, আচমকা গালে, ঘাড়ে চুমু আগেও দিয়েছে প্রকাশ। বোলপুরের হোটেলে রীতিমতো বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল।

লেখাপড়া চলাকালীনই মা ভালো ভালো সম্বন্ধ জোগাড় করেছে, জয়িতা বলেছে, আগে শেষ করতে দাও কলেজ। তারপর ওসব নিয়ে ভেবো। মাস্টার্সের পর মা আরও কিছু সম্বন্ধ জোগাড় করল। পাত্রর ছবি দেখাত জয়িতাকে। মেয়ের ছবিও নিশ্চয়ই তাদের পাঠানো হয়েছে। ছেলেগুলোর ফটো দেখে বিতৃষ্ণায় ভরে যেত জয়িতার মন। মনে হত এরা শয্যাসঙ্গিনী খুঁজতে ছবি পাঠিয়েছে। জয়িতা যদি অপছন্দ করে, ওরা অন্য কাউকে বিয়ে করবে। এদের মধ্যে কোনও একজনকে কোন যোগ্যতার নিরীখে পছন্দ করবে জয়িতা? মাকে এসব কথা বলতে গেলে, বলবে, তোমার বাবাকে আমি এইভাবেই বিয়ে করেছি। বলো, তোমার বাবা একটা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

খারাপ লোক।—সব মায়েরই কমন ডায়লগ এটা। জয়িতা কী করে বলে, তোমাদের সম্পর্কের শুরুটা মোটেই সম্মানজনক ছিল না। বিয়ে এড়াতে চাকরির দোহাই দিতে শুরু করল জয়িতা। বলল, এত পড়াশোনা করলাম, সব কি জলে যাবে? চাকরি পেলে দেখবে আরও ভালো পাত্র জুটছে। তাছাড়া মাইনের কিছু টাকা তো এ সংসারেও দিতে পারব।

বাড়িতে টাকার তখন খুবই দরকার। জিনিসপত্রের দামের তুলনায় বাবার পসার বাড়ছিল না। এই গ্রাম-মফস্সলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে অ্যালোপ্যাথি ওষুধের দোকান। ডাক্তার দেখাতে হয় না, মাধ্যমিক না ওতরানো সেলসম্যান রোগ শুনে ওষুধ দিয়ে দেয়। বাবা ছিল হোমিওপ্যাথির পাশকরা ডাক্তার। বি.এইচ.এম.এস.। একসময় যথেষ্ট পসার ছিল। দূর দূর থেকে পেশেন্ট আসত। পাবলিশিং হাউসে চাকরিটা পেয়ে গেল জয়িতা। সংসারে সুসার হয়েছিল। স্বস্তি পেয়েছিল বাবা। ক্রমশ গম্ভীর হয়ে আসা মুখটায় হাসি ফিরেছিল। বাজার করতে ভালোবাসত খুব। মেয়ের টাকা হাতে পেয়ে ফিরে গিয়েছিল পুরনো অভ্যেসে। বিভিন্ন সবজি, মাছ এনে বিব্রত করত মাকে। মুখে রাগ দেখালেও চাপা আনন্দটা লুকিয়ে রাখতে পারত না মা। কিছুদিনের জন্য জয়িতাকে বিয়ের জন্য তাগাদা দেওয়া বন্ধ করেছিল। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বাবার হাসিটা কেড়ে নিল লালি। বাবার পসার কমলেও এলাকায় সম্মানটা কমেনি। বহু অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি হত। লালির শ্বশুরবাড়ির সোশ্যাল স্ট্যাটাস ছিল ততটাই নীচে। বাইরে বেরোনো প্রায় বন্ধই করে দিল বাবা। বছরখানেক পেটের জটিল কোনও অসুখে ভুগল। কিছুতেই অ্যালোপ্যাথি খাবে না। নিজের রোগের কাছে হেরে গেল ডাক্তার বাবা। বাড়িতেই মারা গিয়েছিল, আচ্ছন্ন অবস্থাতেও হসপিটালে নিয়ে যেতে পারা যায়নি। চেষ্টা হচ্ছে টের পেলেই আঁকড়ে ধরত বিছানা। কাঁদত। বাবার মৃত্যুর পর জয়িতার ঘাড়ে ভর করে ঘুরে দাঁড়াল সংসার। জয়িতা লালি লাল্টুকে নিয়ে এল বাড়িতে। বাবা থাকলে যা কিছুতেই সম্ভব হত না। দোকান খোলা হল। সংসারের চাকা স্মুদলি গড়াতে শুরু করতেই মা ফের এক সম্বন্ধ এনে হাজির। বলল, বুলবুলির বিয়েতে তোকে দেখেছে। পছন্দ হয়েছে খুব। তখনই ডিসিশন নেয়নি। খবর নিয়ে ঠিকানা জেনেছে বাড়ির। রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে আমাদের দোকানে তোকে না সাজা অবস্থায় দেখেছে। লক্ষ করেছে ভাবভঙ্গি। তোর সাইকেল ফলো করে স্টেশনে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

গেছে। ট্রেনে একই কামরায় উঠে তোর অফিস পর্যন্ত দেখে এসেছে সে। তারপর বাড়িতে জানিয়েছে নিজের পছন্দের কথা। চাকরি করে ব্যাঙ্কে। অফিসার। তোর রোজগারের এক পয়সা সে নেবে না। এই সংসারটা যে তোর টাকার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে চলে, সেটাও জেনেছে। ছেলের বাড়ি কাছেই, গঙ্গার ওপারে চুঁচড়োয়। তুই সহজেই এ বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবি। ছেলে দেখতেও বেশ ভালো। তুই ফটো দেখবি, নাকি ডেকে পাঠাব ছেলে আর বাড়ির লোককে?

টানা কথা বলে সেদিন একটুও হাঁপায়নি মা। পাত্র বিষয়ে খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিল। মাকে হতাশ করতে খারাপ লাগছিল জয়িতার। কিন্তু ব্যাপারটা চেপে রেখে মাকে আশা জোগানোটাও উচিত হত না। ডিটেল দেওয়ার পর মা তাড়া দিচ্ছিল, বল, কী করব?

দু-তিনবার তাড়া খাওয়ার পর জয়িতা বলেছিল, আমি একজনকে ভালোবাসি মা।

ঝটকা সামলে মা বলেছিল, সে তো ভালো কথা। আমাকে বলিসনি কেন এতদিন? তোর পছন্দই তো আমার পছন্দ। ছেলে কী করে? বাড়ি কোথায়?

—সে বিবাহিত। শুধু এইটুকুই বলেছিল জয়িতা।

স্তব্ধবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল মা। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল মেঝেতে। মাঝে একটা দিন কোনও কথা বলেনি মেয়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় দিন গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, বউটা কি খুব বাজে? ছেড়ে দিয়ে তোকে বিয়ে করবে?

সেই প্রথম মায়ের গলায় মন্ত্রণার সুর শুনেছিল জয়িতা। যাতে আর না শুনতে হয়, উত্তরটা দিয়েছিল চাঁচাছোলাভাবে। বলেছিল, বিয়ে নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। তবে ওর বউ খুব ভালোমানুষ। ওদের বছর পনেরোর একটা ছেলেও আছে।

চার বছর হয়ে গেল মাকে কথাগুলো জানিয়েছে জয়িতা। তখন দেবাংশুর সঙ্গে তার রিলেশনের বয়স মাস চারেকও বোধহয় নয়। অত অল্প সময়ের মধ্যে জয়িতা কিন্তু বুঝে গিয়েছিল তার পক্ষে অন্য কোনও ছেলেকে বিয়ে করা আর সম্ভব নয়। নিজের জন্য নির্দিষ্ট পুরুষটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে জয়িতার। মা প্রথম দিকে খুব খারাপ ভাষায় ভর্ৎসনা করত। বলত,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তোর এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। নিজেকে বিরাট বুদ্ধিমতী ভাবিস তো, লেখাপড়া করে দিগ্‌গজ হয়েছ! সারা জীবন একজনের রক্ষিতা হয়ে কাটাও। তাও কতদিন রাখে আবার দেখো। যৌবন ফুরোলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে ফাটা বালিশের মতো।

মায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে আর কথা চালাতে ইচ্ছে করত না জয়িতার। বলা হত না, মানুষটা আমাকে অসাবধানেও ছুঁয়ে ফেলে না। শরীরের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো হয়ে যাচ্ছে মনে হলে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।—গত চারবছর ধরে সম্পর্কটা প্রায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ছোঁয়াছুঁয়ি এখন অবশ্য হয়, তার মধ্যে যৌন তাড়না যতটা না থাকে, বেশি থাকে নির্ভরতা। হয়তো উঁচু নিচু রাস্তা পার হওয়ার সময় হাতটা ধরল দেবাংশু। অথবা এমনিই হাত ধরে খানিকটা পথ হাঁটাল। সিনেমা দেখতে গিয়ে দেবাংশুর কাঁধে মাথা রাখল জয়িতা।

বছর ঘুরে যাচ্ছে, মোহ কাটছে না মেয়ের। মায়ের চোখ থেকে মেয়ের বিয়ের স্বপ্ন উধাও হল। দৃষ্টি যেন পরিত্যক্ত পাখির বাসা। লোপা বউদির মারা যাওয়ার খবর জানার পর থেকে মায়ের চোখে সেই শূন্যতা আর নেই। ফিরে এসেছে স্বপ্ন দেখা আলো। নিতান্ত সাধারণ একটা জীবন কাটিয়ে এই সামান্য স্বপ্নটুকু দেখা তো অপরাধ নয়। জয়িতাই-বা কোন ভরসায় মাকে আশ্বস্ত করবে? তার ভালোবাসার ঝুলি যে আজও প্রতিশ্রুতিহীন।

ট্রেনটা আসছে। জয়িতা ধরেই নিয়েছিল 'হেডলাইট' ছিল তার চোখের ভুল। তাকিয়েছিল ঝিলের দিকে। বাঁধের মতো উঁচু ওই রেলরাস্তায় প্রথম লাইটহাউসের আলোর মতো হেডলাইট দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া যায় ট্রেনের শব্দ। এসে পড়ে ট্রেন, ঝিলে পড়ে তার ছায়া। সিগনাল না পেয়ে অনেক লেট হল ট্রেনটার। এখন যেন পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। ঝিলের জলেও চলেছে ট্রেন। স্বপ্নযাত্রী হয়ে জয়িতাও হাঁটা দেয় সমান্তরালভাবে।

দোকানের চাতালে উঠতেই কাউন্টারের সামনে থেকে ছিটকে সরে গেল দুটো ছেলে। নির্ঘাত লাল্টুর বন্ধু। আড্ডা মারতে এসেছিল। কব্জা লাগানো কাউন্টারের পাটাতন তুলে ভিতরে আসে জয়িতা। র‍্যাকগুলোর ওপর চোখ বোলায়। কোথাও ফাঁকা লাগছে না তো? দোকানটার স্পেস যথেষ্ট। র‍্যাক ভরাতে প্রচুর টাকার মাল লাগে। অফিস থেকে লোন নিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দোকান ভরিয়ে ছিল জয়িতা। স্টক বাড়াতে পারেনি লাল্টু। জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ার অজুহাত দেয়। ব্যবসার লাভের টাকা লাল্টুর থেকে নেওয়া হয় না। সংসারে মুদিখানার যা কিছু লাগে এই দোকান থেকে যায়। গত চারবছরে দু'বার চৈত্রমাসে মহাজনকে পেমেন্টের সময় জয়িতার থেকে কুড়ি হাজার করে টাকা ধার নিয়েছিল লাল্টু। আজও শোধ করেনি। শোধের আশাও করে না জয়িতা। তার চিন্তা, স্টক বাড়াতে না পারুক, কমিয়ে ফেলছে না তো লাল্টু? সেই কারণেই হিসেবের খাতায় নজর রাখে। লাল্টুকে বলা আছে কেনাবেচার রোজকার হিসেব যেন লিখে রাখে খাতায়।

র‍্যাক থেকে কয়েকটা প্যাকেট তুলে নেড়েচেড়ে দেখে জয়িতা, ভিতরে মাল আছে তো, নাকি ফাঁকা প্যাকেট সাজিয়ে ভরাট করেছে জায়গা? লাল্টুর এই কীর্তি বেশ কয়েকবার ধরেছে জয়িতা। মলিকে বলা আছে স্টকের হিসেব দেখার সঙ্গে যেন প্যাকেটগুলোও ঠেলে দেখে নেয়। হাত নেই তাই মাথা দিয়ে ঠেলে মলি।

কোণের দিকের কাঠের চেয়ারটায় বসল জয়িতা। বাবা এই চেয়ারে বসেই ডাক্তারি করত। টেবিল চলে গেছে জয়িতার ঘরে। একটা কাস্টমার এসে বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে গেল। জয়িতা লাল্টুকে বলে, হিসেবের খাতাটা দেখি।

যথোচিত বিনয়ে খাতাটা জয়িতাকে এনে দেয় লাল্টু। হাঁটু ভাঁজ করা পায়ের ওপর অন্য পা-টা তুলে কোলের ওপর খাতা নিয়ে হিসেব দেখতে থাকে জয়িতা। মন বসাতে পারছে না, বাঁ-হাতে ধরা মোবাইল সেটটার দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। আর বোধহয় ফোন করবে না দেবাংশু। ফোন না ধরার কারণ হিসেবে কি জয়িতার মনের সংশয়কেই নির্দিষ্ট করবে? ও কি একবারও তলিয়ে ভেবে দেখবে না, এখন আর সংশয়ে ভোগার কিছু নেই। যাকে নিয়ে ভুগত, সে চলে গেছে। তবে হ্যাঁ, সংকোচ তো আছেই। সত্যিই যদি বিয়ের কথা তোলে দেবাংশু, হাজার কথা ভাবতে হবে জয়িতাকে। ওদের চাঁদপাড়ার বাড়িতে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা? রান্না আলাদা হোক, সকলে তো এক ছাদের তলায় থাকে। ওদের মধ্যে বিল্ডিংটাও খুব ভালো। সব কথা দেবাংশুর মুখ থেকেই শোনা। ও বাড়িতে কোনওদিন যায়নি জয়িতা। দেবাংশু নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বলেছিল, বন্ধু বলে পরিচয় দেবে। জয়িতা রাজি হয়নি। বলেছে, চোখের সামনে তোমার বউ ছেলে, ভরা সংসার দেখলে, গিল্টি ফিলিং হবে আমার। আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

করতেই ইচ্ছে করবে না। লোপা বউদি, সায়রের ফটো দেখেছে জয়িতা, তাতেও অপরাধবোধ কিছু কম হয়নি। সিঙ্গল ফটো ছাড়াও বউ-ছেলে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার ছবি ছিল। তিনজনেরই আনন্দোজ্জ্বল হাসিখুশি মুখ। একটু বুঝি হিংসেও হচ্ছিল জয়িতার। ওই বাড়িতে থাকতে গিয়ে এখন নিজেকে ট্রেসপাসার্স মনে হবে না তো? পরিবারের লোক কতটা অ্যাকসেপ্ট করবে জয়িতাকে? কোনও ফ্ল্যাট-ট্ল্যাট কিনে আলাদা সংসার পাতলেও হয়। দেবাংশু রাজি হবে কি? যদি হয়ও, জয়িতার উচিত হবে না ওকে পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এতদূর ভাবার পর জয়িতার খেয়াল হয়, এ মা, নির্লজ্জের মতো কীসব ভাবছি আমি! আমারও কি মায়ের মতো অবস্থা হল? বিয়ের ব্যাপারে সামান্য হিন্ট পর্যন্ত দেয়নি দেবাংশু। এই যে আজ এতবার ফোন করল, পরে আবার করবে কিনা কোনও ঠিক নেই।

হিসেবে মন দেয় জয়িতা। দোকানে ইতিমধ্যে বেশ কিছু কাস্টমার এসেছে, গেছে। লাল্টু যেন অতিরিক্ত অ্যাটেনশন দিয়েছে তাদের প্রতি। বাড়তিটুকু নিশ্চয়ই জয়িতার উপস্থিতির কারণে। খাতা উল্টে হিসেবের কোনও বৈচিত্র পাচ্ছে না জয়িতা, রোজের বিক্রি এবং মালগ্রস্ত করার অ্যামাউন্ট একইরকম প্রায়। হিসেবপত্র রাখার খাটুনিটা বোধহয় খাটে না লাল্টু। কোনও একদিনের হিসেবটা উনিশ-বিশ করে লিখে রাখে রোজ। সেটাও লিখত না। জানে, যে কোনও সময় খাতা চেক হতে পারে। তবে লাল্টুকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করাও ঠিক হচ্ছে না। এই এলাকার পরিবারগুলো সবই প্রায় লো ইনকাম গ্রুপের। এদের দৈনন্দিন চাহিদা একইরকম। জিনিস কেনার পরিমাণও এক। জীবনে পড়া আছে, ওঠা নেই। বৈচিত্র্য নেই কোনও। একেবারে স্টিরিয়ো টাইপ। ছাপোষা এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল জয়িতা। বাবা মারা যাওয়ার পর তার একটাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই পরিবারটাকে রক্ষা করা। জীবনে নতুন কিছুর প্রত্যাশা ছিল না। এরকমই একটা সময়ে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল দেবাংশুর সঙ্গে। জয়িতার জীবনে যোগ হল অন্য মাত্রা। অফিসে বসে একটা পাণ্ডুলিপি এডিট করছিল জয়িতা। সদ্য প্রয়াত এক প্রাবন্ধিকের বই প্রকাশ হবে। ভাষা বাংলা। সত্তাবাদী দর্শনের চ্যাপ্টারে গিয়ে জয়িতা হোঁচট খাচ্ছিল বারবার। বাখতিন এবং হাইডেগারের দর্শন নিয়ে আলোচনা করছেন লেখক, জয়িতার মাঝে-মাঝেই মনে হচ্ছিল লেখক উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে দার্শনিকদ্বয়ের নাম

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ওলটপালট করে ফেলেছেন। অবশ্যই অনবধানে। ওই দুই দার্শনিক সম্বন্ধে জয়িতার ধারণা অতি সীমিত। পরস্পর বিরোধিতা ধরা পড়ছিল লেখকের ওই আখ্যানটিতে। লেখক প্রয়াত, কারেকশন করবে কে? জয়িতা গিয়েছিল তাদের প্রকাশকের কাছে সমস্যার কথা বলতে। সোমনাথদা বললেন, তুমি একবার 'প্রভাতী'র অফিসে যাও। লাইব্রেরিয়ান দেবাংশু চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলো। পড়ুয়া ছেলে। দরকার বুঝলে ওদের লাইব্রেরির বই বার করে কারেকশনে হেল্প করবে তোমাকে। আমি ফোন করে দিচ্ছি।

লাইব্রেরি কোনওদিনই খুব একটা পছন্দের জায়গা নয় জয়িতার। বড্ড অতীত অতীত গন্ধ। স্টুডেন্ট লাইফে যতটা সম্ভব লাইব্রেরিকে এড়িয়ে থেকেছে। রেফারেন্স বই আর নোটস পড়ে পার করেছে পরীক্ষার বৈতরণী। 'প্রভাতী'র লাইব্রেরিতে যেতে উৎসাহ পাচ্ছিল না জয়িতা। ওদের দৈনিক কাগজ সে পড়েও না, চেনাজানা কেউ ওই অফিসে চাকরিও করে না। নেহাত কাগজের অফিসটা জয়িতার পাবলিশিং হাউস থেকে হাঁটাপথে পাঁচমিনিটের দূরত্ব নয়, তাই সোমনাথদা ফোন করার ঘণ্টা দুয়েক বাদে গিয়েছিল। রিসেপশনে গিয়ে আই কার্ড দেখিয়ে 'লাইব্রেরিতে যাব' বলতেই ছেড়ে দিল। নামী পাবলিশিং হাউসের দেওয়া সচিত্র পরিচয়পত্রের জন্যই হয়তো। চারতলায় বিশাল লাইব্রেরি ঘরে প্রথমে কাউকে চোখে পড়েনি। র‍্যাকে থরে থরে বই সাজানো। বড় বড় টেবিলে নানান ডেলি পেপারের বাণ্ডিল। ভিতরে বেশ খানিকটা ঢুকে এসেছিল জয়িতা। এসি ঘর। কাচঢাকা জানলা, চিকের পরদা দিয়ে আড়াল করা। কোণের দিকে একটা জানলার পরদা সরানো ছিল। কাচ ভেদ করে আসা বিকেলের হলুদ আলোতে দেখা গেল নিমগ্ন এক পাঠক। মাথায় ঘন কাঁচাপাকা চুল। সাদার ভাগ অবশ্য কম। ক্লিন শেভেন, চওড়া কপাল, টিকালো নাক, খাঁজকাটা চিবুক, রং ফর্সাই বলা যায়। নাকের ডগায় রিডিং গ্লাস। চেয়ারে বসার ভঙ্গিটা নিমগ্নতাকে আরও প্রকট করেছে, একটা পা চেয়ারে তুলে বাবু হয়ে বসার মতন, অন্য পা-টা নামানো। বোতামখোলা পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে একটা হাত বুকের অংশে চালান করা। জয়িতার পায়ের আওয়াজ কানে যায়নি তার। বাহ্যজ্ঞানহীন আত্মমগ্ন সুপুরুষটিকে দেখেই ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছিল জয়িতার। বয়সের তফাতটা তখন যেন জানলার কাচ, ভালো লাগাটা কাচ পরোয়া না করে আসা হলুদ আলোর মতো।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সেদিন সাগ্রহে সাহায্য করেছিল দেবাংশু। ম্যানাসক্রিপ্টের সেই অধ্যায়টা পড়ে বলেছিল, ঠিকই নোটিশ করেছ তুমি। চিন্তাবিদের নাম দুটো এদিক ওদিক হয়ে গেছে। স্লিপ অফ পেন। লেখকদের এরকম হামেশাই হয়।

জয়িতাকে সরাসরি তুমি সম্বোধনের কারণ, জয়িতার বয়স। ছোটখাটো গড়নের জন্য আসলের থেকেও কম দেখায়। মানুষটার প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণ তৈরি হয়ে গেল জয়িতার। আগে কোনও পুরুষের প্রতি এমনটা হয়নি। নানান ছুতোনাতায় যেতে লাগল ওদের লাইব্রেরিতে। আত্মমগ্ন মানুষটা একইসঙ্গে অপরের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক। বয়সে কম সুন্দরী মহিলাকে নাগালে পেয়ে ইমপ্রেস করার কোনও চেষ্টাই করত না। কথাবার্তা খোলামেলা, বন্ধুত্বপূর্ণ। অদ্ভুত এক অভিজাত উদাসীনতা। ওই ধরনটাই যেন আরও বেশি আকর্ষণ করত। আলাপ গড়াতে লাগল। উদ্যমটা জয়িতার দিক থেকেই ছিল বেশি। দেবাংশুর সংসারের কথা মনে রেখেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সে নিজের মনের মতো পুরুষটির দেখা পেয়েছে। বেশিরভাগ খুঁতখুঁতে মেয়ে পায় না। মেনে নিতে হয় কোনও একজনকে। সিঙ্গল থাকার চেয়েও যা দুর্বিষহ। আবার সিঙ্গল মেয়ের জীবন হয় বড় দীর্ঘ, নিস্তরঙ্গ। ভীষণ দমচাপা। জীবন তো একটাই, কেন এতরকমের অবিচার মেনে নেবে জয়িতা? তার দোষটা কোথায়? প্রকৃতি কেন তাকে এরকমটা করে গড়েছে? দেবাংশুর আগে কত পুরুষের সঙ্গেই তো আলাপ হয়েছে, নিজের যাতে পুরুষটিকে ভালো লাগে, তার জন্য মন উদার করেছে জয়িতা। দশমিনিট পর থেকেই মনে হয়েছে, এর থেকে আমার কিছু পাওয়ার নেই। এমন কিছু বলছে না বা করছে না, যা থেকে আমি সমৃদ্ধ হই। বরং পুরুষটির প্রতিটি কথার মধ্যে শিকারের দিকে এগিয়ে যাওয়া বাঘের নিঃশব্দ পদক্ষেপ শুনতে পেত। সোজা কথায় দেবাংশু বাদে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে আলাপ হওয়া কোনও পুরুষকেই নিজের থেকে বেশি বুদ্ধির মনে হয়নি। কিছু মেয়ে অবশ্য নিজের চেয়ে কম বুদ্ধির পার্টনারই চায়। কিন্তু কারোর প্রতি বিস্ময় যদি না তৈরি হয়, টান বা আকর্ষণ আসবে কোথা থেকে?

দেবাংশুর লেখার হাতটা বেশ ভালো। মূলত সমালোচনা লেখে। বই, সিনেমা, নাটক সব বিষয়ে আগ্রহ এবং ধ্যানধারণা খুব পরিষ্কার। গদ্য ঝরঝরে, সাবলীল। পাণ্ডিত্য দেখানোর ঝোঁক নেই। রিপোর্টিংও করতে হয় মাঝে মাঝে। দুটো কাজই অফিসের নির্দেশে করে। নয়তো লেখার চেয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বেশি পড়তে ভালোবাসে সে। ওর লেখা রিভিউ পড়ে প্রশংসা করলে বলে সমালোচনা সবচেয়ে সহজ কাজ। বিষয়টা সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই, একশোটা ভুল নিশ্চয়ই ধরে ফেলতে পারব।—এটা বিনয়। দেবাংশু কাজের ব্যাপারে যথেষ্ট সিরিয়াস এবং অনেস্ট। সমালোচনা করতে গিয়ে প্রশংসা বা নিন্দা কোনওটাতেই কার্পণ্য করে না। ওর লজিকও ভীষণ স্ট্রং।

—ও লাল্টুদা, বলো না কবে এনে দেবে? কতদিন ধরে ঘোরাচ্ছ! তোমার ধান্দা কী বল তো? রোজ রোজ আসা যায়!

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে ন্যাকামি করছে। 'ধান্দা' শব্দটা চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে দিয়েছে জয়িতার। মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না, কাউন্টারের পাশে একটা পিলার আছে, তার আড়ালে মেয়েটা। জয়িতাকেও নিশ্চয়ই খেয়াল করেনি সে। লাল্টু পড়েছে খুবই অপ্রস্তুত অবস্থায়, চাপা গলায় মেয়েটাকে কী সব যেন বলে ভাগানোর চেষ্টা করছে। মেয়েটাও শুনবে না, করেই যাচ্ছে ন্যাকামি। ওটা করতেই তো এসেছে দোকানে। লাল্টু কড়া হতে পারছে না কেন? মেয়েটার প্রতি নিশ্চয়ই দুর্বলতা দেখায় অন্য সময়, এখন পারছে না সামলাতে।

হিসেবের খাতা হাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জয়িতা। লাল্টুকে বলল, কী এনে দেওয়ার কথা আছে ওকে?

—একটা ফেসওয়াশ। মার্কেটে এখন সাপ্লাই নেই। নীচু গলায় উত্তর করল লাল্টু।

—ওর থেকে কোনও অ্যাডভান্স নিয়েছ?

—না।

পরের কথাটা বলতে হল না জয়িতাকে, মেয়েটা ভীরু পায়ে নেমে যাচ্ছে দোকান থেকে। খুব সেজেগুজে এসেছিল। মেয়েটার যাওয়া দেখে জয়িতার মনে হল, সে নিজেই যেন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। লাল্টু বিবাহিত জেনেও মেয়েটা যেমন মন ভোলাতে এসেছিল, জয়িতাও তো দেবাংশুর মনোরঞ্জন করতে যায়। ...দমে গেল মনটা। ফের চেয়ারে খাতা খুলে বসে জয়িতা। মেয়েটাকে অপমান করার অধিকার তার নেই।

—দিদি, হিসেবে কোনও গণ্ডগোল আছে? জিজ্ঞেস করল লাল্টু।

খাতার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে জয়িতা। লাল্টু নিশ্চয়ই খেয়াল করছে জয়িতা হিসেব দেখছে না। প্রথমদিকে পাতা ওলটালেও, অনেকক্ষণ

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

একই পাতায় থেমে আছে। লাল্টুকে দেখিয়ে পাতা ওলটাল জয়িতা। কল আর আসবে না জেনেও জয়িতার মন পড়ে রয়েছে ফোনে। সত্যিই কি সে খানিক আগে কাউন্টারের আসা মেয়েটার মতো হ্যাংলা? একতরফা দেবাংশুর সঙ্গ পাওয়ার চেষ্টা করে গেছে? তা কিন্তু নয়, এক এক সময় দেবাংশুও কিন্তু পাগল হয়েছে জয়িতার জন্য। সবচেয়ে বড় উদাহরণ যেবার ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স মিট কভার করতে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিল। পাঠিয়েছিল ওদের অফিস থেকেই। ট্রেনে ফেরার পথে ফোন করেছিল জয়িতাকে। প্রথম কল ধরতে পারেনি জয়িতা। তাদের গরিফায় তখন প্রবল ঝড়বৃষ্টি। শুনতে পায়নি রিং টোন। দ্বিতীয়বারে ধরেছিল। ওপ্রান্তে দেবাংশু বলল, নৈহাটি স্টেশনে চলে এসো। ট্রেন মিনিট দুয়েক স্টপেজ দেবে। তোমাকে একটা গিফট দেওয়ার আছে।

জয়িতা হাসতে হাসতে বলেছিল, ওই গিফট তুমি বাড়ি নিয়ে চলে যাও। ফোনে ঝড়বাদলার শব্দ শুনতে পাচ্ছ? এখন যা ওয়েদার, কোনওমতেই বেরোনো সম্ভব নয়। পরে নেব গিফট।

দেবাংশু শুনল না কথা। আকুল কণ্ঠে বলেছিল, প্লিজ ছাতা মাথায় দিয়ে একবারটি এসো। তুমি তো জানো, বাড়িতে প্রাইভেসি বলে আমার কিছু নেই। কাঁধ থেকে লাগেজ নামানোর পরই ওটা লোপার জিম্মায় চলে যাবে। তোমার গিফটটা আলাদা করার সুযোগ পাব না।

—চোরাই গিফট পেতে আমার বয়ে গেছে। জিনিসটা বউকেই দিও। বলে ফোন কেটে দিয়েছিল জয়িতা।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছিল। একঘণ্টাও হয়নি, আবার দেবাংশুর ফোন, আমি চারবাতির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। নেমে পড়েছি ট্রেন থেকে। তুমি যদি না আসো ভেজা জামাকাপড় সুদ্ধু তোমার বাড়ি চলে যাব। বুঝবে মজা।

—তোমার মাথা-টাথা কি খারাপ হয়ে গেল দেবাংশু। এত বৃষ্টি দেখেও তুমি নেমে পড়লে ট্রেন থেকে। সঙ্গে তো ছাতাও নেই, রিকশা পেয়েছ? চারবাতি অবধি এলে কীভাবে?

—রিকশাতেই আছি। তুমি এসো তাড়াতাড়ি।

ছাতা মাথায় সাইকেল চালিয়ে জয়িতা আধভেজা হয়ে চারবাতি মোড়ে পৌঁছে দেখেছিল, দেবাংশু ভিজছে। তখন এমন বৃষ্টি, দশহাত দূরের জিনিস

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দেখা যাচ্ছে না। 'রিকশা কোথায়?' জিজ্ঞেস করতে, বলেছিল, 'মিথ্যে বলেছি। পাইনি রিকশা।'

মুঠোয় ধরা গিফটটা দিয়েছিল জয়িতাকে। লক্ষ্ণৌয়ের আতর। শিশিটার কাটিং খানদানি। আতরের গন্ধটা কেমন, জানে না জয়িতা। আজ অবধি ব্যবহার করেনি। ওই দিনের বৃষ্টির গন্ধের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো হবে না।

বেকার খাতা নিয়ে বসে আছে জয়িতা। লাল্টুও বুঝতে পারছে দিদির হিসেবে মন নেই। খাতা বন্ধ করে লাল্টুর দিকে বাড়িয়ে জয়িতা বলে, অফিসের পর হিসেব আর মাথায় ঢোকে না আমার। এবার থেকে মলি পুরোটা দেখবে। কাস্টমাররা ওর ব্যাপারে কৌতূহল দেখালেও দোকানে থাকবে মলি।

ঘাড় হেলিয়ে খাতাটা ফেরত নিল লাল্টু। এমন সময় মলিরই গলা, দিদি, বাড়িতে আয়।

ভয়, আশঙ্কা মেশানো ডাক। দোকানের চাতালে এসে দাঁড়িয়েছে মলি। মুখটা ভীষণরকম থমথম করছে ওর। বেশ ঘাবড়েই যায় জয়িতা। বিষম উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?

—ঘরে আয়, বলছি। বলে দোকানের চাতাল থেকে নামল মলি। জয়িতা তড়িঘড়ি কাউন্টারের বাইরে বেরোয়। কী ঘটেছে লাল্টুও জানে না। তবু বলে, আমি যাব? হাত তুলে লাল্টুকে বিরত করল জয়িতা। নেমে এল বড় রাস্তায়।

নিজের ঘরে দেবাংশুকে দেখে চমকাল না জয়িতা। কাঁচা রাস্তা দিয়ে আসার সময় মলি আগমনবার্তাটা জানিয়েছে। খুশি খুশি মুখের দেবাংশুকে সহজ ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে মনে হচ্ছে যেন এ বাড়িতে নিত্য যাতায়াত। পাশে ঘোমটা টানা মা, ঠোঁটে লাজুক হাসি; মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গেল জয়িতার। দেবাংশুর দিকে খর চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, হঠাৎ বাড়ি চলে এলেন! কী ব্যাপার?

জয়িতার এমত সম্ভাষণ আশা করেনি দেবাংশু। থতমত খেয়ে বলল, কতবার ট্রাই করলাম। পাচ্ছি না ফোনে। ভাবলাম একবার খবর নিই।

—আগেও তো কতবার ফোন ধরিনি। তখন তো আসেননি বাড়িতে। এখন হঠাৎ দরদ উথলে উঠছে কেন? কথাটা বলার পর নিজের গলাই অচেনা ঠেকল জয়িতার কানে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তিন

কুয়াশা অনেকটাই সরে গেছে। খানিক আগে এমন ঘন হয়েছিল, মাঠে যে এত লোক আছে বোঝাই যায়নি! প্রাতঃভ্রমণকারীরা পাক দিচ্ছে মাঠ, বেশ কিছু লোক ফ্রি হ্যান্ড করছে। ছোটদের একটা দল এলোমেলো দৌড়োচ্ছে। প্লাস্টিকের বড় বল নিয়ে। আজ অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দেবাংশুর। কদিন ধরেই এরকম হচ্ছে। এমনিতে সে লেট রাইজার। কাল ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেছে। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। তাই আজ ঘুম ভাঙতেই পাতলা চাদর গায়ে চলে এসেছে বাড়ির সামনের মাঠে। এই মাঠেই খেলাধুলো করে বড় হয়েছে দেবাংশু। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা ডিঙোলেই মাঠ। রাস্তা ধরে বাড়ি ঢোকা-বেরোনোর সময় মাঠটা ডাকে। যত বয়স হচ্ছে আকুল হচ্ছে ডাক। লোকে যে আজকাল খুব স্বাস্থ্যসচেতন হয়েছে এত সকালে মাঠের সমাগম দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মর্নিংওয়াক ছিল সাহেবি কেতা। মফস্সলেও যে এভাবে প্রভাব পড়েছে, আজ ভোরে মাঠে না এলে অজানাই থেকে যেত দেবাংশুর। ইদানীং চেনা পরিচিত বেশিরভাগ লোক বলে, সকালের দিকে একটু ওয়ার্কআউট করি। দেবাংশুর মনে হত অধিকাংশই মিথ্যে বলে। এদের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

শরীরে কায়িকশ্রমের কোনও ছাপই নেই। সবটাই সুখ-আহ্লাদের প্রলেপ। আজ প্রমাণ হল দেবাংশুর ধারণা ছিল ভুল। চোখের সামনে দেখছে মাঠ জুড়ে সুস্থসবল জীবনের প্রতি কী প্রভূত বাসনা! মানুষ কি আজকাল নিজের জীবনকে একটু বেশিই ভালোবাসছে? আগে তো এত উদ্যম চোখে পড়ত না। জীবন থেকে দেদার মজা খুঁজে পাচ্ছে মানুষ। কীভাবে পাচ্ছে? এত মজার রসদ এল কোথা থেকে? জানে না দেবাংশু। আসলে খেয়াল করে না। নিজের জীবনের প্রাপ্তি নিয়ে সে কোনওদিনই ভাবিত নয়। অন্যকে আনন্দ, মজায় থাকতে দেখলে তার বেশ ভালোই লাগে। যেমন, এই মুহূর্তে এত মানুষকে শরীরচর্চা করতে দেখে মনটা রিফ্রেশ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

—আরে, দেবু যে! অন্যদিন তো দেখি না। বলে দাঁড়িয়ে গেল অমিতদা। পরনে ট্র্যাকসুট। ফের বলল, মর্নিংওয়াক?

—ওই আর কি।

—ভেরি গুড। অভ্যেসটা করো। সারাদিন চাঙ্গা থাকবে। বলে, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল অমিতদা। কাস্টমসে চাকরি করে। এককালে চুটিয়ে খেলাধুলো করত। অনেকদিন পর পাড়ার একজন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কথা বলল দেবাংশুর সঙ্গে। মাঠের সাইড ধরে হাঁটা শুরু করল দেবাংশু। মর্নিংওয়াকের উপযুক্ত ড্রেস সে এখন পরে নেই। হাওয়াই চটি, পাজামা-পাঞ্জাবি আর চাদর। সকাল এবং শরীরচর্চার মুডে আছে বলেই অমিতদা এত সহজভাবে কথা বলল। লোপা মারা যাওয়ার পর থেকে পাড়ার সবাই দেবাংশুর দিকে কেমন যেন করুণা, সমবেদনার দৃষ্টিতে তাকায়। পাড়ার ফোক্কড় ছেলেগুলোও সিরিয়াস হয়ে যায় দেবাংশুর মুখোমুখি হলে। অফিসে প্রথম দিকে এরকম পরিস্থিতিই ছিল। দিন যেতে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কাজের জায়গা, সকলের সঙ্গে দুবেলা দেখা হচ্ছে। মন খারাপের প্রসঙ্গ বেশিদিন স্থায়ী হয় না ওখানে। পাড়ার লোক নিয়েই মুশকিলে পড়েছে দেবাংশু। শুধু পাড়া কেন, বাড়িতেও ওই একই অবস্থা। ছ'মাস হয়ে গেল লোপা চলে গেছে, এখনও বাড়ির লোক তার সামনে স্বাভাবিক হতে পারছে না। একটু দূর থেকে বিষণ্ণ মুখে দেবাংশুকে লক্ষ করে। দু-চারবার দেবাংশু নিজ উদ্যোগে বাড়ির লোকের সঙ্গে সাবলীল ব্যবহার করতে গেছে, তারা সহজ হয়নি। দৃষ্টিতে ঘন হয়েছে বেদনা। ওরা ধরেই নিয়েছে দুঃখ ভোলার জন্য দেবাংশু স্বাভাবিক হওয়ার অভিনয় করছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বউদি, ভাইবউ এখনও লোপার স্মৃতি আওড়াতে গিয়ে গলা ভারী করে বসে, চোখে জলও এসে যায়। মেজদা বিয়ে করেনি, করলে বউয়েদের দলে আর একজন যোগ হয়ে বাড়ির পরিবেশ আরও বিষাদময় করে তুলত। দেবাংশু কিন্তু শোক কাটিয়ে উঠেছে। মেনে নিয়েছে লোপার না থাকাটা। ঘটনার গোড়ায় মাস দুয়েক অন্তত দেবাংশুর মনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। মাথা কাজ করছিল না ঠিকমতো। লোপার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছিল বারে বারে। কোনও যুক্তি নেই কিন্তু। ঘুমোলেই লোপা স্বপ্নে চলে আসত। একেবারে জীবন্ত। ঘুম ভাঙলেই বিষণ্ণতা পেড়ে ফেলত দেবাংশুকে। ঘুমের ওষুধ খাওয়া শুরু করল। দিনের অনেকটা সময় ঘুমিয়ে কেটে যেত। স্বপ্নে লোপার আনাগোনা চলত বেশি। ঘুমচোখে অফিস চলে যেত। চাকরি করার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল দেবাংশুর। সায়রের মুখ চেয়ে ছাড়েনি। বাবাকে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকতে দেখলে মনে বিরূপ ছাপ পড়বে ওর। সায়রের চারপাশটা সচল, স্বাভাবিক না রাখলে মনোবিকাশে সমস্যা হবে। সদ্য কলেজে পা রেখেছে সে। দেবাংশু চাকরি ছাড়লে মা মরা ছেলেকে মানুষ করতে অসুবিধে হত না। সাতচল্লিশ বছর বয়সে সে যতটুকু টাকা সঞ্চয় করেছে, বাপছেলের চলে যেত। লোপার সঞ্চয় এবং বাপের বাড়ি থেকে প্রাপ্তি, সেও কিছু কম টাকা নয়। পুরোটাই এখন সায়রের নামে। দেবাংশুই উদ্যোগ নিয়ে মা-বেটার ব্যাঙ্কে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিল। লোপা মজা করে বলত, কী ব্যাপার গো, তুমি কি আমাদের রেখে পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছ?

পালিয়ে গেল লোপা নিজেই। স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেওয়া বলতে, প্রথমে আর্থিক স্বাধীনতাই বোঝে দেবাংশু। কিছু কেনার ইচ্ছে হলে স্বামীর কাছে বারবার হাত পাতার চেয়ে অপমানজনক আর কিছু হয় না। লোপা বেশ কিছু গানের টিউশানি করত। টাকা জমা হত ছেলে আর ওর জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে। লোপা চলে যাওয়াতে সায়র এখন অনেক টাকার মালিক। এটিএম কার্ডও আছে ওর। উনিশ প্লাস ছেলের হেপাজতে অত টাকা রাখা ঠিক হচ্ছে কিনা, সবে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসেছিল দেবাংশু। সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছিল বড় অঙ্কের অ্যাকাউন্টটার এটিএম কার্ড চেয়ে নিয়ে ওর নামে ছোট অ্যামাউন্টের অ্যাকাউন্ট খুলে দেবে। সেটার এটিএম কার্ডটা দিয়ে রাখবে সায়রকে। কথাটা ছেলের কাছে কীভাবে পাড়বে, ভাবছিল সেটাই। প্রসঙ্গটা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তোলা মানেই তাকে বুঝিয়ে দেওয়া, তোমার ওপর ভরসা নেই আমার। তিনদিন আগে সায়র এমন এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটাল, শিকেয় উঠে গেছে ওসব ভাবনাচিন্তা। কার্ডটা আপাতত কোনওভাবেই চাইতে পারবে না দেবাংশু। ওইদিন বেশ রাত করে বাড়ি ফিরেছিল সায়র। ঘর অবধি নিজে হেঁটে পৌঁছতে পারেনি। উঠোন থেকে দালানে ওঠার সিঁড়িতে শুয়েছিল। তারপর আরও অনেক সিঁড়ি ভাঙা বাকি। ভাগ্যিস সেদিন মোটরবাইকটা নিয়ে বেরোয়নি। বাড়ির সকলেই নিশ্চয়ই ওকে ওই অবস্থায় দেখেছে। হাঁকডাক করে দেবাংশুকে ডাকেনি। উদয় সায়রের একটা হাত কাঁধে নিয়ে ওকে ধরে রেখে উঠে এসেছিল তিনতলায়। এ বাড়ির নেক্সট জেনারেশনের সবার বড় উদয়। বড়দার বড় ছেলে। দেবাংশুর ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল, সেজকা, দেখো কী কাণ্ড করে এসেছে।

মদ খেয়ে এসেছে, কথাটা প্রথমে দেবাংশুর মাথাতেই আসেনি। আতঙ্কিত হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ভেবে। বিছানা থেকে নেমে কাছে যেতেই মদের গন্ধটা পায়। উদয়ের কাঁধ থেকে ছেলেকে নিজের কাঁধে নিয়ে বাথরুমে গিয়েছিল দেবাংশু। সায়র তখন ভালো করে চোখ খুলতেই পারছে না।

বাথরুমে ছেলেকে বসিয়ে দেবাংশু বলেছিল, গলায় আঙুল দিয়ে বমি করো। ভালো লাগবে শরীরটা। নয়তো কষ্টটা যাবে না।

কথা শুনেছিল সায়র। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করল বেশ খানিকটা। দেবাংশু ওর ঘাড়ে মাথায় জল চাপড়ে, মুখ ধুয়ে নিয়ে আসছিল ঘরে। ছেলেকে নিয়ে শোবে ঠিক করেছিল। হাত ছাড়িয়ে সায়র চলে গেল নিজের ঘরে। দড়াম করে বন্ধ করল দরজা। দেবাংশু ভেবেছিল নিজের অপকীর্তির সংকোচে শুতে চাইল না বাবার সঙ্গে। ঘণ্টাখানেক বাদে খাবার গরম করে ছেলেকে ডাকতে গিয়েছিল। দরজা না খুলেই 'খাব না' জানিয়ে দিয়েছিল সায়র। দেবাংশু জোর করেনি। কোথাও আকোচপাকোচ খেয়েছে, তার ওপর মদ। অ্যাসিড হয়ে গেছে। কার পাল্লায় পড়ে খেল মদ? দেবাংশুর চিন্তা হচ্ছিল খুব। মদ-টদ যে খায়, এমন কোনও সাইন এতদিন পায়নি ছেলের থেকে। সিগারেটও খায় না। ড্রিঙ্ক কি আজই প্রথম করল? ছেলের ওপর এবার থেকে একটু নজর রাখা উচিত। সায়রের স্বভাবচরিত্র, হাবভাব এতটাই ভালো, নজরে রাখার কথা মাথাতেই আসবে না কারোর। বেহেড হওয়ার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মতো মদ খেতেই বা গেল কেন?...দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়নি দেবাংশু। ধরে নিয়েছিল, ইয়াং ছেলে, একটু আধটু গোলমাল তো পাকাবেই। ড্রিঙ্ক করাটা ওদের কাছে অ্যাডভেঞ্চারের মতো। নেশার পর্যায়ে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে না। যথেষ্ট বোঝদার ছেলে। দেবাংশুও বোঝাবে।

একলা রাতের খাবার খেয়ে শুতে চলে গিয়েছিল দেবাংশু। পরেরদিন দু'জনের চা নিয়ে ছেলের ঘরে যায়। সকালের প্রথম চা দেবাংশুই করে। এক ডাকে দরজা খুলে দিয়েছিল সায়র। বাবার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসে। মাথা নিচু করে রেখেছিল, দেবাংশু বুঝল, গতরাতে অপকীর্তির অণুশোচনা। ভুল বুঝেছিল সে। প্রমাণ হল পরবর্তী কথোপকথনে। দেবাংশু চেয়ারে বসে ছেলেকে সহজ করার জন্য মজার সুরে বলেছিল, কাল হঠাৎ মাথায় কী চাপল, মদ খেয়ে ফেললি।

—ইচ্ছে হল খেলাম। সপাট উত্তর দিয়েছিল সায়র।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েও, দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে দেবাংশু বলেছিল, একদিন ইচ্ছে হয়েছে, খেয়েছিস। সেটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু এমন খাবি কেন, যেখানে সেল্ফ কন্ট্রোল চলে যেতে পারে? কী বিচ্ছিরি সিন হল বল তো! কী ভাবছে বাড়ির লোক!

চকিতে বাবার দিকে ঘাড় ফিরিয়েছিল সায়র। চোখে বারুদজ্বলা দৃষ্টি। বলেছিল, তার মানে তুমি বলছ লুকিয়ে-চুরিয়ে খেতে। যাতে বাড়ির লোক কিছু বুঝতে না পারে।—সামান্য পজ নিয়ে বলে, দেখো, কোনও লুকোচুরিতে আমি বিশ্বাসী নই। যতটা ইচ্ছে হয়েছে, খেয়েছি। পড়ে থেকেছি বাড়ির উঠোনে। তোমাদের দয়া হয়েছে তুলে নিয়ে এসেছ। ঘেন্না করে বাইরে ফেলে দিয়ে আসলেও আমার কিছু যেত আসত না।

ছেলের এমত বিস্ফোরণে ঘর থেকে প্রায় পালিয়ে এসেছিল দেবাংশু। কান মাথা ঝিমঝিম করছিল। সায়র তো কখনও এভাবে কথা বলে না। বন্ধুবান্ধব কারোর সঙ্গে ঝগড়া হল কি? প্রথমেই হিমিকার কথা মাথায় এল। প্রেমে আঘাত পেলে ইয়াং ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এরকম বিক্ষুব্ধ ভাব দেখা যায়। মদ-টদ খেয়ে ফেলে। কিন্তু হিমিকাকে তো বেশ খোলা মনের মেয়ে বলেই মনে হয়। সায়রকে এতটা বিক্ষুব্ধ করার মতো কথা কি সে বলবে?...সংশয় দূর করতে অফিস যাওয়ার পথে হিমিকাদের বাড়ি চলে গিয়েছিল দেবাংশু। বেল টেপার পর দরজা খুলেছিল হিমিকার মা।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ডেকেছিল ভিতরে। দেবাংশু বলে, পরে একদিন আসব। এখনই গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে, নয়তো লেট হয়ে যাবে অফিসে। হিমিকার সঙ্গে দুটো কথা বলেই চলে যাব। যদি একটু ডেকে দেন...

ডেকে দিতে হয়নি, দেবাংশুর গলা পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল হিমিকা, কী ব্যাপার কাকাবাবু?

ওদের সদর থেকে দু'কদম পিছিয়ে এসেছিল দেবাংশু। হিমিকার মা চলে গেল ভিতরে। ইশারায় হিমিকাকে সামনে ডেকে নিয়ে হাসিমুখে দেবাংশু জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁরে, তোদের মধ্যে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি? সায়রকে কীরকম যেন ডিসটার্বড লাগছে।

—সামনে এগজ্যামের জন্য। প্রিপারেশন হয়নি। আমাকে তো বলেই দিয়েছে। একমাস মিট করবে না। আপনি চিন্তা করবেন না কাকাবাবু! ক-দিন টানা স্টাডির মধ্যে থাকলে ও এমনিই নর্মাল হয়ে যাবে।

হিমিকার কথা শুনে বোঝা গিয়েছিল সমস্যাটা ওকেও গোপন করেছে সায়র। মদ খেয়ে কীসের প্রিপারেশন? পরীক্ষার আগে চেপে পড়াশোনা করার ছেলেও সে নয়। রাত-টাত কোনওদিনই জাগেনি। নিজের পড়াটা নিয়মিতই করে। কখনও তাগাদা দিতে হয় না। কলেজে ঢোকার পরও ছেলেকে ফাঁকি দিতে দেখেনি দেবাংশু। হিমিকাকে একমাস মিট করবে না মানে, এড়িয়ে চলতে চাইছে তাকে। বেশ বড় কোনও গণ্ডগোল হয়েছে বলেই মনে হয়। হিমিকাকে এসব বলে ঘাবড়ে দিতে চায়নি দেবাংশু। মদ খাওয়ার কথাটাও তোলেনি। ও যে বিশ্বাস নিয়ে আছে, সেটা নষ্ট করা ঠিক হবে না। শেষকথা দেবাংশু বলেছিল, আমি যে খবর নিতে তোর কাছে এসেছি, ওকে একদম বলবি না। এটা তোর আর আমার প্রাইভেট ব্যাপার।

—বলব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। হাসিমুখে আশ্বাস দিয়েছিল হিমিকা।

বিষয়টা কিন্তু চাপা থাকল না। অফিস থেকে ফেরার পর ছেলের জেরার মুখে পড়েছিল দেবাংশু। রীতিমতো জবাবদিহির ভঙ্গিতে সায়র জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি হিমিকার কাছে গিয়েছিলে কেন?

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দেবাংশুর, বিশ্বাস রাখতে পারল না মেয়েটা। সায়রকে বলেছিল, গিয়েছি যখন জেনেছ, কেন গেছি সেটাও নিশ্চয়ই জানো। মিছিমিছি জিজ্ঞেস করছ কেন?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—গেছ, শুনেছি অন্য লোকের মুখে। কেন গিয়েছিলে হিমিকা কিছুতেই বলছে না। যা পট্টি পরিয়েছ!

সায়রের গলায় শ্লেষ থাকলেও, হিমিকার কারণে মন তেমন ভারাক্রান্ত হয়নি দেবাংশুর। মেয়েটা কথা রেখেছে। ছেলে যে যোগ্য পার্টনার বেছেছে, প্রমাণ পেয়ে ভালো লাগছিল বেশ।

এই ক-দিনে হঠাৎ যেন দূরে সরে গেল ছেলেটা। কলেজে ওঠার পর কারা ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানে না দেবাংশু। চেনা থাকলে জিজ্ঞেস করে জানতে পারত, ওর আচরণ পরিবর্তনের কারণ। পাড়ার কোনও বন্ধুর সঙ্গে আজকাল আর মেশে না। গণ্ডগোলটা কোথায়, জানা যাবে কীভাবে? বড় ধরনের কিছু তো একটা হয়েইছে, হিমিকাকে পর্যন্ত এড়িয়ে যাচ্ছে। যেকোনও সমস্যায় ওর তো হিমিকার সাপোর্ট নেওয়ার কথা। তবে পরে আর বেচাল কিছু দেখা যায়নি। মদ খেয়ে ঢোকেনি বাড়িতে। রোজ কলেজ যাচ্ছে। অন্তত বেরোচ্ছে কলেজ যাওয়ার সময়ে, পৌঁছচ্ছে কিনা জানে না দেবাংশু। ফলো করার সাহস দেখায়নি। নিজের ঘরে বসে পড়াশোনা করছে সায়র, বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলছে স্বাভাবিকভাবে। এমনকী রান্নার বউটার কাছে একদিন আবদার করল, অনেকদিন সুক্তো খাইনি। বানাবে? মা দারুণ রাঁধত।

রান্নার বউ শেফালির থেকে ছেলের আবদার শুনে সুক্তোর বাজার নিয়ে এসেছিল দেবাংশু। অনেক ধরনের সবজি, মশলা লাগে। লোপা লিস্ট করে দিত। বিনা লিস্টে সব বাজার এনে ফেলল দেবাংশু। শেফালি তাতে একটু বেশিই নার্ভাস হয়ে গেল। বুঝেছিল দেবাংশুদের সুক্তো খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। খুঁতখুঁত করছিল শেফালি, আমি কি বউদির মতো পারব! বউদির রান্না তো দেখিনি।

রাতে ছেলের সঙ্গে খেতে বসে দেবাংশু জিগ্যেস করল, কীরে, কেমন হয়েছে সুক্তো? মায়ের ধারেকাছে গেছে?

—শেফালি মাসির মতো হয়েছে। ছোট্ট উত্তর দিয়েছিল সায়র। সেদিনের পর থেকে এমনভাবেই কথা বলছে। যেচে কিছু বলছে না। দেবাংশুকে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। ওর উত্তরগুলো শুনে দেবাংশুর কেন জানি মনে হচ্ছে, কিছু একটা মিন করছে। অন্তর্নিহিত মানে আছে কিছু, দেবাংশু ধরতে পারছে না। এটিএম কার্ডটা ফেরত চাওয়ার এখন তো আর কোনও প্রশ্নই নেই। সায়রের ব্যাপারে কারোর সঙ্গে একটু আলোচনা করতে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পারলে ভালো হত। পরামর্শের জন্য জয়িতাই দেবাংশুর নিকটজনের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত। আর একজন হচ্ছে দেবাংশুর মেজদা। কিন্তু তার অ্যাডভাইসের মধ্যে যুক্তি থাকলেও কাজের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যা হয়। উদ্ভট আইডিয়া দেয় এমন...। জয়িতা সে-তুলনায় অনেক বাস্তববাদী। মাথা পরিষ্কার। সায়রের হঠাৎ বদলের কয়েকটা সম্ভাবনার কথা অনায়াসে বলতে পারত। এরকম একটা দরকারি সময়ে জয়িতা পাশে নেই। ওদের বাড়িতে যাওয়ার কারণে দেবাংশুর সঙ্গে যে ব্যবহারটা করেছে জয়িতা, দেবাংশু আর যোগাযোগ রাখেনি। রাখতে চাইলে জয়িতা যে রাজি হত, নিশ্চয়তা নেই কোনও। ওর দিক থেকে পজিটিভ কোনও সাইন থাকলে দেবাংশু নিশ্চয়ই যোগাযোগ করত। একটা অন্তত মিসড কল। দেবাংশুর এখন যা সংকট, জয়িতার ওপর রাগ করে বসে থাকলে চলবে না। জয়িতার ওরকম হঠাৎ খেপে যাওয়ারও কোনও মানে খুঁজে পায়নি দেবাংশু। ওদের বাড়ি গিয়ে কী এমন অপরাধ করেছে? জয়িতা ফোন ধরছে না দেখে সত্যিই টেনশন হচ্ছিল তার। আলাপের গোড়ার দিককার কথা বাদ দিলে, জয়িতাকে ফোন করলে কিন্তু ধরে। মিসড কল হয়ে গেলে, কল ব্যাক করে খানিক বাদেই। লোপা মারা যেতে কাউকে ফোন করা বা ধরার কোনও আগ্রহই ছিল না দেবাংশুর। জয়িতা তখন নিজে থেকেই ফোন করত। অদরকারি বিষয় নিয়ে হত কথা। যেমন, আজ আপনাদের ওখানে গরম কেমন? যাই বলুন, কলকাতা থেকে দূরে থাকলেও আমরা কিন্তু আপনাদের থেকে ভালো আছি। অনেক খোলামেলা, সন্ধে থেকে দারুণ হাওয়া দিচ্ছে। এখন তো ছাদে চলে এসেছি। চাঁদপাড়ায় থাকাতে আপনাদের একটাই সুবিধে, কলকাতায় অফিস হলে, যাতায়াতে টাইম কম লাগে। আজ গিয়েছিলেন অফিস?...এইসব তুচ্ছ কথাবার্তার ছলে জয়িতা যে তাকে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে, বুঝতে অসুবিধে হত না দেবাংশুর। এমনও হয়েছে, অতিরিক্ত ডিপ্রেশনের কারণে জয়িতার ফোন ধরেনি সারাদিন। মেসেজ পাঠিয়েছে, রিপ্লাই দেয়নি। হুঁশিয়ারির মেসেজটি আসত তখনই, ফোন ধরো, নয়তো বাড়ি পৌঁছে যাব। কী পরিচয় দিয়ে আলাপ করাবে তুমি বুঝবে।

জয়িতা জানত, স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য দেবাংশু তখন তার অন্য সম্পর্কটিকে দায়ী করে। জয়িতা যদি বাড়িতে উপস্থিত হয়, পরিবারের লোক একইরকম সন্দেহ করতে পারে। মোক্ষম এসএমএসটি পেয়ে ফোন ধরতে বাধ্য হত

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দেবাংশু। ওরকম মেসেজে একবার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল, পরের দিন ফার্স্ট আওয়ারে দেবাংশুর অফিসে হাজির হয় জয়িতা, দেখি, মোবাইল সেটটা দাও। তুমি তো ডোবাবে দেখছি!

—কেন, কী হয়েছে? বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চেয়ে ফোন সেট জয়িতার হাতে দিয়েছিল দেবাংশু।

ফোনের সুইচ টিপতে টিপতে জয়িতা বলছিল, কাল থ্রেটনিং-এর এসএমএস পেয়েও ফোন করলে না, দেখোইনি নাকি? সায়র যদি দেখে ফেলত...ইনবক্স খুলে ফেলে ফিক করে হেসেছিল জয়িতা। মেসেজটা দেখায় দেবাংশুকে। লেখা ছিল, যেতে তাহলে হচ্ছেই।

ফোনসেট নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঠোঁট উল্টে মাথা নেড়ে জয়িতা বলেছিল, সায়র দেখলেও বুঝবে না। একেবারে সাইন ল্যাঙ্গোয়েজ। আপনি তো নাম সেভ করেননি আমার। শুধু নাম্বার দেখত, খুব একটা রিস্ক কিছু ছিল না। ...ফোন থেকে নিজের চিহ্ন মুছে দিয়ে সেটটা ফেরত দিয়েছিল জয়িতা। যে মেয়ে এত কেয়ার নেয় দেবাংশুর, তার বিপদ হল কিনা, খোঁজ নিতে চাওয়া কি অন্যায়? যোগাযোগের কোনও রাস্তা না পেয়ে ওদের বাড়ি চলে গিয়েছিল দেবাংশু। হ্যাঁ, ঠিকই। আগে এরকম সিচুয়েশনে দেবাংশু ওদের বাড়ি পৌঁছে যায়নি। কারণ, জয়িতা তখন ফোন ধরত না, রিলেশনটা নিয়ে সংশয়ে থাকত বলে। এখন তো ফোন করলেই ধরে। হঠাৎ না ধরলে চিন্তা হবে না? ওদের বাড়ি যাওয়া যাবে না, এমনও তো কোনওদিন বলেনি জয়িতা। প্রয়োজন পড়েনি, তাই কখনও যায়নি দেবাংশু। এবার মনে হয়েছিল যাওয়া উচিত, উদ্বেগ চেপে রাখতে না পেরে গেছে। তাতে ওরকম বিচ্ছিরিভাবে ঠেস দিয়ে বলার কী হল, এখন হঠাৎ দরদ উথলে উঠছে কেন? 'দরদ' কথাটা ওর উচ্চারণ ভঙ্গিতে অত্যন্ত অশ্লীল শুনতে লেগেছিল। কোনও পরিস্থিতিতেই কখনও তো ওভাবে কথা বলেনি জয়িতা। 'দরদ' বলতে ঠিক কী মিন করতে চাইল জয়িতা, বোঝেনি দেবাংশু। তবে ওদের বাড়ি যাওয়াতে জয়িতার যে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, মালুম পেয়েছে ভালোই। তাই আর যোগাযোগ করার সাহস পায়নি। জয়িতা হয়তো সরে যেতে চাইছে এই অনিশ্চিত সম্পর্ক থেকে। বিয়ে থা করে অন্য কোথাও সেটেল হবে। তার প্রস্তুতি চলছে বাড়িতে। সেই কারণেই ফোন ধরছিল না। জয়িতা ভাবতেই পারেনি দেবাংশু বাড়ি অবধি ধাওয়া করবে। বিড়ম্বনায়

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পড়ে রেগে গেছে খুব। দেবাংশুর সঙ্গে সম্পর্কের কথা কোনওভাবে চাউর হয়ে গেলে বিয়েটা ভেস্তে যাবে যে। যদিও এসবই দেবাংশুর অনুমান। ভুল হতেই পারে। সম্প্রতি একটা আন্দাজ তার মেলেনি। সায়রের আচরণ বদলে যাওয়ার কারণ হিমিকা নয়। গোলমাল অন্য কোথাও। জয়িতার ক্ষেত্রেও হয়তো তাই। দু'জনেই তিরস্কারের সুরে দেবাংশুকে কিছু বলতে চাইছে। দায়ী করছে কোনও ব্যাপারে। সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলতে বাধছে ওদের। দু'জনেই যে বড় আপন ভাবত দেবাংশুকে। নিজের ভুল বা দোষ দেবাংশু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। মাথাটা কেমন যেন ভোম্বল হয়ে গেছে। ঠিক এই অবস্থাই হয়েছিল লোপা মারা যাওয়ার পরেই। বিচার বিবেচনার শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। কুড়ি বছরের ওপর একসঙ্গে কাটিয়েছে, লোপা প্রায় শরীরের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ যদি শরীরের ভাইটাল পোর্সান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মস্তিষ্কের কিছুটা অংশ অকেজো তো হয়ে যাবেই। স্বপ্নে লোপার হানাদারি ঠেকাতে ঘুমের ওষুধের ওপর নির্ভরতা বাড়ছিল, বিপত্তি দেখা দিল অন্য, অসম্ভব হ্যালুসিনেশন হতে শুরু করল। বাড়ির আনাচে-কানাচে দেখতে পেত লোপাকে। শুনতে পেত লোপার গলা, গান। কনফার্ম হওয়ার জন্য সায়রকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত, হ্যাঁরে, গানটা শুনতে পাচ্ছিস, তোর মায়ের মতো গলা না? অথবা বলত, তোর মায়ের কোনও শাড়ি কাউকে দিয়েছিস কি? ওই শাড়ি পরে কেউ একজন প্রায়ই চলে আসে আমার চোখের সামনে।

সায়র বড়দের মতো বোঝাত, ওসব তোমার মনের ভুল বাবা। মাকে ভুলতে পারছ না বলেই দেখছ। মাকে আমিও ভুলিনি। কিন্তু মেনে নিয়েছি মা আর নেই। তুমি সেটাই মানতে পারছ না মন থেকে।

সায়রকে একটু কম করেই বলত দেবাংশু, মিছিমিছি ঘাবরে যাবে। পাগল ভাববে বাবাকে। দেবাংশু কিন্তু স্পষ্ট দেখত লোপাকে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। নামার আগে দেবাংশুর দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। ঘেরা বারান্দার শেষপ্রান্তে আলোছায়াতে দেখা যেত তাকে। চোখের ভাষায় কিছু একটা বলতে চাইত, বুঝতে পারত না দেবাংশু। এগিয়ে যেত বারান্দার ওই আবছায়ার দিকে। লোপাকে ফলো করে মাঝরাতে ছাদে চলে গেছে দেবাংশু। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ চোখ গেছে উঠোনে, লোপা না? গান শেখাতে টিউশন ঘরের দিকে এগোচ্ছে। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য বারান্দায়

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দাঁড়িয়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ত। প্রতিবারই সায়র এসে কাঁধে হাত রেখেছে। বলত, আবার দেখেছ নিশ্চয়ই মাকে? চলো, ঘরে চলো।

সায়র বাবাকে চোখে চোখে রাখত। কলেজে যেত বাড়ির অন্য কারোর জিম্মায় দিয়ে, বলত, দেখো একটু। বাইরে বেরোতে দিয়ো না।

তখন অফিস যাচ্ছে না দেবাংশু। ছেলের নজরদারি, সাইকিয়াট্রিস্টের চিকিৎসায় ট্রমা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল দেবাংশু। প্রথমেই জয়েন করেনি অফিসে। বাজার দোকান, গঙ্গার ঘাটে যাওয়া শুরু করল একা একা। অনেকসময় চোখে পড়ে গেছে সায়রকে, দূর থেকে নজর রাখছে বাবার ওপর। ছেলের তদারকিতে অফিস যাওয়ার মতো সুস্থ হল দেবাংশু। জয়িতা ভার নিল তারপর থেকে। সবচেয়ে কাছের দু'জন মানুষ সরে গেছে দূরে। ভোম্বল ভাবটা ফিরে এসেছে মাথায়। বিচার, বিবেচনা, অনুমান শক্তি সব কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। গতরাতে ঘুম হল না ভালো। এখনও হ্যালুসিনেশান না হলেও, উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। চোখ বুজলেই মনে হচ্ছে পাশে শুয়ে আছে লোপা। হাত বাড়াচ্ছে লোপাকে ছোঁয়ার জন্য, গভীর শূন্যতায় ঝুলছে হাত, খুলে ফেলছে চোখ। গতরাতে লোপার উপস্থিতি টের পেয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করেনি দেবাংশু। চোখবোজা অবস্থাতেই সায়রের হঠাৎ বদলের গোটা ঘটনাটা জানিয়েছে। হিমিকার কাছে গিয়েছিল, বলেছে সেটাও। ছেলের মেজাজ বিগড়ানোর যে যে সম্ভাবনার কথা মাথায় এসেছে তার সব বলেছে লোপাকে। করণীয় কী, জানতে চায়নি। উত্তর আসবে না, সেই সেন্সটুকু আছে। ওই বোধটাই এখন অবধি তাকে পুরো পাগল হতে দেয়নি। দেবাংশু টের পাচ্ছে সে আবার দৃশ্যমান বস্তুজগতের একেবারে ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনওভাবে পা পিছলোলেই চলে যাবে অদৃশ্যমান অনুভবের জগতে। দেবাংশুর এই বিপজ্জনক অবস্থানের কথা সায়র জানে না। বাবার দিকে ঘুরেও দেখে না আজকাল। এই কারণেই লোপাকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা বাড়ছে। গতকাল নাকি পরশু অফিস থেকে ফিরে চা-টা খেয়ে বই নিয়ে বসেছে দেবাংশু, মিষ্টি একটা গন্ধ ঢুকে পড়েছিল ঘরে। আবার বেরিয়েও গেল। অবিকল লোপার প্রিয় পারফিউমের কোনও একটার গন্ধ। যেন লোপাই ঘুরে গেল ঘর থেকে। স্মৃতিতে তো গন্ধ পাওয়া যায় না। বরং গন্ধ স্মৃতি বয়ে আনার কাজ করে। নিজেকে কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল দেবাংশুর। পাতা খোলা অবস্থায় বিছানায় বই উল্টে নেমে এসেছিল। চাবি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দিয়ে আলমারি খোলে, লকারটাও খুলে ফেলে যেখানে লোপার ছ'টা পারফিউমের শিশি। একটার ঢাকনা খোলা, হাতে নিয়ে শুঁকতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল, স্প্রেয়ারের মুখটা এখনও ভেজা। দেবাংশু ভূত, আত্মা বিশ্বাস করে না। করার কোনও কারণও খুঁজে পায়নি এতদিন। নিজের প্রতি সন্দেহটা সঠিক প্রমাণ হল। আলমারি খোলা থেকে শুরু করে পারফিউম স্প্রে করা, ফের বন্ধ করা আলমারি। গোটা কাণ্ডটা ঘটিয়েছে নিজে, অথচ কিছু মনে পড়ছে না। আশ্চর্য একটা মিসিং লিঙ্ক। অনেকটা ব্ল্যাকহোলের মতো। ভয় পায়নি দেবাংশু, বড় অসহায় লেগেছিল। ওই সময় মনে পড়ছিল মেজদার একটা কথা। যখন বলেছিল, দেবাংশু গুরুত্ব দেয়নি। মেজদার উদ্ভট কমেন্টের এটাও একটা বলেই ধরে নিয়েছিল। কথাটা বিরক্তি, অসন্তোষ তৈরি করেছিল মনে। লোপার গন্ধ পাওয়ার ঘটনার পর উপলব্ধি করল, মেজদার মন্তব্যের যথার্থতা। আসলে এমন একটা সিচুয়েশনে কথাটা বলেছিল মেজদা, রাগ হওয়া খুব স্বাভাবিক। তবে অন্যসময়ে বললে কথাটা এভাবে মনেও থাকত না। লোপার দেহ তখন ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢোকানো হয়ে গেছে। দৃশ্যের শেষটুকু না দেখে শ্মশানের সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে দেবাংশু, কাঁধে হাত রেখেছিল মেজদা। নিরাসক্ত গলায় বলেছিল, কাঠে পোড়ানোর সিস্টেমই ভালো ছিল বুঝলি। আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকলে শুধু মৃতের দেহ নয়, তার সঙ্গে অনেক স্মৃতিও পুড়ে যেতে দেখা যেত। বিশ্বাসটা স্থির হয়ে যেত মনে, মানুষটা নেই। আধুনিক ব্যবস্থায় মানুষটাকে চোখের বাইরে লোপাট করার ফলে বিশ্বাসটা দানা বাঁধতে চায় না।

উক্তিটা ওই মুহূর্তে নিষ্ঠুর, কর্কশ শুনিয়েছিল ঠিকই, এখন টের পায় কী গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে ছিল কথাটার মধ্যে। লোপাকে আদৌ কতটা ভালোবাসে দেবাংশু, ভাবার অবকাশ পায়নি। এখন যে কষ্টটা পাচ্ছে সেটা ভালোবাসার জন্য নাকি শুধু লোপা না থাকার অভাববোধে? বেঁচে থাকতে উপস্থিতি ছাড়াই অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকত লোপা। বাড়িতে পাড়ায় দারুণ পপুলার। কে তাকে পছন্দ করছে না করছে তোয়াক্কাই করত না। অসম্ভব প্রাণচঞ্চলতায় তার আশপাশের মানুষের ওপর মধুর এক অধিকার কায়েম করে ফেলতে পারত। পাড়ার পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ির সরস্বতী পুজোতেও সে থাকত মধ্যমণি হয়ে। এদিকে নিজের সংসারের প্রতিটি বিষয়ে তার ছিল সজাগ দৃষ্টি। এমন দিন গেছে লোপা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সারা সকাল ব্যস্ত ছিল নীচের হলঘরে পাড়ার বাচ্চাদের রিহার্সাল দেওয়াতে। দেবাংশু বউদির কাছে খেয়ে অফিস এল। টিফিন আওয়ার্সে ভাবছে, আজ তো টিফিন দেওয়ার সুযোগ পায়নি লোপা, বাইরে খেতে যাবে। তবু একবার ব্যাগ হাতড়ে দেখেছিল দেবাংশু, লোপাকে তো বিশ্বাস নেই! ঠিক তাই, ব্যাগে টিফিন মজুত। বউদি দিল, নাকি ছোটবউ? লোপা কোনও একজনকে বলে রেখেছিল। অথবা নিজেই এক ফাঁকে এসে দিয়ে গেছে, টের পায়নি দেবাংশু। নিজের পোশাক পরিচ্ছদ কেনা নিয়েও দেবাংশুকে ভাবতে হত না। চটিজোড়া পুরোনো হয়ে এসেছে, একদিন অফিস বেরোনোর সময় দেখল চৌকাঠের ওপরে নতুন চটি। জামাকাপড়ের বেলাতেও তাই। দেবাংশু এরপর বলেছিল, তুমি যে হুটহাট জিনিস কিনে ফেল আমার জন্য, যদি বলি পছন্দ হয়নি...

—তোমার পছন্দ করার ক্ষমতা আছে নাকি, যে, অপছন্দ হয়েছে বলবে? যে মানুষ নিজের বউ পছন্দ করতে পারে না...এটা ছিল লোপার কমন খোঁটা। যেকোনও প্রসঙ্গে সামান্য সুযোগ পেলেই কপট রাগ দেখিয়ে বলত কথাটা। আসলে নিরাময় অসাধ্য এক অভিমান ছিল এই তিরস্কারের উৎস। সত্যিই বিয়ের জন্য বউ পছন্দ করতে হয়নি দেবাংশুকে, লোপাই করিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। বউদির দূরসম্পর্কের বোন লোপা। বউ হয়ে প্রথম যেদিন চ্যাটার্জি বাড়িতে পা রাখে বউদি, লোপা এসেছিল কনের সঙ্গিনী হয়ে। তখন ছিপছিপে চেহারা, বয়সে বউদির থেকে অনেকটাই ছোট। বেছে বেছে তাকেই কেন পাঠানো হয়েছে, বুঝিয়ে দিয়েছিল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছিল বউদিকে। কনেকে কিছু বলতে গেলে বা নিয়ম মানাতে হলে লোপার মাধ্যমে যেতে হচ্ছিল। খানিকক্ষণ অন্তর নির্দেশ আর অভিযোগ করে তটস্থ করে রেখেছিল চ্যাটার্জি বাড়ির মহিলাদের। এটা নেই কেন, ওটা নেই কেন? দিদিকে এখন রেস্ট নিতে দিন।—মা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়ে বলেছিল, এ কাদের বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ করলাম ছেলের! এইটুকুন মেয়ে এত চ্যাটর প্যাটর করছে, ওর দিদি পরে কী রূপ ধারণ করবে, কে জানে! বাড়ির মহিলা আত্মীয়স্বজনদেরও ছিল একই মত। লোপার ডেঁপোমি এবং বাড়ির লোকের সন্ত্রস্ত ভাব দেখে মজা পাচ্ছিল দেবাংশু। আগের রাতে বাসরে এই মেয়েটাই গান গেয়ে দেবাংশুর নজর কেড়েছিল। লোপার কারণে বউদিকে নিয়ে যে আশঙ্কা তৈরি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

হয়েছিল সকলের মনে, সেটা মিলল না। বউদি লোপার একবারে বিপরীত স্বভাবের, শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির। সমস্ত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। লোপা মাঝে মাঝেই ঢুঁ মারত এ বাড়িতে। তবে প্রথমদিনের মতো ওস্তাদি দেখাত না। বউদির গায়ে গায়ে থাকত। একদিন দেবাংশু কোনও একটা দরকারে বড়দার ঘরে গেছে, লোপা আর বউদি বসে গল্প করছিল। দেবাংশুকে শুনিয়েই বউদি লোপাকে বলেছিল, হ্যাঁরে, বিয়ের আগে তো তুই আমার এরকম খোঁজখবর করতিস না। হঠাৎ কীসের এত টান, যে চন্দননগর থেকে প্রায়ই চাঁদপাড়ায় চলে আসছিস? কম দূর তো নয়, ট্রেনেই যেখানে চল্লিশ মিনিট লাগে!

দেবাংশুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে লোপা বলেছিল, যার জন্য আসি, সে যদি বুঝত। বাড়িতে না এসে বাইরেই দেখা করে নিতাম। সে শুধু ড্যাব ড্যাব করে দেখে, বলে না কিছুই।

দুই মেয়ে যুক্তি করেই কথাটা তুলেছিল দেবাংশুর সামনে। ঘর থেকে তখন পালাতে পারলে বাঁচে দেবাংশু। লোপার এ বাড়িতে আসা চলতে লাগল। দেবাংশু বড় বিব্রত বোধ করত। বউদির চোখেমুখে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। দেবাংশুর ভয় হত, হাসিটা অচিরেই সংক্রমণের মতো সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়বে। লোপার সঙ্গে তড়িঘড়ি আলাপ বাড়িয়ে নিয়ে দেবাংশু দেখা করতে লাগল বাড়ির বাইরে। সিনেমা, নাটক দেখতে যেত একসঙ্গে, লোপার প্রোগ্রাম থাকলে তো যেতেই হত। লোপার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগতে শুরু করেছিল দেবাংশুর। একদিন লোপাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাদের চন্দননগরে ছেলে কি কম পড়েছিল, নাকি তারা পাত্তা দেয়নি তোমাকে? আমাকে বেছে নেওয়ার কারণ কি?

—আমার পিছনে লাইন পড়ে যায় মশাই, হিরো টাইপ ছেলেদের লাইন। চলো একদিন গিয়ে দেখে আসবে। আমার তোমার মতো ছেলেই পছন্দ। সিরিয়াস প্রকৃতির, চেহারায় সুপুরুষ, কথাবার্তায় পড়াশোনার ছাপ। যে আমার গার্জেন হতে পারবে। যার শাসন মানতে ভালো লাগবে। আমার মতো ফচকে মেয়ের এরকম একটা গুরুগম্ভীর পার্টনার দরকার। অপোজিট ক্যারেক্টার না হলে রিলেশন ঠিক জমে না।

এ সবই ছিল লোপার কথার কথা। শাসন বারণ যা করার সেই করত। দেবাংশুর ওসব আবার তেমন আসে না। একটা বয়সের পর যে যার নিজের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ইচ্ছেমতো চলুক, এটাই সে চায়। বাইরে দেখা হলেও, লোপা বাড়ি আসা বন্ধ করেনি। আগের তুলনায় কম আসছিল। কাজের চাপে দেবাংশু হয়তো ওর সঙ্গে বেশ কিছুদিন দেখা করতে পারছে না, তখন তো অবশ্যই চলে আসত বাড়িতে। ঘরে লেখায় ব্যস্ত দেবাংশু, উঁকি দিয়ে চলে গেল লোপা। সে যে এ বাড়ির বউ হবে, প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল পরিবারের সকলের মধ্যে। তখন হাঁড়ি-এক ছিল দেবাংশুদের। রাতে খেতে বসে মেজদা মাকে বলেছিল দেবুর বিয়েটা এবার দিয়ে দাও মা। লোপা পাকাপাকিভাবে এ বাড়িতে এসে থাকুক। বড় ভালো গান গায় মেয়েটা।

স্কুলমাস্টার বড়দা অবাক হয়ে বলেছিল, ভালো গান গাওয়াটাই তার মানে বিয়ের একমাত্র যোগ্যতামান!

—আহা, তা হবে কেন, যে মানুষ কোনও একটা ব্যাপারে যখন পারদর্শী হয়, জানতে হবে অনেক ছোট ছোট গুণের সমাহারেই সেটা হয়েছে। মেয়েটা এ বাড়িতে আসে, কখনও-সখনও একটা, দুটো গান গায়, কানের তেষ্টা বেড়ে যায় আরও। আজ না হয় কাল এ বাড়ির বউ তো সে হবেই, তাহলে আর দেরি করা কেন?

মেজদার কথার পর মা বলেছিল, আর তোর বিয়ে? তুই বিয়ে না করা অবধি দেবুর বিয়ে আমি দেব না।

মেজদার উত্তর ছিল, আমার বিয়ে করা কি উচিত হবে? খামখেয়ালি মানুষ, আজ বাড়ি আছি তো দু'চারমাস নেই। রোজগারেরও নিশ্চয়তা নেই কোনও। আমি খেতে না পেলে, জানি ভাইয়েরা খাওয়াবে। অন্য বাড়ির কোনও মেয়ে সেই অনুগ্রহ নেবে কেন?

পাগল যেমন কখনওই নিজেকে পাগল বলে মনে করে না, খামখেয়ালি মানুষও বুঝতে পারে না তার খামখেয়ালিপনা। মেজদা পারে। কোনওদিনই ভাইয়েদের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি তাকে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করেনি কখনও। ছোটখাটো কারখানার কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করে। বাকি সময়টা মেতে থাকে নানান হুজুগে। কখনও বার্ডওয়াচার, বাংলার বিলুপ্তপ্রায় মন্দির মসজিদ, দরগার অনুসন্ধান। সমুদ্রের নোনা জল নিয়ে এসে বড় চৌবাচ্চায় চিংড়ির চাষ। এরকম আরও অনেক কিছু। এখন মেতেছে ঠোঙা বানানোতে। বক্তব্য হচ্ছে, প্লাস্টিক দূষণ ঠেকাতে প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের দিনের কিছুটা সময় কাগজের ঠোঙা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বানানো উচিত। প্রক্রিয়াটায় মনের চঞ্চলতাও নাকি দূর হয়, নেশার মতো পেয়ে বসে। উপরি পাওনা, যে খবরের কাগজে ঠোঙাটা বানানো হচ্ছে, তাতে চমকপ্রদ কোনও খবর পেয়ে যাওয়া, যা আগে চোখ এড়িয়ে গেছে।

বড়দার বিয়ের চারবছরের মাথায় মা মারা গেল। একা বউদির ওপর গিয়ে পড়ল গোটা সংসারের ভার। মেজদা উদ্যোগ নিয়ে দেবাংশু, লোপার বিয়েটা দিয়ে দিল। বউদি, লোপা একসঙ্গে অনেকদিন সংসারের কাজ ভাগ করে নিয়েছে। ছোটভাই অপুর বিয়ের পর বড়দা সব ভাইকে ডেকে পরামর্শ দিল বাড়ি পার্টিশন করে রান্নাঘর যে যার আলাদা করে নেওয়ার। এখন ভাইয়েদের সম্পর্ক ভালো আছে, চলে যাচ্ছে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ছাড়া। পরের প্রজন্মও যে এমনভাবে চলবে, গ্যারান্টি নেই কোনও। আমরা থাকতে থাকতেই সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে রাখা উচিত।—বড়দা বাড়ির হেড, তার কথামতোই কাজ হল। মেজদা রান্নার পাট রাখল না। প্রথম দিকে জিটি রোডের ধারে বাদলের হোটেলে খেত। এখন হোম সার্ভিস। তিন বউ অফার করেছিল অলটারনেটিভ ডে-তে তাদের কাছে খেতে। মেজদা বলেছে, তা হলেই তুলনা করে ফেলব, কার রান্না ভালো, কারটা খারাপ। লোপা মারা যাওয়ার পর মেজদার হোমসার্ভিসকে বলে খাবার আনাচ্ছিল দেবাংশু, অতি খারাপ রান্না। সায়র তো মুখে তুলতে চাইছিল না। তখনই রান্নার লোক বহাল করে দেবাংশু।

যে মেজদা ভালো গান গায় বলেই লোপাকে এ বাড়ির বউ করার প্রস্তাব দিয়েছিল, সে নিজে কিন্তু লোপার সামনে বসে এটা গাও, ওটা গাও, আর একটা গাও করেনি। লোপা গাইলে নিজের মতো শুনে নিত। নীচের তলার সামনের হলঘরটা তিনভাইয়ের কমন ড্রয়িংরুম। মেজদার উদ্যোগেই ওই ঘরে গান শেখাতে শুরু করে লোপা। বাড়ির অংশ ভাগাভাগির পরও দিনের বেশিটা সময় ঘরটা লোপার দখলে থাকত, বাড়ির কেউ কোনও আপত্তি করেনি। সায়র যখন ছোট, ওকে পাশে বসিয়ে স্টুডেন্টদের গান শিখিয়েছে লোপা। সায়রেরও শেখা হয়ে গেছে কানে শুনে। লোপা হয়তো সংসারের কাজে গান শেখাতে শেখাতে উঠে গেছে, ভুল গাইছে কোনও স্টুডেন্ট, ক্লাস টু-থ্রিতে পড়া সায়র শুধরে দিত তার চেয়ে অনেকটাই বড় ছেলেমেয়েকে। ছাত্রীই ছিল বেশি। মূলত রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাত লোপা। স্কুল ফেরত সায়র গিটার শিখে নিল ভানুর কাছে। ভানু চার পাঁচটা ইন্সট্রুমেন্ট

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বাজাতে পারে, শেখায়। চাঁদপাড়ার গর্ব সে। মায়ের ফাংশানে গিটার বাজাত সায়র, গানও গাইত। কখনও মেজাজ হলে মা-ব্যাটা মিলে গাইতে বসত ওপরের ঘরে। সায়রের গলায় সুর, হাতে গিটার, লোপা হারমোনিয়াম ছাড়া খোলা গলায়। অফিসফেরত তখন হয়তো বাড়ি ঢুকছে দেবাংশু, দেখত, ছাদের আলসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেজদা, গান শুনছে। চারতলার ছাদের ঘরটা মেজদার। নিজেই বেছে নিয়েছে।

সারাক্ষণ কাজের মধ্যে থাকতে থাকতে লোপার হঠাৎ খেয়াল পড়ত বরকে বোধহয় উপেক্ষা করা হয়ে যাচ্ছে। ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য আচমকা পিছন থেকে জড়িয়ে ধরত দেবাংশুকে। বলত, বরটাকে অনেকক্ষণ চটকানো হয়নি। আক্ষরিক অর্থেই চটকে, ঘাড়ে, গালে চুমু খেয়ে চলে যেত নিজের কাজে। কাণ্ডটাতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল দেবাংশু, প্রতি-আদরের কথা মাথাতেই থাকত না। সে তখন হয়তো বই পড়ছে অথবা এমনিই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিছু। লোপা অবশ্য দেবাংশুর প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত না। তার অত সময় কোথায়! দেবাংশু তাকে কম ভালোবাসে, এমন কোনও অনুযোগ কোনওদিন করেনি। জয়িতাকে দেখার আগে অবধি নারীর প্রতি নিজের প্রেম ভালোবাসা বোধ নিয়ে কখনও ভাবেইনি দেবাংশু। কৈশোর থেকেই সে টের পেয়েছে অনেক মেয়েই তার ব্যাপারে আগ্রহী। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে পছন্দও হত দেবাংশুর, ইচ্ছে হত প্রেম-ট্রেম করার। যে বন্ধুরা প্রেম করে, ঈর্ষা করত তাদের, কিন্তু ওই পর্যন্তই। প্রচুর ভুলভাল বকে, নানান ছলচাতুরির মাধ্যমে একটা মেয়ের কাছে পৌঁছানোর কলাকৌশল তার জানা ছিল না। জানার আগ্রহ তৈরি হওয়ার মতো মেয়ের দেখাও হয়তো পায়নি। জয়িতাকে দেখে মনে হয়েছিল, এই কি সেই মেয়ে? প্রথম সাক্ষাতেই সন্দেহটা হয়েছিল। ক্রমশ দেবাংশু বুঝতে পারল দৃষ্টির তৃষ্ণাই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা। জয়িতাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করত। ছুটে যেত না, থাকত অপেক্ষায়। জয়িতাই আসত। কথা হত অনেক, তৃষ্ণা বেড়ে যেত আরও। যতটা সম্ভব নিজের মনের ভাব জয়িতার কাছে গোপন করে গেছে দেবাংশু। সবটা বলে দিলে লোপাকে ওর সামনে ছোট করা হত। শরীরী ব্যাপারে জয়িতার সঙ্গে একেবারেই এগোবে না পণ করেছে দেবাংশু। একজন ভালোমেয়ে তখনই নিজেকে সম্পূর্ণ তুলে দেয়, যখন সে বিশ্বাস

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

করে পুরুষটি তার নিজস্ব। এই আশ্বাস তো দিতে পারবে না দেবাংশু। তারপরও শরীরী সম্পর্কে গেলে সস্তা করে দেওয়া হবে জয়িতাকে। তবু অল্প ছোঁয়াছুঁয়ি তো হয়েই যায়। দু'টি শরীর নিজেদের মধ্যে চুম্বকক্ষেত্র রচনা করে ফেলে। জয়িতার ত্বকের টানটান ভাব, সজীবতা শিহরিত করে তোলে দেবাংশুকে, প্রতিজ্ঞার পরদা ফিকে হয়ে আসে। জয়িতার পুরো শরীরটাই যেন ডাকে দেবাংশুকে। নিজেকে কঠোরভাবে সংযত রেখে, জয়িতার সামনে থাকে নির্বিকার। লোপাকে সম্ভোগকালে ফিরে আসত জয়িতাকে স্পর্শ করার স্মৃতি। লোপার শরীরে কী যেন একটা মিসিং, ত্বকে সেই টানটান ভাব নেই। একসময় ছিল। বয়স কেড়ে নিয়েছে সেই সজীবতা। দেবাংশু টের পায়নি। বয়স তারও বেড়েছে। ভুলে গিয়েছিল নবীনত্বের স্বাদ। দৈনন্দিনতায় লোপাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যেভাবে নৌকার ক্ষয় টের পায় না মাঝি। ফেলে আসা বয়সের বাগান থেকে ডাক দিয়েছে জয়িতা। লোপাকে আদর করার সময় ভেসে উঠত জয়িতার শরীর, তৎক্ষণাৎ নিজেকে সরিয়ে নিত দেবাংশু।

—কী হল? জানতে চাইত লোপা।

—কিছু না। বলে নিজেকে বোঝাত দেবাংশু, বয়স অনুপাতে লোপার শরীরই আমার প্রাপ্য। কেন আমি বেড়া ডিঙিয়ে বাগানটায় ঢুকতে চাইছি? অপমান করছি দুই নারীকেই। এরা দু'জনেই আমায় ভালোবাসে। মাথা ঠাণ্ডা করে ফের লোপাতে উপগত হত দেবাংশু। আদরের মাঝপথে ওই সরে আসা থেকেই কি লোপা কিছু আঁচ করেছিল? টের পেয়ে গিয়েছিল, দেবাংশু এখন আর তার একার নয়। তাই হয়তো রোগের কষ্ট চেপে মরে গেল তাড়াতাড়ি।

—বাবা! এই যে! বাবা! কে যেন ধমকের সুরে তার বাবাকে ডাকছে। মাথা নিচু করে হাঁটছিল দেবাংশু। মুখ তুলে দেখে মাঠের কুয়াশা উধাও। লোকজনও কমে গেছে। পিছন থেকে আবার একইরকম ডাক। গলাটা সায়রের মতো শোনাচ্ছে, বিভ্রম ধরে নিয়েও নিঃসন্দেহ হতে ঘাড় ফেরায় দেবাংশু। না ভুল নয়। মাঠ লাগোয়া পাকা রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে আছে সায়র। ভঙ্গিতে বিরক্তি স্পষ্ট।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় দেবাংশু। কাছাকাছি পৌঁছোতে সায়র অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠে, সকাল থেকে দেখছি নেই। মোবাইলটা নিয়ে বেরোয়নি কেন? খোঁজ নেব কী করে!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সায়র বাড়িয়ে ধরেছে মোবাইল ফোনটা। দেবাংশু হাতে নেয়। সায়র ঘুরে গিয়ে বাড়ির সদর লক্ষ করে এগোতে থাকে। তবু ভালো, বাবার খোঁজ করেছে! কারোর ফোন এসেছে কি? তাই হয়তো দিয়ে গেল সেটটা। ফোনের সুইচ টিপে স্ক্রিন আলো করে দেবাংশু। যার ফোন আসার কথা ভাবছিল, সে তো করেইনি। অন্য কারোরই মিসড কল নেই।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে না ঢুকে ছাদে চলে এসেছে দেবাংশু। মেজদা মাদুরের ওপর বসে এক মনে বানিয়ে যাচ্ছে ঠোঙা। মাথার ওপর রোদ, শীত আসছে বলে তেমন তেজ নেই। হঠাৎ দেবাংশুকে ছাদে আসতে দেখে মেজদা কোনও প্রশ্ন করেনি। শুধু জানতে চাইল, চা খেয়েছিস? নাকি বানাব?

দেবাংশু কোনও উত্তর না দিয়ে চলে গেছে ছাদের পাঁচিলের ধারে। তাদের বাড়ির ছাদ থেকে চাঁদপাড়ার অনেকটাই দেখা যায়। গঙ্গা অবশ্য এখন আর দেখা যায় না। জিটি রোডের গায়ে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে বেশ ক'টা। এখনও মাঠ, পুকুর, গাছপালা যথেষ্টই আছে। ছাদ থেকে রেলের লাইন, ট্রেন চোখে পড়ে। পাখি ওড়াওড়ি করছে। চাঁদপাড়ার ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। নীচ থেকে ভেসে আসছে রিকশার প্যাঁ পোঁ, সাইকেলের ঘণ্টি...কতদিন নাকি কত মাস পর দেবাংশু ছাদে এল, মনে করতে পারছে না। আজ কেন এল, বুঝতে পারছে না তাও। মেজদার সাহচর্য পেতে কি?

—নে, একটু চা খা।

পিছন ফেরে দেবাংশু, মেজদার দু'হাতে চায়ের কাপ। এক ফাঁকে উঠে গিয়ে বানিয়ে এনেছে। মেজদার হাত থেকে কাপ নিয়ে চুমুক দিল দেবাংশু। মেজদা বলল, মুড অফ মনে হচ্ছে। কী হয়েছে?

—সায়রকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি। ওর আচারব্যবহার কেমন যেন পালটে যাচ্ছে। মদ খেয়ে বাড়ি ঢোকার ঘটনাটা শুনেছ তো?

—শুনেছি। বিরাট কোনও কাণ্ড বলে মনে হয়নি। তোর হয়তো মনে নেই, ওর বয়সে আমিও বেশ কয়েকবার বেহেড হয়ে বাড়ি ঢুকেছিলাম।

—মনে আছে। তুমি ঢুকতে লুকিয়ে। সায়র যা করল, সকলের সামনে। হয়তো ইচ্ছে করেই। আমাকে অপদস্থ করার জন্য। আমার সঙ্গে অদ্ভুত আনবিকামিং বিহেভ করছে। ক'দিন আগেও ও এরকম ছিল না। পরিবর্তনের কারণটা ধরতে পারছি না কিছুতেই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দেবাংশুর কথা শুনে নিয়ে চায়ের কাপ হাতে মেজদা ফিরে গেল মাদুরে। দু'হাঁটু বুকের কাছে জড়িয়ে ডান আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, মাকে মনে পড়ছে ওর। সেই হতাশা থেকেই উঠে আসছে রাগ।

—সেটা আমার ওপর দেখাচ্ছে কেন? হঠাৎ এই নৈরাশ্য এলই-বা কোথা থেকে? লোপা মারা যাওয়ার পর আমি যখন ডিপ্রেশনের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছি, সায়রই তো সর্বক্ষণ আমার পাশে থেকে ওই অবস্থা থেকে বার করে এনেছিল। এখন ও হতাশায় ভুগছে কেন?

—কারণ, এখন ওর মনে হচ্ছে তুই ওর মাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলি কী করে, মজাটা এখানেই। ও চেয়েছিল তোকে স্বাভাবিক করে তুলবে, একই সঙ্গে তোর ওই অবস্থা থেকে মায়ের অস্তিত্বের জানান পাচ্ছিল। তুই সামলে উঠতেই শোকটা ওর ঘাড়ে চেপে বসেছে। আসলে শোক রয়ে গেছে তোর ঘরগুলোয়। আমার কথা যদি শুনতিস, এমনটা হত না।

—কী কথা?

—ওই যে, বলেছিলাম, লোপার শাড়ি-টাড়ি, জিনিসপত্র সব চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দে, বিলিয়ে দে। নয়তো লোপা অনেকটাই থেকে যাবে ঘরে। শুনলি না।

মেজদার কথা শুনে অতীতচারী হয় দেবাংশু। লোপার শ্রাদ্ধ শান্তি মিটতেই পরামর্শটা দিয়েছিল মেজদা। দেবাংশু কানে তোলেনি। তুললে কি সত্যিই ভালো হত? দেবাংশু বলে ওঠে, ওভাবে কি ভোলা সম্ভব! কতদিন একসঙ্গে ছিলাম। যথেষ্ট সুখের ছিল আমাদের দাম্পত্য। তাছাড়া ভুলতেই-বা যাব কেন?

—তা হলে তো বলতে হয়, টু সে দ্যাট ইউ ক্যান লাভ ওয়ান পার্সন অল ইয়োর লাইফ ইজ জাস্ট সেইং দ্যাট ওয়ান ক্যান্ডেল উইল কন্টিনিউ বার্নিং অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ লিভ। আমার কথা নয়, টলস্টয় কোট করলাম। আরে বাবা, দুজনের মধ্যে একজন না একজন আগে তো ফুরোবেই। এই সত্যটা মেনে নিতে হবে।

উত্তর দিক থেকে হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল। মেজদার ঠোঙা, কাগজপত্র ছড়িয়ে পড়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে কাগজগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে মেজদা, দেবাংশুও হাত লাগায়। মেজদা বলতে থাকে, ক-দিন সায়রকে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

নিয়ে কোথাও একটা ঘুরে আয়। লোপা চলে যাওয়ার পর কোথাও তো যাসনি। বেড়াতে গেলে বাপ ছেলের বন্ডিংটা আবার গড়ে উঠবে। আর সায়রকে ওর মতো থাকতে দে। লোপার কথা ওর সামনে বেশি তুলিস না। নিজেই সামলে নেবে।

কাগজপত্র সব মাদুরে আনা গেছে। মেজদার কথাগুলো শুনে বুকের ভার অনেকটাই নেমে গেছে দেবাংশুর। মাদুরের ওপর রাখা মেজদার ফাঁকা চায়ের কাপটা তুলে নেয়, নিজেরটা রেখেছে পাঁচিলের ওপরে।

দুটো কাপ নিয়ে মেজদার ঘরে রাখে দেবাংশু। সিঁড়ি ধরে নামতে থাকে। নিজের তিনতলায় পা রাখতেই বারান্দায় ঝোলানো টিয়াটা ডেকে ওঠে, লোপা, ও লোপা, লোপা এল...

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চার

আবার রনোর ফোন। সায়র এখন লোকাল ট্রেনে। সকাল থেকে চারবার ফোন করল রনো। ক-দিন ধরেই ভীষণ জ্বালাচ্ছে। আজকের আগের তিনটে কল ধরেনি সায়র। এটা ধরল, হ্যাঁ, বল।

ও প্রান্ত থেকে রনো অধৈর্যের স্বরে বলল, কোথায় থাকিস! সকাল থেকে ট্রাই করে যাচ্ছি।

—একটু বিজি ছিলাম। বল, কী বলছিস।

—কলেজে আসিসনি কেন?

—এটা বলার জন্য ফোন করিসনি। আসল কথাটা বল।

—তোকে নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে আমার। এত ভালো ছেলে তুই, কী যে মাথায় চেপেছে...

চুপ করে থাকে সায়র। রনো এখনও মূল প্রসঙ্গে আসেনি। এবার এল, জলিদা তো আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বলছে, তোমার বন্ধুর কী হল! বলেছিলাম তো যোগাযোগ করিয়ে দেব। হয়ে যাবে কাজ। কিছু কমিশন আসত পকেটে। হাত একদম খালি।—একটু থামল রনো। ফের বলল, শালা একেবারে ছিঁনেজোঁকের মতো পিছনে পড়ে রয়েছে। ঘুরিয়ে ব্ল্যাকমেল করছে মনে হচ্ছে। ফোন নাম্বার চাইছে তোর। দিইনি।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—যদি মনে হয় দিলে সুবিধে হবে তোর, দিয়ে দিস। তার আগে জলিদাকে বলিস আমি একটা মেশিন জোগাড় করে ফেলেছি। কাজটা নিজেই করে নিতে পারব।

—কী উলটোপালটা বকছিস। মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেছে তোর? সবার দ্বারা সব কাজ হয় না।

—জানি। চিন্তা করিস না, এখনই কাজটা করছি না। প্রিপেয়ার করছি নিজেকে। কাল কলেজে যাচ্ছি। কথা হবে। বাই।

ফোন কাটল সায়র। দুপুর বলে কম্পার্টমেন্ট মোটামুটি ফাঁকা। সায়র নামবে নৈহাটি। সেখান থেকে অটোরিকশা ধরে গরিফা। বাবার বিশেষ বান্ধবী জয়িতা নাগের বাড়িটা দেখতে যাবে। নৈহাটি থেকে ট্রেনেও গরিফা যাওয়া যেত, ব্যান্ডেল-নৈহাটি লাইনে ট্রেন খুব কম। গরিফার লোকেরাও অটোয় যাতায়াত করে।

হিমিকার মায়ের থেকে জয়িতা নাগের বাড়ির ঠিকানা প্রথমদিনই পেয়েছে সায়র। যেদিন কাকিমা জানালেন মহিলার সঙ্গে বাবার সম্পর্কের খবর। তারপর থেকে হিমিকাদের বাড়িতে আর যায়নি সায়র। ফেস করতে চায়নি কাকিমাকে। হিমিকার বাবাকেও এড়িয়ে থাকতে চেয়েছে। কাকিমার কথা অনুযায়ী উনিও বাবার সম্পর্কের খবরটা জানেন। হিমিকাকে ওঁরা বলেননি। বলতে হবে সায়রকে। কারোকেই সায়র ব্যাপারটা জানাবে না, চেষ্টা করবে সম্পর্কের কথাটা যতটুকু ছড়িয়েছে, তার থেকে বেশি জানাজানি যেন না হয়। ভেঙে দিতে হবে সম্পর্কটাকে। এমনভাবে ভাঙবে, কিছুতেই যেন জোড়া না লাগে কোনওদিন। এর নিশ্চিন্ত উপায় একটাই ছিল, জয়িতা নাগকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। মহিলার ওপর এতটাই রাগ হয়েছিল সায়রের, ওটা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিল না। ওর মতো নোংরা মহিলার সমাজে না থাকাই ভালো। কাকিমার ইনফর্মেশন অনুযায়ী সায়রের মা বেঁচে থাকতেই বাবার সঙ্গে রিলেশন চালিয়ে গেছেন উনি। এখন বাবাকে বিয়ে করে সায়রদের বাড়িতে ঢোকার অপেক্ষায় আছেন। এতদিনে হয়তো ঢুকেই পড়তেন, লোকলজ্জার কারণে বাবা নিশ্চয়ই রাজি হয়নি। বউ মারা গেছে মাত্র ছ'মাস, তাছাড়া একবছর না হলে মায়ের পারলৌকিক কাজ সম্পূর্ণ হবে না। মায়ের মৃত্যুদিনে ছোট আয়োজনে আবার একবার শ্রাদ্ধ হবে। বাৎসরিক বলে তাকে। বাড়ির বড়দের থেকে জেনেছে সায়র।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

শাস্ত্রমতে এই বছরটায় সায়রদের বাড়িতে কোনও শুভ কাজ সম্পন্ন হবে না। শাস্ত্র-টাস্ত্র অত মানে না বাবা। মানে বাড়ির বড়দের। ওদের অমতে কিছু করবে না। তাছাড়া চক্ষুলজ্জার ব্যাপারটা তো আছেই, পাড়ার লোক কী ভাববে! ক'মাস আগেও বউয়ের সঙ্গে হাসিমুখে ঘুরছিল, এত লোভী, বউটা মরতেই বিয়ে করে নিল। বছর ঘুরল না। শোকতাপ কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে তো মানুষের! সায়র জানে তার বাবা লোভী মানুষদের দলে পড়ে না। বাবার বয়সী বহু লোককে দেখেছে মেয়ে দেখলেই কেমন ছুঁকছুঁক করে, কাছে ভিড়তে চায়। কিছু কাকা, জ্যাঠা টাইপের মানুষ, শালা এমনই ক্যারেক্টারলেস, বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোকেও ছাড়ে না। স্নেহের আদরের ভান করে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়েই যায়। বাবার চরিত্রে এ ধরনের কোনও বদ লক্ষণ দেখেনি সায়র। মেয়েদের থেকে একটু দূরে থাকতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে। একেবারেই রিজার্ভ টাইপের লোক। বিবাহবহির্ভূত বাবার এই সম্পর্কটার জন্য জয়িতা নাগকেই দায়ী করে সায়র। মহিলাকে ইতিমধ্যে দু'বার চাক্ষুষ করেছে সে। দু'বারই বাবার পাশে বসা অবস্থায় দেখেছে। মনোযোগ কেড়ে নেওয়ার বা প্রলুব্ধ করার যাবতীয় নিঃশব্দ ভাষা মহিলার জানা। কথা কেমন বলেন, শোনার সুযোগ হয়নি। খারাপ বলেন বলে তো মনে হয় না। নয়তো বাবাকে আটকে রাখা খুব মুশকিল। বাজে বকা, লঘু আড্ডা সহ্য হয় না বাবার। সরে যায়। তার চেয়ে একা থাকা অনেক বেশি পছন্দ করে। মা বেঁচে থাকলে জয়িতা নাগকে নিয়ে এত ভাবত না সায়র। বাবাকে গিয়ে মজার সুরেই বলত, কী ব্যাপার, এক মহিলার সঙ্গে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে, মাকে বলব?

বাবার সঙ্গে সায়রের সম্পর্ক একেবারেই ফ্রি অ্যান্ড ফ্রাঙ্ক। এ ধরনের কথা বলাই যায়। মায়ের বর্তমানে বাবা এই রিলেশনটা নিয়ে বেশিদূর এগোতও না। মায়ের প্রতি সম্ভ্রম ছিল বাবার। সেটাতে ভয়ের চেয়ে ভালোবাসা ছিল বেশি। মায়ের পার্সোনালিটিও খুব স্ট্রং। মা যতদিন বেঁচে ছিল জয়িতা নাগের সামনে বাবা নিশ্চয়ই এতটা ফ্রি থাকত না। দু'বারই মহিলার পাশে বাবাকে বেশ প্রশান্ত দেখিয়েছে। যেন ছ'মাসের আগের ধাক্কাটা সামলে উঠেছে পুরোটাই। জয়িতা নাগও কি এতটা প্রগল্‌ভ ছিলেন ছ'মাস আগে? এখন দেখছেন রাস্তা ক্লিয়ার, অনায়াসে দেবাংশু চ্যাটার্জির জীবনে ঢুকে পড়া যায়। আহ্লাদের জাল বিছিয়েছেন বাবার জন্য। বাবা যদি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বিয়ে করে জয়িতা নাগকে, চাঁদপাড়ার ওই বাড়িতেই এনে তুলবে। প্রচণ্ড হোমসিক বাবা। বাড়ির দিকে তাকানো, দেওয়ালে পাঁচিলে হাত রাখা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমার ফটো মোছা দেখেই বোঝা যায়। জয়িতা নাগকে বিয়ে করার পর মায়ের ফটো কি সরিয়ে দেবে বাবা? না, সরাবেন ওই মহিলা। জাঁকিয়ে বসতে অসুবিধে হবে যে। সায়রের পরিবারের লোকজনও এমন নরম প্রকৃতির জয়িতা নাগকে বাধা দেবে না বাড়িতে ঢুকতে। মায়ের কথা মনে করে মন খারাপ করবে, সায়রকে নিয়ে করবে ফিসফাস। জেঠিমা হয়তো চাপা সন্তাপের গলায় জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, পেট ভরে খেয়েছিস, নাকি আমার কাছে খাবি দু'মুঠো?

জেঠু হয়তো কাঁধে হাত রেখে হাইপাওয়ারের চশমা পরা মুখটা একটু পিছিয়ে নিয়ে বলল, তোকে এত রোগা লাগছে কেন রে...?

বাবার বিয়েতে হয়তো সানাই বাজবে। ফুল সাজানো গেটের সামনে অতিথি অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়ে থাকবে সায়র। হিমিকার মা, বাবা আসবে নেমন্তন্ন খেতে। সায়র বলবে, আসুন! আসুন!

নিমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও হিমিকা আসবে না। ততদিনে সায়রের থেকে অনেকটাই দূরে চলে যাবে। প্রেমিকের বাবার যদি বউকে ভুলতে একবছরও না লাগে, তার ছেলের চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান হবে সে...এতদূর ভাবার পরই ঘাড়, মাথা কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করতে থাকে সায়রের। এসব কিছুই ঘটতে দেবে না। মেনে নেবে না এই অপমানের জীবন। জয়িতা নাগকে জিততে দেবে না কিছুতেই। এদিকে মহিলাকে যে পৃথিবী থেকে সরাতে পারবে না, সেটাও বুঝে গেছে। রনো ঠিকই বলেছে, সবার দ্বারা সব কাজ সম্ভব নয়। ওরকম নিষ্ঠুর কাজ করার মতো মন তৈরি হয়নি তার। ছোট থেকে প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা সায়রের হয়নি। সেই কারণে বিচার বিবেচনা বিবেক পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। আড়াল করেছে জয়িতা নাগকে, আড়াল সরিয়ে মহিলাকে হারাবেই সায়র। অভিলাষ পূর্ণ হতে দেবে না। নেহাতই একটা কার্যকারণে মহিলা এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেন। হিমিকার মায়ের থেকে ঘটনাটা জানা এবং বাবা আর জয়িতা নাগকে একসঙ্গে দেখার পর ভয়ঙ্কর একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল সায়র। তখন তার একটাই লক্ষ্য জয়িতা নাগকে পৃথিবীতে থাকতে দেওয়া চলবে না। ব্যাপারটাকে ঠিক পাগলামির পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা, কে জানে! কাজটা সফল করার জন্য

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

যতটা সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন, সজাগ থাকার দরকার, হান্ড্রেড পারসেন্ট ছিল। পাগলদের পক্ষে কি এতটা সচেতন থাকা সম্ভব? তা হলে আর তাকে পাগল বলা যাবে কী করে! রনো জলিদার কারখানায় পৌঁছে দেওয়ার পরই সায়র নিজের প্ল্যান মতো ওকে ফিরে যেতে বলে। প্রথমে রাজি হচ্ছিল না রনো। সায়রের যুক্তিতে সাপোর্ট দেয় জলিদা। কথা হচ্ছিল জলিদার টালির চালের জুতো কারখানার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। মানিকতলার তস্য গলির ভিতর কারখানা। গলিটা সূর্যের মুখ দেখেনি কোনওদিন। ট্যাক্সি থেকে নেমেই জলিদাকে মিসডকল দিয়েছিল রনো। বছর চল্লিশের কালো, ভারী চেহারার জলিদা অপেক্ষা করছিল কারখানার দরজায় এসে। গোল গলা লাল গেঞ্জি, বুকে অনেক কিছু লেখা। কিছু অক্ষর খসে গেছে, নীচে ফুল ছাপ লুঙ্গি। রনো সায়রকে দেখিয়ে বলেছিল, এর কাজ বুঝলে। আমার জিগরি দোস্ত।

কাজটার গুরুত্ব জেনেও জলিদা এমন সৌজন্যের হাসি হেসেছিল, যেন সায়র কারখানায় সস্তায় জুতো পাবে বলে এসেছে। উত্তরে সায়র হাসতে পারেনি। তখনই রনোকে বলেছিল, এবার তুই চলে যা। তোর কাজ শেষ। আমি চাই না লাফড়াটায় তোর নাম কোনওভাবে জড়িয়ে যাক।

—আমি টোটাল ব্যাপারটাতেই তোর সঙ্গে থাকব। পাশে একজন থাকা দরকার। বলেছিল রনো।

সায়র তখন বলে, পাশে আছে তো জলিদা। সেই বিশ্বাসেই তো এলাম এখানে।

কথায় সায় দিয়ে জলিদা বলে উঠেছিল, ঠিক কথাই তো বলছে। তুম কাহে ইতনা সোচ রহে হো! ম্যায় হুঁ না।

রনো আর কথা বাড়ায়নি। চলে যাওয়ার আগে বলেছিল, এখান থেকে বেরিয়ে কল মারিস একটা।

সেই ফোনটা করা হয়নি সায়রের। জলিদার সঙ্গে মিটিং-এ বসে মাথা-টাথা সব গুলিয়ে গিয়েছিল। প্রথমত জলিদাকে আইডেন্টিফাই করতেই সমস্যা হচ্ছিল খুব। লোকটার মাতৃভাষা, ধর্ম কোনওটাই ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছিল না। মোটামুটি একটা পরিচয় আন্দাজ করতে পারলে কথা চালাতে সুবিধে হয়। তার ওপর কারখানায় ঢুকেই এমন একটা বিচ্ছিরি আচরণ করেছিল জলিদা, মনটা দমে গিয়েছিল সায়রের। দরজা দিয়ে ঢুকেই প্রথম

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ঘরটাতে কাজ করছিল প্রচুর লেবার। কেউ চামড়া কাটছে, কেউ বা সেলাই, পালিশ, আঠা দিয়ে জুড়ছে সোল। ছেলেদের সঙ্গে কিছু মেয়েও করছে কাজ। ঘরের চার দেওয়ালে কাঠের র‍্যাক, সার সার সুতো আর চামড়ার গা-গোলানো গন্ধ। সামনের ঘর থেকে পিছনের ঘরে যাওয়ার দরজার মুখে বসে ছিল এক মেয়ে। একমনে কাজ করছিল। সরতে না বলে জলিদা লাথি চালিয়ে দিল মেয়েটির পিছনে। সরে গেল মেয়েটা। জলিদা নির্বিকারভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। যেন এটাই দস্তুর। অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় সায়র পুরোপুরি থ। দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল। সায়রকে এগোতে না দেখে মুখ তুলেছিল মেয়েটা। এক্সপ্রেশনে রাগ, অভিযোগ কিচ্ছু নেই। চোখ দুটো যেন জল না থাকা যমজ কুয়ো! নিদারুণ অসহায় লাগছিল মেয়েটাকে। কতটা গভীরভাবে অসহায়, হয়তো নিজেই জানে না! জলিদার ওপর প্রচণ্ড রাগ জমা হওয়ার আগেই সায়র নিজেকে বোঝায়, লোকটা নিষ্ঠুর বলেই তো ওর কাছে এসেছি। অ্যাসাইনমেন্টটা ঠিকঠাক ওতরাতে পারবে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল উল্টো, জলিদার অ্যান্টিচেম্বারে বসে সায়র যখন বলল, 'একজনকে মার্ডার করতে হবে,' জিভ কেটে কান মুলে জলিদা বলেছিল, আই বাপ, উতনা হেবি কেস মেরা বসকা নেহি হ্যায়। উসমে গুনাহ ভি জাদা হোতা হ্যায়। রনো তোমায় বলেছে, মার্ডারের অর্ডার নিই?

—না, তা বলেনি। আমি ভাবলাম বেশি টাকা দিয়ে যদি ডোজ বাড়ানো যায়, তা হলেই তো মার্ডার। বলেছিল সায়র।

জলিদা মাথা নেড়ে বলল, না ভাই। মার্ডার কেস আমি নিই না। তার জন্য অন্য এজেন্ট আছে। তোমার ফোন নাম্বারটা দাও, সে যোগাযোগ করে নেবে। আমি শুধু জখমি করার কেস নিই।

বাঁকা হাসি হেসেছিল সায়র। বলেছিল, আমাকে দেখে কি এতটাই বুদ্ধু মনে হয়, যে নিজের কন্ট্যাক্ট দিয়ে দেব! আপনি এজেন্টের নাম্বার দিন, যোগাযোগ করে নেব অন্য কোনও নাম্বার থেকে।

—ইয়েহি তো প্রবলেম হ্যায় বস। ও ভি আপনা নাম্বার বিনা জান পহেচান আদমি কো নেহি দেতা হ্যায়। তুমহারা সাথ কভি মিলেগা ভি নেহি। কাম হো যায়গা। অ্যাডভান্স, বাকি পেমেন্ট কাঁহা দেনা হোগা, বাতা দেগা ও।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জলিদার কথা শুনে সায়র বলেছিল, এভাবে কাজ হয় নাকি। সে আড়ালে থেকে যাবে, আমি নাম্বার দিয়ে নিজেকে এক্সপোজ করে রাখব! সে যদি কাজটা করতে গিয়ে ফেঁসে যায়, নিজের অপরাধ কমানোর জন্য আমার নাম্বারটা পুলিশকে দিয়ে দেবে।

—দেখ ভাই, ইয়ে সব কাম ট্রাস্ট কে উপর হোতা হ্যায়। কাম ও ভি খুদ নেহি করেগা। কিসিকো দে কর করবায় গা। ও ভি মেরা য্যায়সা এক এজেন্ট হ্যায়। বলেছিল জলিদা।

সায়র বলে, বিশ্বাস ব্যাপারটা দু পক্ষ থেকে থাকা উচিত। তবেই সেটা মজবুত হয়। ওয়ান সাইডেড বিশ্বাস মানে ব্লাইন্ড বিলিভ।

নীচের ঠোঁট উল্টে কিছুক্ষণ ভেবে নিল জলিদা। তারপর বলেছিল, ঠিক হ্যায়, এক কাজ করা যাক। আমার সেট থেকে ফোন লাগাচ্ছি, তুম বাত কর লো। উসকে পহেলে ফাইনালি সোচ লো, জখমি সে চলেগা, না মার্ডারহি করনা পড়েগা। মামলা বহোত ভারী হোগা, রুপিয়া ভি লাগে গা জাদা। একবার ডিল হয়ে গেলে তুমি পিছোতে পারবে না।

এই কথার পরেই কনফিউজড হয়ে গিয়েছিল সায়র। নানান প্রশ্ন আসছিল মাথায়। কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর না পেয়ে জলিদাকে বলেছিল, ঠিক আছে, দুদিন একটু ভেবে নিই। তারপর আপনাকে জানাচ্ছি।

—ঠিক হ্যায়, কোই প্রবলেম নেহি। বলেছিল জলিদা।

সেই যে চলে এসেছে সায়র, জলিদার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি। লোকটা এখন রনোকে ধরেছে, জ্বালিয়ে মারছে। সবচেয়ে বড় ব্লান্ডারটা করেছে, রনোকে জানিয়ে দিয়েছে সায়র একজনকে খুন করাতে চায়। এই লোকটাই আবার বিশ্বাসের কথা বলছিল। জলিদা তো দেখেছিল ডিলিং-এর সময় রনোকে পাশে রাখেনি সায়র। ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাতেই বুঝেছিল সায়র ব্যাপারটা কতটা সিক্রেট রাখতে চায়। তার পরেও যেটা করছে, পাক্কা হারামিগিরি ছাড়া আর কিছু নয়। মালটাকে শক্ত হাতে ডিল করতে হবে।

অ্যাসাইনমেন্টটা নিজের হাতে রাখার জন্যই শেষ কথাটা তুলেছিল জলিদা। সেটা বুঝেও পয়েন্টটা স্ট্রাইক করেছিল সায়রের মাথায়, মৃত্যুর আগে অবধি নিয়ে গিয়ে জয়িতা নাগকে যদি জানানো যায়, দেবাংশু চ্যাটার্জিকে না ছাড়লে এর পরের স্টেপ অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—হয়তো এতেই কাজ হয়ে যাবে। খামোখা খুনখারাবির মধ্যে যাবে কেন সায়র? জলিদার মতো নিষ্ঠুর লোক মহিলা লেবারটিকে যেভাবে লাথি মারল, সেই জলিদা পর্যন্ত খুনের ঝামেলায় যেতে চাইছে না, সেখানে সায়রের এত রিস্ক নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। হিসেবমতো জলিদারই খুন হওয়া উচিত, গরিব মহিলার সঙ্গে যে বিহেভটা করল এবং যা যা কাজ করে বেড়ায়, সমাজে থাকার যোগ্য নয় সে। এই সূত্রে বাবাকেও দায়ী মনে হয়েছিল সায়রের। জয়িতা নাগকে একা দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক হচ্ছে না। বাবার সায় ছিল বলেই রিলেশনটা বিল্ট হয়েছে। নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখলে বাবার অপরাধটা বেশি। স্ত্রীকে লুকিয়ে রিলেশনটা চালিয়ে গেছে। সেইদিক থেকে জয়িতা নাগ অনেক ক্লিন। উনি বিয়ে করেননি, কারোর প্রতি কমিটেড নন। সন্তান বলেই বাবার দোষ চোখে পড়ছে না সায়রের। জয়িতা নাগ খুন হওয়ার আগে বাবার হওয়া উচিত। হিটলিস্টে হিমিকার মায়ের নামও চলে এল, উনি কি জানতেন না, যে খবরটা দিচ্ছেন, সায়রের মনে কী মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে! উনি নিজের পরিবারের স্বার্থ বা সম্মানটাই বড় করে দেখলেন! এমনও হতে পারে, সায়রকে পুরোপুরি ডেস্ট্রয় করার জন্যই খবরটা উনি দিয়েছিলেন। আর একটু হলেই তো সায়র সারাজীবন খুনের দায় মাথায় নিয়ে ঘুরত। মেয়ের লাইফ পার্টনার হিসেবে সায়রকে উনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। এই ভদ্রমহিলাও পৃথিবীতে থাকার যোগ্য নন। সমাজে এরকম আরও কত মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকবে, জয়িতা নাগকে শুধু মরে যেতে হবে কেন? তার চেয়ে জলিদার মাধ্যমে ভয়াবহ একটা থ্রেটনিং দেওয়াই ভালো। ডিসিশন ফাইনাল করতে গিয়ে থমকেছিল সায়র, উলটো কেস হবে না তো? জয়িতা নাগ ভয়-টয় পেয়ে শেল্টার নিতে আগেভাগেই হয়তো ঢুকে পড়বে সায়রদের বাড়িতে। উনি তো আর জানবেন না থ্রেটনিং-এর বন্দোবস্তটা সায়রই করেছে। ...জলিদার সামনে ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছিল সায়রের। তাই পরে জানাচ্ছি বলে চলে এসেছিল। সন্ধের মুখে সেদিনই ফের গিয়েছিল কলেজ স্কোয়্যারে। দু'জনকে দেখা গেল না কোনও বেঞ্চে। ওখান থেকে বেরিয়ে কফি হাউসের কাছে আসতেই দেখে, বাবা, জয়িতা নাগ বেরিয়ে আসছে কফি হাউসের গেট দিয়ে। চট করে বইয়ের একটা গুমটির আড়ালে চলে গিয়েছিল সায়র। দেখছিল, বাবা আর ওই মহিলাকে এগিয়ে যেতে। গায়ে গায়ে হাঁটছিল

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দু'জনে। জয়িতা নাগ বোধহয় একবার ধরল বাবার হাত। বাবার নির্লিপ্ত হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, লোকটার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, চাঁদপাড়ার বাড়ির কথা, ছেলে-বউয়ের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। ওরা চোখের বাইরে চলে যেতে সায়র নতুন করে ভাবতে বসেছিল, কোন পন্থায় জয়িতা নাগকে বাবার জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়? এটাও বুঝতে পারছিল, কাজটা তাকে একাই করতে হবে। গুণ্ডামস্তান দিয়ে হবে না। কোনও বুদ্ধিই আসছিল না মাথায়। এটা এমন একটা বিষয়, কারোর সঙ্গে আলোচনাও করা যাচ্ছে না। কী যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না সায়র। বাড়ি ফিরে বাবাকে দুখু দুখু মুখ করে ঘুরতে দেখে, মাথাটা আরও গরম হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটা তো ভরপুর অ্যাক্টিং করে যাচ্ছে! বাড়ির সবাইকে ডেকে আঙুল তুলে বলবে নাকি, লোকটা ভণ্ড। এর আসল রূপ এটা নয়। প্রকৃত চরিত্র দেখে এসেছি কলেজস্ট্রিটে। একটা মেয়ের হাত ধরে ঘুরছিল। প্রায়ই ঘোরে। মা মারা যাওয়ার অনেক আগে থেকেই ঘুরত...এতটা কোণঠাসা করে দিলে চলবে না। জয়িতা নাগকে এখনই বিয়ে করার জেদ চেপে যাবে বাবার। সবাই সবকিছু যখন জেনেই গেল, তাহলে আর শোক স্তিমিত হতে দেওয়ার জন্য সময় নেওয়া কেন? বাবাকে অপদস্থ করা থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করেছিল সায়র। কিন্তু রিলেশনটা ভাঙার কোনও রাস্তাই মাথায় আসছিল না। বাড়িতে বাবা কোনও কারণে কাছে চলে এলেই মনে হচ্ছিল, এখনই বলে উঠবে, সায়র তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। অনেকদিন ধরেই বলব বলব ভাবছি...

কী কথা সায়র জানে। উত্তরে কী বলবে জানা নেই। সায়র নিজেকে বোঝাচ্ছিল, এতদিন যখন বলেনি, এখনই হয়তো বলবে না। মায়ের সম্মানে আরও কয়েকমাস সময় নেবে। যা করার এই সময়ের মধ্যেই করতে হবে সায়রকে। পরের দিন কলেজে খুবই নর্মাল থাকার চেষ্টা করছিল সায়র। রনো হন্তদন্ত হয়ে এসে সায়রকে আলাদা ডেকে নিয়ে বলেছিল, কীরে, সব সেটলমেন্ট হয়ে গেছে তো? ফোন করলে ধরছিস না কেন?

—ব্যাটারিতে চার্জ থাকছে না। চেঞ্জ করতে হবে। সব কথা হয়ে গেছে। কোনও প্রবলেম নেই। কাজ হয়ে গেলেই তোকে জানিয়ে দেব। ঠিকানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এগেন থ্যাঙ্কস। বলার পর সায়রের মনে হচ্ছিল, রনোকে সত্যি কথাটা বলে দিলে হয়তো ভালো হত। সজেশন দিতে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পারত কিছু। কোনও একজনকে বলাটা খুব দরকার। কিন্তু তারপরই স্বাভাবিক কারণেই রনো যে কোয়্যারিগুলো করত, এ্যাম্বার্যাসড হত সায়র। জয়িতা নাগকে দেখতে চাইত রনো। সায়রের মাকে কখনও দেখেনি, মায়ের ফটো চেয়ে কমপেয়ার করত জয়িতা নাগের সঙ্গে...এরকম আরও অনেক কিছুই ফেস করতে হতে পারে। প্রবলেমটা কাউকেই জানানো যাবে না। কষ্ট একাই ভোগ করতে হবে সায়রকে, সলিউশন বার করবে নিজে। থ্যাঙ্কস জানানো সত্ত্বেও যেমন রনোর কৌতূহল চাপা দেওয়া যায়নি। জিজ্ঞেস করেছিল, কত টাকায় রফা হল কেসটা?

—এটা জানতে চাস না। পার্ট অফ সিক্রেসি বলেই ধরে নে। বলেছিল সায়র।

মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কথাটায় আহত হয়েছে রনো। সেটা লুকোনোর চেষ্টায় জোর করে হেসে বলেছিল, ঠিক হ্যায়, কেসটা সাকসেসফুলি উতরে গেলে মাল খাইয়ে দিস একদিন।

রনোর কথাটাই উসকে দিল কিনা, কে জানে! কলেজ ফেরত ধর্মতলার এক সস্তার বারে ঢুকে বেদম মদ খেয়ে ফেলল সায়র। ওই অবস্থায় বাড়ি ঢোকার ইচ্ছে ছিল না। চাঁদপাড়া স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে বসে ছিল অনেক সময় ধরে। ঠিক করেছিল নেশা কমলে বাড়ি ঢুকবে। কিন্তু নেশা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকছিল। চোখ বুজে আসছিল, দু-একবার বোধহয় শুয়েও পড়েছিল বেঞ্চে। ওদিকে রাত বাড়ছে, হিম পড়ছিল সম্ভবত, কীরকম একটা ভেজা ভেজা ওয়েদার। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা, আড্ডা মারতে আসা বুড়োদের দলও নেই। সায়র খেয়াল করেছিল, তিনটে লোক তার আশপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘুরঘুর করছে। কখনও চলে আসছে কাছে। ঘনঘন বিড়ি বা সিগারেট খাচ্ছিল ওরা। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, সায়রের ঘুমের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছে তিনজন। অচেতন হলেই ওয়ালেট, সেলফোন সব নিয়ে নেবে। কেড়ে নিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, সায়র যে বাধা দিতে পারবে না, বুঝতেই পারছিল ওরা। হয়তো প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক দু-একজন সাধারণ লোক ছিল, তাই ওরা ফাইনাল অপারেশনে যায়নি। সায়র বেশ ভয় পেয়ে উঠে এসেছিল বেঞ্চ থেকে। প্ল্যাটফর্ম ধরে যখন হেঁটে যাচ্ছে, সিরসির করছিল পিঠ। মনে হচ্ছিল এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। সায়রের ওয়ালেটে টাকাপয়সা বিশেষ কিছু ছিল না। এটিএম কার্ডটা নিয়েই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চিন্তা। ওই কার্ড প্রচুর টাকার চাবিকাঠি। মা আর সায়রের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের সমস্ত টাকা এই কার্ড দিয়ে তুলে ফেলা যাবে। ইদানীং হ্যাকারদের যা দাপট এবং এতটাই ঘাঘু তারা, কার্ডের পিন নাম্বার ব্রেক করতে আধঘণ্টাও লাগবে না। ব্যাঙ্ককে জানিয়ে কার্ডটা নিষ্ক্রিয় করার টাইমই পাবে না সায়র। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকাটাই এখন সায়রের মনের জোর। ওই টাকার খানিকটা অংশ খরচ করে জয়িতা নাগকে বাবার জীবন থেকে সরিয়ে দেবে ভেবেছিল। ওই কার্ড ভাঙিয়ে সেদিন প্রচুর মদ খেয়েছিল সায়র। কার্ডটা চোরবাটপাড়দের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে বাড়িতে একটা সিন করে ফেলল। বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল উঠোনে। পরে নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল। ভয় হচ্ছিল ভেবে, বাবা বোধহয় এবার কার্ডটা কেড়ে নেবে। আন্দাজ করা খুবই সহজ, কার্ডটা সঙ্গে আছে বলেই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে মদ খেতে পারছে সায়র। বাবা হয়তো কার্ডটা চাইতেই এসেছিল পরের দিন সকালে। মিষ্টি করে কথা শুরু করেছিল, সায়র প্রথমেই এমন অ্যাটাকে গেছে, প্রসঙ্গটা তোলার সুযোগই পায়নি বাবা। উঠে গিয়েছিল ঘর থেকে।

মদ খেয়ে উঠোনে পড়ে থাকার জন্য যথেষ্ট অনুতপ্ত হয়েছিল সায়র। যতটা না বাবার কথা ভেবে, তার চেয়ে বেশি বাড়ির আর পাঁচজনের কথা মনে করে। প্রত্যেকেই এত ভালোবাসে সায়রকে...। পরে ওই অপকর্ম নিয়ে জেঠিমা ছাড়া আর কেউ কোনও কথা তোলেনি। যেন ঘটেইনি ঘটনাটা। পরের দিন একটু বেলার দিকে সায়র একবার নীচে গিয়েছিল, জেঠিমা কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলে, কাল রাতে কী কাণ্ড করলি, ছিঃ! আমাদের কথা না ভাবিস, তোর বাবার দিকটা তো একটু দেখবি। লোপা চলে যাওয়ার পর থেকে মানুষটা আজও স্বাভাবিক হল না। মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার ওপর তোর এই সব কীর্তি। মেজ ঠাকুরপো কত কষ্ট পেল বল তো।

সায়র বলতে পারেনি ওই লোকটার কারণেই আমি কন্ট্রোলের বাইরে চলে গিয়েছিলাম। বলেছিল, ভুল হয়ে গেছে জেঠিমা। আর কোনওদিন হবে না।

এরপরই জেঠিমা সায়রের মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরে কান্নাচাপা গলায় বলেছিল, মা বেঁচে থাকলে তো এই কাণ্ড করতে পারতিস না। আমাদের ধর্তব্যের মধ্যে ফেলিস না বলেই...। আমরাও কিন্তু তোকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

গলার কাছে কষ্ট দানা বাঁধছিল সায়রের। সামলে নিয়ে ছোটখাটো চেহারার জেঠিমার দু কাঁধে হাত রেখে, একবার নাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, বললাম তো আর এরকম হবে না। প্রমিস।

জেঠিমা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, কম বেশি নয়, ছাইপাঁশ আর খাওয়াই চলবে না। খাওয়ার মতো বয়স সায়রের হয়নি।

বাড়ির সাইড বেশ ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন কলেজে হিমিকার মায়ের ফোন, আজ সন্ধের দিকে একবার দেখা করতে পারবে?

হেভি টেনশনে পড়ে গিয়েছিল সায়র, আবার কী হল? বাবার সম্বন্ধে আরও বড় কোনও খারাপ খবর দেবেন কি? সন্ধের মুখেই হিমিকাদের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল সায়র। কাকিমা বললেন, বাবা হিমিকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। দু'জনের কী কথা হয়েছে, কাকিমা জানেন না। হিমিকা বলছে না কিছুতেই।

কথা যখন হচ্ছিল কাকিমার সঙ্গে হিমিকা গিয়েছিল টিউশন নিতে। হিমিকা ফিরতেই ড্রয়িং থেকে উঠে গিয়েছিলেন কাকিমা। সায়রকে দেখে খুবই অবাক হয়েছিল হিমিকা। বলেছিল, কী ব্যাপার রে, বললি যে মিট করবি না একমাস...

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সায়র। বলেছিল, একটা কথা জেনেই চলে যাব। তোর সঙ্গে কী কথা বলে গেল বাবা?

—বলব না। ওটা আমার আর কাকাবাবুর মধ্যে কথা। সাফ জানিয়েছিল হিমিকা।

সায়র প্রায় অনুরোধের সুরে বলে, বাবা কী বলে গেল আমায় বল হিমিকা। আমার জানাটা ভীষণ দরকার। মানুষটাকে ওপর থেকে দেখে যতটা ভদ্র ভালো বলে মনে হয়, মোটেই ওরকম নয়। ওটা ক্যামোফ্লেজ। নিজের স্বার্থের জন্য অনেক কিছুই করতে পারে লোকটা। ফুল জালি মাল...

কথাটা শেষ হতেই দু'হাত দিয়ে বুকে প্রবল ধাক্কা মেরেছিল হিমিকা। সিনেমা, নাটকে এই সিচুয়েশনে ঠাঠিয়ে একটা চড় মাস্ট। ঝাঁঝালো গলায় হিমিকা বলেছিল, চলে যা আমার সামনে থেকে। কোনওদিন আসবি না। বড়দের সম্মান দিয়ে কথা বলতে পারে না যে, তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই আমার।

হিমিকাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল সায়র। রিলেশন বোধহয়

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

একেবারে ব্রেকআপ হয়ে গেল। কারণ, হিমিকার তিরস্কারে বাবার প্রতি সম্মান ফেরেনি সায়রের। মনে মনে বলেছিল, লোকটা মাইরি ফুর্তি মেরে বেড়াচ্ছে, আমি কেস খেয়ে মরছি।

তবে হিমিকার কাছে ঝাড় খেয়ে একটা বিষয়ে চোখ খুলে গিয়েছিল সায়রের। বুঝতে পেরেছিল, যে ভাবমূর্তি দেবাংশু চ্যাটার্জি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে চেনা পরিচিতদের মধ্যে, সেটা ভেঙে চট করে জয়িতা নাগকে ঘরে তুলবে না। অপেক্ষা করবে উপযুক্ত পরিস্থিতির জন্য। যখন হয়তো আত্মীয়পরিজনরাই বাবাকে বলবে বিয়ে করতে। সিচুয়েশনটা বুদ্ধি করে তৈরি করবে চ্যাটার্জি বাড়ির মেজ ছেলে। তাতে সায়রের লাভ একটাই, হাতে সময় পেয়ে যাবে অনেক। মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্ল্যান বার করে ভেঙে দেবে বাবার সম্পর্কটা। এখন মাথা গরম অবস্থায় যা কিছু করতে যাবে, গণ্ডগোল পাকিয়ে যাওয়ার চান্সই বেশি। ...এইসব ভেবে গতকাল কলেজ বাঙ্ক করে গিটারটা নিয়ে ভানুদার কাছে গিয়েছিল। গানবাজনার মধ্যে থাকলে উত্তেজনাটা যদি একটু কমে। মা মারা যাওয়ার পর প্রথম যাওয়া। ক্লাস করাচ্ছিল ভানুদা। অনেকধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট শেখায়। প্রচুর স্টুডেন্ট। গিটার হাতে সায়রকে দেখে খুবই খুশি হয়েছিল ভানুদা। বলেছিল, আয় আয়। আমি ক-দিন ধরেই তোর কথা ভাবছি। আর ক-দিন পর তোদের বাড়িই চলে যেতাম।

সামান্য হলেও বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল সায়রের, ভানুদাও কি বাবার রিলেশন নিয়ে কোনও খবর দেবে? দু'জনকে কোথাও দেখেছে একসঙ্গে? ভানুদার এক্সপ্রেশন দেখে অবশ্য তেমনটা মনে হচ্ছিল না। সায়র তাই বলেছিল, কোনও প্রোগ্রাম আছে নাকি সামনে? বাজাতে হবে আমাকে?

—না, ভাই, তুমি তো আর আমাদের মতো বাদক নও, তুমি হচ্ছে গিয়ে গায়ক। কেমন আছ, গানবাজনা চলছে কিনা, সেটাই জানতে যেতাম। ফোনে তো সব কথা হয় না।

স্নেহের সুরে কথাগুলো বলেছিল ভানুদা। আর এটা সত্যিই, সায়র গিটারটা শিখছিল নিজের গানের সঙ্গে বাজাবে বলে। সেইজন্যই প্রথম থেকে স্প্যানিশ গিটার শিখেছে, প্লেকট্রামের দিকে যায়নি। কাল ভানুদার সামনে এ মাইনর, জি মেজর, এফ মেজর, ই মেজর ভালোই বাজিয়েছে সায়র। জি সেভেনে গিয়েই জড়িয়ে ফেলছিল। সি ডিমিনিশের অবস্থা তো

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

খুবই খারাপ। কপালে ভাঁজ পড়েছিল ভানুদার। বলেছিল, কী ব্যাপার রে, গত ক'মাস গিটার ছুঁসনি নাকি? তাতেও এত জড়ানোর কথা নয়! কী হয়েছে তোর? কত ভালো বাজাতিস...

সায়র কোনও অজুহাত দেয়নি। ফের ট্রাই করছিল কর্ডগুলো। ওই মুহূর্তে সায়র অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কারণে। দোতলায় ভানুদার ক্লাসরুমে ওঠার আগে বাড়ির গেটে দেখেছিল শিশিরদা ম্যাটাডোরে মাল লোড করাচ্ছে। শিশিরদা ভানুদার ভাই। দৃশ্যটার মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না, ভানুদার কাছে বাজনা শিখতে এসে আগেও দেখেছে সায়র। কাল খানিকক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়িতে পেটি লোড করা দেখছিল। বড় বড় বাক্সগুলোর মধ্যে সাবান, তেল, বিস্কিট এরকম নানান ধরনের জিনিস আছে। চার-পাঁচটা কোম্পানির ডিলারশিপ নেওয়া আছে শিশিরদার। মালগুলো দোকানে দোকানে ডেলিভারি হতে যাচ্ছে। ঠিক ওই ধরনের একটা দোকান আছে জয়িতা নাগের বাড়ির সামনে। হিমিকার মায়ের থেকে পাওয়া ইনফর্মেশনের মধ্যে এটা একটা। জয়িতা নাগের চাকরি আর ওই দোকানের রোজগারে ওদের সংসার চলে। শিশিরদার ম্যাটাডোর কি ওই দোকানেও যাবে মাল সাপ্লাই করতে? ডেলিভারি ম্যান পরিচয়ে ম্যাটাডোরটায় উঠে পড়লে কেমন হয়? পৌঁছে যাবে জয়িতা নাগদের দোকানে। মাল ডেলিভারির ফাঁকে আলাপ জমাবে দোকানির সঙ্গে। জয়িতা নাগ বিষয়ে আরও ইনফর্মেশন বার করবে। ওদের বাড়ির আশপাশের রাস্তাঘাট, লোকজনের ধরনধারণ বুঝে নেবে ভালো করে। প্রতিপক্ষকে হারাতে হলে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জেনে নেওয়া জরুরি। জানতে গিয়ে এমন কোনও দুর্বলতা চোখে পড়ল, সেই রাস্তায় আক্রমণে গেলে সহজে জয়িতা নাগকে পরাস্ত করা যাবে।...এত দূর ভাবার পর সায়রের খেয়াল হয় জয়িতা নাগের বাড়ি অন্য জেলায়, গঙ্গার ওপারে। এত বড় টেরিটরির মাল সাপ্লাইয়ের এজেন্সি শিশিরদা পাবে না। অতদূর ডেলিভারি দিতে যাওয়াও লস, তেলের খরচ আর টাইমের জন্য মালের কস্ট বেড়ে যাবে। এই ফাণ্ডাগুলো কখনও হয়তো শিশিরদার থেকেই পেয়েছিল সায়র। তখনকার মতো ম্যাটাডোরে উঠে পড়ার ভাবনা ছেড়ে সায়র উঠে গিয়েছিল দোতলায়। ভানুদার সামনে বাজাতে বসে বারবার মন চলে যাচ্ছিল ওই ভাবনায়, জয়িতা নাগের দুর্বলতার সন্ধান পেতে গেলে উপযুক্ত রাস্তা ওটাই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

যেকোনও ছুতোয় দোকানির সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ গড়ে তুলতে হবে। দোকানে কে বসে, দোকানি সম্পর্কে জয়িতা নাগের কে হয়, ক'জন থাকে দোকানে, এত ডিটেল ইনফর্মেশন কাকিমা দিতে পারেননি। সায়র দোকানে গেলে জানতে পারবে।—এইসব মাথায় চলতে থাকায় বাজনা খারাপ হচ্ছিল। ভানুদার কপালে পড়েছিল ভাঁজ। মাথায় একটা আইডিয়াও খেলে গেল বাজাতে বাজাতে। ভানুদার থেকে বিদায় নেওয়া এবং আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সায়র নীচে নেমে এসে শিশিরদার কাছে যায়। গ্যারেজঘরে শিশিরদার অফিস। টেবিল চেয়ারে বসে কীসব হিসেবপত্র করছিল শিশিরদা, সায়রকে দেখে ডেকে নিয়েছিল সাদরে, আয়, কী খবর? অনেকদিন পর দাদার কাছে এলি!

উলটোদিকে চেয়ারে বসতে বসতে সায়র বলেছিল, তোমার কাছেও এসেছি, একটা বিশেষ দরকারে।

—ও, তাই নাকি! বল শুনি। আগ্রহ দেখিয়েছিল শিশিরদা।

সায়র বলতে থাকে, আমার দাদু, মানে মায়ের বাবা বছর দুয়েক আগে নিজের সম্পত্তি ভাগ করে দেয় দুই ছেলেমেয়েকে। আমার আর মায়ের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে মায়ের অংশের একগাদা টাকা পড়ে রয়েছে। ভাবছি, তোমার মতো যদি কনফেকশনারির ডিলারশিপ নিয়ে বিজনেসে নামি, কেমন হয়?

—তুই তো এই সবে কলেজে ঢুকলি। এখনই বিজনেসে জড়াবি কেন? তোদের সংসারে যে খুব টাকার দরকার, তাও নয়। তোর বাবা কত ভালো চাকরি করে!

কথাগুলো যে উঠবে সায়র জানত, উত্তর রেডি করাই ছিল। সেইগুলোই বলে, বিজনেসটা ঠিক আমার জন্য করব না। ফ্যামিলি বিজনেস। সকলে সময় সাধ্যমতো নিজেকে কন্ট্রিবিউট করবে। আমাদের বাড়িতে যথেষ্ট জায়গাও আছে। এই ধরনের প্রোডাক্টের জন্য গোডাউন মাস্ট। সেইদিক থেকে আমরা একধাপ এগিয়েই আছি। ব্যাঙ্কের সুদের চেয়ে তো বেশি লাভ হবে। বাড়ির মেয়েরাও বিজনেসে হাত লাগিয়ে স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পারবে কিছু। আমার টাকায় ব্যাঙ্ককে বিজনেস করতে দেব কেন? তুমি এই বিজনেসের ব্যাপারে ফাণ্ডা দাও আমাকে।

—ওরে বাবা, তুই তো দেখছি রীতিমতো এনটারপ্রেনার। দাদার কাছে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বাজনা শিখতে এসে আমার থেকে বিজনেস জানবি, পরে দাদা ঝাড় দেবে আমায়।

—ওসব আমি সামলে নেব। তুমি ডিটেলে বিজনেসটা বুঝিয়ে দাও আমাকে। তারপর আমি বাবাকে বোঝাব।

—অ্যাটেম্পটা খারাপ না। বিদেশে স্টুডেন্টরা তো পড়তে পড়তে চাকরি বিজনেস সবই করছে। আমাদের পোড়া দেশে এসব কেউ ভাবেই না। দেখ, তোর বাবা রাজি হয় কিনা।

বলার পর ডিলারশিপ বিজনেসের সমস্ত ঘাঁতঘোঁত আগ্রহর সঙ্গে বুঝিয়েছিল শিশিরদা। সায়র কোম্পানির ব্রোশিওর লিটারেচার, অ্যাড পোস্টার, এমনকী পুরোনো বিল, চালান সবই নিয়েছিল। মাথায় ঘুরছে অন্য এক প্ল্যান, শিশিরদাকে বলেছিল আরেক কথা, বাবাকে এসব দেখাব। দেখলে বিজনেসটার ব্যাপারে অনেকটা আইডিয়া পাবে। আমি যে সিরিয়াসলি ভাবছি, বুঝতে পারবে সেটাও।

সমস্যা হল, এত কাগজপত্র নেবে কোথায়? একটু পুরোনো হলেও, সেলসম্যানেরা যে ধরনের সাইডব্যাগ নেয়, সেরকম একটাতে সব কাগজ ঢুকিয়ে শিশিরদা সায়রের কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোর মতো চেহারাতেই মানায়। আমার সেলস-এর ছেলেগুলো যেন ব্ল্যাকার। সিনেমা হল উঠে যাচ্ছে দেখে এখানে জয়েন করেছে। অবশ্য যে পয়সা দিতে পারি, ওর চেয়ে ভালো ছেলে পাওয়াও যাবে না।

শিশিরদা যাই বলুক, সায়র ভালো করেই জানে, সেলসম্যান হিসেবে তাকে মোটেই মানাবে না। চেহারায় স্টুডেন্টের ছাপ স্পষ্ট। তাই জিনস-টিনস না পরে অফিস গোয়ার্সের মতো ড্রেস-আপ করে বেরিয়েছে। শার্ট ইন করে চাপিয়েছে ব্লেজার। পাওয়ারলেস চশমা, যদি একটু গম্ভীর গম্ভীর দেখায়। নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য লাগানোর জন্যই পরা। শিশিরদার দেওয়া কাঁধব্যাগটা তো আছেই। সায়র সেলসম্যান পরিচয় নিয়ে জয়িতা নাগদের দোকানে যাবে। ট্রেনের বদলে নিজের মোটরবাইকে আসতে পারত, ইচ্ছে করেই নেয়নি। বাইকের মডেল, পিছনের নাম্বার দোকানি যদি মনে রেখে জয়িতা নাগকে বলে, উনি সায়রকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতেও পারেন। বাবা ছেলের সম্বন্ধে কতটা ইনফো ওঁকে দিয়েছে, সায়র জানে না। সায়রের ফটো নিশ্চয়ই দেখিয়েছে। আজ ওয়ার্কিং ডে, জয়িতা নাগ অফিসে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

গেছেন বলেই ধরে নেওয়া যায়। এই অপারেশনটা অনেকটা ছদ্মবেশে শত্রুপক্ষের ডেরায় ঢোকার মতো। সব ব্যাপারেই সতর্ক থাকতে হবে সায়রকে। কোনও রিস্ক নেওয়া চলবে না। ওদের দোকানে গিয়ে কী কী বলবে, মনে মনে ঝালিয়ে নিচ্ছে সায়র। তার সঙ্গে আর একটা প্রশ্নও মাথায় ঘুরছে, কাল রাতে বাবা হঠাৎ বেড়াতে যাওয়ার কথা বলল কেন? রাতের খাবারদাবার গরম করে টেবিলে সাজাতে সাজাতে সায়রকে ডেকেছিল বাবা। যেমন রোজই ডাকে। গত কিছুদিন ধরে সায়র বাবার সঙ্গে খেতে বসছে না। বাবা ডাকলেই নিজের ঘর থেকে রুক্ষস্বরে বলছে, আমি পরে খাচ্ছি। তুমি খেয়ে নাও।

উত্তরে বাবা রোজই একই সুরে, একটাই কথা বলছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তো। কাল সেটা বলল না। বলল, আমি টেবিলে ওয়েট করছি। তুই এলে খাব।

ফের টেনশন হতে শুরু করেছিল সায়রের। বাবা হয়তো আজই বিয়ের ঘোষণাটা করে দেবে। সেরকম কিছু লক্ষণও দেখা দিচ্ছে বাবার আচরণে। ইদানীং সায়র যতই উপেক্ষা, খারাপ ব্যবহার করুক বাবা কোনও রিঅ্যাকশন দেখাচ্ছে না। পুরো কুল। জানে, এ বাড়িতে জয়িতা নাগকে ঢোকাতে গেলে সায়রকে চটালে চলবে না। ক-দিন ভোর ভোর উঠে শরীরচর্চা করছে। দুদিন আগে সায়র মাঠে গিয়ে বাবার মোবাইলটা দিয়ে এল। নতুন জীবনে ঢোকার আগে নিজেকে তরতাজা রাখছে। এইসব দেখে শুনে রাগে গা রি রি করছে সায়রের। কাল বাবা বিয়ের কথাটা তুলল না। বাবা ডাকার পর সায়র বই ছেড়ে উঠেছিল দশ মিনিট পর। নিজের কোর্সের পড়াই করছিল। মন অবশ্য বসছিল না। ডাইনিং-এ গিয়ে দেখে বাবা চোখ বুজে ধ্যানস্থর মতো বসে আছে। সায়র চেয়ার টেনে বসতেই চোখ খুলেছিল বাবা। কাল সায়র সার্ভ করতে শুরু করেছিল খাবার। বাবা বলল, দে না, আমি দিচ্ছি।

সায়র বলেছিল, না ঠিক আছে, বলো কী বলবে?

—কী বলব? অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল বাবা।

ঠেস মারা সুরে সায়র বলে, কিছু বলবে বলেই তো এতক্ষণ ওয়েট করলে।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না বাবা, ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কিছু একটা মনে পড়ার মতন বলে উঠেছিল, হ্যাঁ রে, তোর এখন পড়ার চাপ কেমন?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—ভালোই প্রেশার। কেন?

—দু'তিনটে দিন বার করতে পারবি না, কাছেপিঠে কোথাও বেড়িয়ে আসতাম। অনেকদিন কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়নি।

বাবার অভিসন্ধি টের পাচ্ছিল সায়র, বিয়ের কথাটা তোলার জন্য একটা ভালো মুড, সিচুয়েশন খুঁজছে। ট্যুরের মেজাজ সেইদিক থেকে একেবারে আদর্শ। বুঝতে পারাটা গোপন করে সায়র স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, আমার হবে না। তুমি ঘুরে এসো না।

—একা একা কি ঘোরা যায়! ভালো লাগে কখনও।

বাবার কথার পরেই তির্যক একটা হাসি চলে আসছিল সায়রের ঠোঁটে। কোনওমতে ঠেকায়। হাসির পিছনের কথাটা ছিল, তোমার বান্ধবীকে নিয়ে যাও বেড়াতে। নাকি বিয়ের আগে নাইট স্টে-তে তিনি রাজি হননি। বিবাক্ত কথাটা বলার সময় এখনও আসেনি। যাতে না আসে তারই চেষ্টা করছে সায়র। আড়ালটা খসে গেলে ওই দুজনের সুবিধে। আন্তরিক পরামর্শ দেওয়ার সুরে সায়র তাই বলেছিল, কোনও রিলেটিভের বাড়ি যেতে পারো। অনেকেই তো বলে যেতে। মা মারা যাওয়ার পর তো কোথাও যাওনি।

—সে তো তুইও যাসনি। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গেলে ভালোও লাগবে না। ওভার কেয়ার নেবে, সান্ত্বনা দেবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে...

বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল বাবা। তারপর আর কথা হয়নি দুজনে। যে যার মতো খেয়ে উঠে গিয়েছিল। নিজের ঘরে ঢুকে সায়রের প্রথমেই চোখ গিয়েছিল দেওয়ালে টাঙানো বেড়াতে যাওয়ার ছবিটার দিকে, সাধারণ ক্যামেরায় মায়ের তোলা ছবি। সি বিচে সায়র আর বাবা। সায়র তখন আড়াই বছর, পরনে বাবার ফুলস্লিভ শার্ট ছুঁয়ে আছে সমুদ্রের বালি। শার্টের হাতা গোটানো। বাবা হাঁটু মুড়ে বসেছে সামনে। একটু বেঁকে সায়র বাবার মুখে তুলে দিচ্ছে বিস্কুট বা কিছু একটা। বাবা ঘাড় কাত করে মুখটা একটু হাঁ করে আছে। বাবা তখন ইয়াং, সানগ্লাস, ব্ল্যাক টি শার্ট, জিনস। মা বলত, বাপ-ছেলে দুজনেই যেন সাহেব বাচ্চা!

মা উদ্যোগ নিয়ে ফটোটা এনলার্জ, ল্যামিনেট করিয়েছিল। সায়র যখন ছোট, বাবা মায়ের সঙ্গে শোয়, ফটোটা ছিল বাবার ঘরে। বড় হওয়ার পর সায়রের ঘর আলাদা হল, বাবা ছবিটা টাঙিয়ে দিল সায়রের ঘরের দেওয়ালে। কী ভেবে ফটোটা সায়রের চোখের সামনে রেখেছিল, বাবা জানে। বাবার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ওপর এখন এত রাগ, তবু ছবিটা ফেলতে পারে না সায়র। ছবিটার মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতি দেখতে পায়, বাবাকে কেয়ার নেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

ট্রেন থামল। প্রতিটা স্টেশনেই থামছে। প্যাসেঞ্জার উঠছে নামছে। অনেকক্ষণ হল ট্রেনে উঠেছে সায়র, নৈহাটি পেরিয়ে যায়নি নিশ্চয়ই? জানলার ধার থেকে একজনের পর সিট পেয়েছে সায়র। শিয়ালদা থেকে ট্রেন ছাড়ার পর খানিক বাদেই সায়র লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিল, নৈহাটি পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে?

—এক ঘণ্টার একটু বেশি। এবার যদি সিগন্যাল-টিগন্যাল খায়, আরও টাইম লাগবে। সায়র বলে, আমি এই লাইনে প্রথম যাচ্ছি। নৈহাটির আগের ক-টা স্টেশনের নাম বলবেন, সেই অনুযায়ী নামবার জন্য রেডি হব।

—আমি নৈহাটিতেই নামব। চিন্তা কোরো না।

তারপর থেকে লোকটার ওপর নির্ভর করে বসে আছে সায়র। ট্রেন আবার চালু হল। স্টেশনের নাম পড়ে নিয়েছে সায়র, পলতা। এখনও কতদূর, জিজ্ঞেস করতে অস্বস্তি হচ্ছে সহযাত্রীটিকে। পথঘাটে কিছু মানুষ থাকে, যারা অভিভাবকত্বর দায়িত্ব পেলে বেশ খুশি হয়। সায়রের বাঁ-পাশের লোকটির হাবভাব সেরকমই। দূরত্ব জিজ্ঞেস করলেই, ক্ষুণ্ণ হয়ে গম্ভীরভাবে উত্তর দেবে, এখনও দেরি আছে। তারপর দেখা যাবে হঠাৎ সিট ছেড়ে উঠে বলল, তাড়াতাড়ি উঠে এসো, নৈহাটি ঢুকছে।

ট্রেন বাসে ভিড় থাকলে নামতে তখন বেশ অসুবিধেই হয়। শিশিরদার থেকেও নৈহাটির দূরত্ব জেনে নিয়েছে সায়র, পাশে লোকটার ইনফর্মেশনের সঙ্গে মিলল। ট্রেনে ভিড় এখন পর্যন্ত নেই। লোকটা হঠাৎ উঠলে, নামতে অসুবিধে হবে না।

আগের ভাবনায় ফিরে যায় সায়র। জয়িতা নাগের দোকানির সঙ্গে কোন কথার সূত্রে ভাব জমাবে, মোটামুটি একটা স্ক্রিপ্ট মনে মনে রেডি করে নিয়েছে, চিন্তায় সেগুলোই আর একবার ঝালিয়ে নিতে চায়, কিন্তু মন পালাচ্ছে জলিদার প্রসঙ্গে, লোকটা আর কতদিন জ্বালাবে? রনোকে তবু যাহোক তাহোক বলে ম্যানেজ করে নেবে সায়র। বলবে, আরে আমাদের মতো ভীতু, ভদ্র পরিবারে বড় হওয়া ছেলেদের পক্ষে কি মার্ডারের মতো এক্সট্রিম কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া সম্ভব! ঘটনাটা সদ্য ঘটেছিল, মটকা গরম হয়ে গিয়েছিল, তাই ওসব ভাবছিলাম।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জলিদা অবশ্য এসব সেন্টিমেন্টে কনভিন্সড হবে না। সে ক্রিমিনাল গোত্রের লোক, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষকে নিজের মতোই ভাবে। তার সঙ্গে কনসাল্ট করতে যাওয়ার ফিজ সে নেবেই। সায়র দিয়েও দেবে। কিন্তু একটা ভুল সে করেছে, রনোকে বলা উচিত হয়নি, আমি মেশিন জোগাড় করে ফেলেছি। কাজটা নিজেই করে নেব। জলিদাকে বলে দে।—একটু বেশিই স্মার্টগিরি ফলানো হয়ে গেছে সায়রের। রনো যদি সত্যিই কথাটা বলে দেয় জলিদাকে, সায়র অন্তত দু'জনের চোখে বিপজ্জনক মানুষ হয়ে গেল। রনো, জলিদার অ্যাটেনশন সায়রের ওপর থাকবে। খামোখা বাঁশটা নিতে গেল সায়র। সে পিস্তল, বন্দুক কিছুই জোগাড় করেনি। বুদ্ধিকে তার চেয়েও ধারালো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। জয়িতা নাগকে চিরতরে সরাবে বাবার জীবন থেকে। যে ক-জন সম্পর্কটার ব্যাপারে জানে, ওখানেই শেষ। আর কাউকে জানতে দেবে না সায়র। চ্যাটার্জি বাড়ির তিনতলায় থাকবে শুধু সে, বাবা আর মায়ের স্মৃতি।

—চলে এসো। নৈহাটি ঢুকছে। বলে পাশের লোকটা উঠে পড়ল। ঠিক যেমনটা ভেবেছিল সায়র, স্টেশনে ঢোকার মুখে লোকটা এটা বলবে। ট্রেন একেবারেই স্লো হয়ে গেছে, কো-প্যাসেঞ্জারকে ফলো করে সায়র। লোকটা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ?

—না, কনজিউমার সেলস-এ আছি। বলার পর সায়র আশ্বস্ত হল এই ভেবে, যাক, তাহলে আমাকে সেলসম্যান টাইপের দেখতে লাগছে।

অফারটা বোধহয় একটু বেশিই অ্যাট্রাকটিভ করে ফেলেছে সায়র। জয়িতা নাগের বাড়ির সামনে গ্রসারি শপ-এ পৌঁছে গেছে সে। আলাপ হয়েছে দোকানির সঙ্গে। বছর তিরিশ বয়স হবে। ফিটফাট চেহারা। লোকটা সম্পর্কে জয়িতা নাগের কে হন? এখনও জানা যায়নি। সায়র এখানে নামী বিস্কুট কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছে। শিশিরদার থেকে নেওয়া সেই কোম্পানির লিটারেচার, ব্রোশিওর রেখেছে দোকানির সামনে। বলেছে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় আমাদের কোম্পানি বিস্কিটের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ দিতে চায়। গোটা ডিস্ট্রিক্টে মাত্র দশজনকে দেওয়া হবে। আমরা ডিপোজিট বেসিসে ডিস্ট্রিবিউটর সিলেক্ট করছি না, লোকেশনের ওপর জোর দিচ্ছি। কোম্পানির লোক সার্ভে করে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এই এলাকায় আপনাদের দোকানটা বেছেছে। সামনে হাইরোড, নৈহাটির বাজারটা যেমন ক্যাপচার করতে পারবেন, নদী পেরিয়ে ব্যান্ডেলের মার্কেটে পৌঁছে যাওয়া সহজ। ওদিকের ডিস্ট্রিবিউটর প্রপারলি মার্কেটিং করছে না। আপনি যদি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নিতে চান, ডিপোজিট লাগবে মাত্র পঞ্চাশ হাজার আর গোডাউন স্পেস। দোকানটা তো বাড়ির ফ্রন্টে, পিছনে নিশ্চয়ই গোডাউন করার মতো জায়গা আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। দাঁড়ান, আগে আপনার জন্য চা বলে আসি। তারপর বাকিটা শুনছি। বলে সেই যে লোকটা গেছেন, মিনিট পাঁচেক হল, এখনও ফেরেননি। সায়র বসে আছে কাউন্টারের বাইরে রাখা টুলে। অফারটা দেওয়ার পর লোকটাকে খুব এক্সাইটেড লাগছিল। না লাগারও কিছু নেই, শিশিরদা বলেছিল এ কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নিতে গেলে দু থেকে তিন লাখ টাকা ডিপোজিট লাগে। গোডাউন হতে হবে নতুন, পাঁচশ স্কোয়ার ফুট মতোন স্পেস। সেসব শর্ত না তুলে সায়র অফারটা অনেক আকর্ষণীয় করে তুলেছে। না তুললে যে দোকানির সঙ্গে আলাপ গড়াবে না। লোকটা তো আর জানে না সায়র তাকে স্বপ্নে বিরিয়ানি খাওয়াচ্ছে। সায়র এখানে খুব বিশ্বস্তভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করেছে। কোম্পানির লোগো দেওয়া আই কার্ড দেখিয়েছে প্রথমে। কার্ডটা কম্পিউটারে সায়রই বানিয়েছে। লিটারেচার থেকে লোগোটা স্ক্যান করে সায়র নিজের নাম লিখেছে, অর্কপ্রভ রায়। নীচে ডেজিগনেশন। মোক্ষম সময় দোকানে এসে পড়েছিল সায়র। আর একটু দেরি হলেই বন্ধ হয়ে যেত দোকান। চাঁদপাড়ার মতোন এখানেও দুপুরে দোকানপাট বন্ধ থাকে, কথাটা মাথায় ছিল সায়রের, যাতায়াতে এতটা সময় লেগে যাবে আন্দাজ করতে পারেনি। দোকানি চা আনতে কি বাড়িতে গেলেন? লাঞ্চ সেরে সায়রের জন্য চা নিয়ে ফিরবেন হয়তো। দোকানে স্টক খারাপ নয়, স্পেসও অনেকটা। সায়র আসার পর থেকে কোনও কাস্টমার দেখা যায়নি। সেটাই স্বাভাবিক, লোকে জানে বন্ধ হয়ে গেছে দোকান।

ওই তো, লোকটা দু'হাতে চায়ের ভাঁড় নিয়ে সাবধানে উঠে এলেন দোকানের চাতালে। তোষামোদের হাসিসহ বললেন, পাশের চায়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। দূরের দোকানে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়ে আনলাম।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

লোকটার হাত থেকে ভাঁড় নিতে নিতে সায়র বলল, কেন এত খাটতে গেলেন। না হলেও চলত।

—না না, আমারও একটু খেতে ইচ্ছে করছিল। বলার পর লোকটা দোকানের ভিতরে গেলেন না। সামনে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চুমুক দিলেন।

সায়র দু ঢোঁক চা খেয়ে বলল, বাই দ্য ওয়ে, আপনার নামটা এখনও জানা হল না।

—ভালো নাম অনুপম ঘোষ। এলাকায় সবাই লাল্টু বলেই চেনে।

—তা কী ডিসিশন নিলেন? নেবেন ডিস্ট্রিবিউটরশিপ?

অনুপম ঘোষের মুখের আলো হঠাৎ কমে এল। বলল, ডিসিশন নেওয়ার মালিক আমি নই। দিদি, মানে আমার বড় শালি এই দোকান, বাড়ির হেড। আপনাকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সায়র বুঝতে পারছে জয়িতা নাগের কথা বলছেন অনুপম। একটা তথ্য বেরিয়ে এল, এই পরিবারটা চলে জয়িতা নাগের কথায়। আরও তথ্যর জন্য সায়র বলে, ওঁর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে?

—না। উনি অফিসে। বলে ফাঁকা ভাঁড়টা নর্দমায় ছুঁড়ে দিল অনুপম।

সায়রেরও চা শেষ, দেখাদেখি একই জায়গায় ফেলল ভাঁড়। জিজ্ঞেস করে, কবে, কখন ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?

—রবিবার ছুটি। বাড়ি থাকেন। কথা বলবেন কিনা, সে ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারছি না।

নীচের ঠোঁট উল্টে চিন্তা করার ভান করে সায়র। তারপর বলে, আমরা তো খুব বেশি ওয়েট করতে পারব না। বুঝতেই পারছেন, অ্যাট্রাকটিভ অফার, গরিফার যেকোনও দোকানদার, ডিলার লুফে নেবে। আপনাদের দোকানটা রোডের ওপর বলেই অ্যাপ্রোচ করছি আমরা। ডিসিশন যদি ঝুলিয়ে রাখেন, অ্যাডভান্টেজটা ইগনোর করে অন্য কাউকে দিয়ে দেব অফারটা।

এবার অনুপম ভাবতে লাগলেন। একটু সময় নিয়ে বললেন, ডিস্ট্রিবিউটরশিপটা আমাকে দেওয়া যায় না?

—আপনাকেই তো দিতে এসেছি! অবাক হওয়ার ভান করল সায়র। মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে অনুপমের পলিটিক্সটা।

অনুপম বললেন, ধরতে পারেন আমি এই দোকানে কাজ করি। মালিক

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কে, সে তো আগেই বললাম। আপনাদের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ পেলে এখানকার কাজটা ছেড়ে দেব। গোডাউনের জায়গা আমাদের ও বাড়িতে অ্যারেঞ্জ হয়ে যাবে। ডিপোজিটের টাকাও দিয়ে দিতে পারব।

—আর শোরুম? এরকমটা না হলেও, মোটমুটি একটা ওপেন এরিয়ায় শোরুম তো আমাদের চাই। যেখানে আমাদের হোর্ডিং ব্যানার ডিসপ্লে করতে পারব। অ্যাডটাও তো দরকার।

সায়রের কথায় ফের দমে গেলেন অনুপম। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, দেখুন না চেষ্টা করে এই দোকানটা দেখিয়ে ডিলারশিপটা যদি আমার নামে করানো যায়।

—দেখানোর কিছু নেই। আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে গোডাউন, শোরুম একসঙ্গে যার নামে থাকবে তাকে আমরা ডিলার করে নেব। অবশ্যই দোকান, গোডাউন দুটোই আমাদের পছন্দ হতে হবে।

কাউন্টারে হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে অনির্দিষ্ট চাহনি সমেত দাঁড়িয়ে রইলেন অনুপম। বডি ল্যাঙ্গোয়েজে বিষাদ। স্বগতোক্তির ঢঙে বলতে থাকলেন, আসলে কী জানেন, এতটা বয়স হয়ে গেল, স্বাধীনভাবে কিছুই করতে পারলাম না। শ্বশুরবাড়ির দয়ায় জীবন কাটাতে হচ্ছে। আপনাদের ডিলারশিপটা যদি পেতাম, বউকে নিয়ে ফিরে যেতাম নিজেদের বাড়িতে।

—আপনি তার মানে ফ্যামিলি নিয়ে এখানেই থাকেন? বুঝতে পেরেও কনফার্ম হওয়ার জন্য প্রশ্নটা করল সায়র।

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে মাথা ওপরনীচ করে 'হ্যাঁ' জানালেন অনুপম ঘোষ। এবার ভান নয়, সত্যিই ভাবতে থাকল সায়র। অনুপমের জন্য মোটেই নয়, নিজের জন্য। কথা এখানেই থেমে গেলে চলবে না। তাকে আরও অনেক কিছু জানতে হবে। অনুপমকে উজ্জীবিত করার মতো একটা উপায় পেয়ে গেল সে। বলল, আপনি এক কাজ করুন না, আপনার স্ত্রীর দিদিকে রাজি করিয়ে ডিস্ট্রিবিউটরশিপটা নেওয়ান। আপনি মার্কেটিং-এর দায়িত্ব নিন। দোকান চালানোর জন্য অন্য কাউকে রেখে দেবেন। মার্কেটিং-এ প্রচুর কাজ, একটা লোক রিক্রুট করতেই হবে আপনার দিদিকে। সেই লোকটা না হয় আপনিই হলেন। স্যালারি পাবেন ভালোই। কেননা কোম্পানি সেলের যে টার্গেট দেয়, ফুলফিল হলে, এতেই ডিস্ট্রিবিউটরশিপ কন্টিনিউ থাকে। নয়তো ক্যানসেল হয়ে যাবে এগ্রিমেন্ট। টার্গেট রিচ করতে পারলে প্রফিট প্রচুর।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আপনি তখন ভালো অ্যামাউন্টের স্যালারি ক্লেম করতেই পারেন। যদি না পান আমি অন্য ডিলারের কাছে আপনার চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। কাজটা ততদিনে শিখে নিন।

মুহূর্তে চোখমুখ উজ্জ্বল হল অনুপম ঘোষের। এগিয়ে এসে সায়রের একটা হাত মুঠোর মধ্যে দিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। দারুণ প্ল্যান দিয়েছ। এইজন্যই এত অল্পবয়সে এরকম একটা দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করতে পারছ, আমার মাথায় এসব আইডিয়া খেলতই না। তাই কিছু হয়নি জীবনে।

আলতো করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সায়র। অনুপম আবেগে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে গেছেন। বোঝা যাচ্ছে সায়রের বয়স নিয়ে খটকা অনুপমের লেগেছিল, এখন সেটাই পজেটিভ পয়েন্ট হয়ে গেছে ওঁর কাছে। আর একটু বুস্ট আপ করার জন্য সায়র বলল, ওনলি ওয়ান ইয়ার, আপনি এই লাইনে থাকুন। পায়ের তলায় মাটি পেয়ে যাবেন। ফ্যামিলি নিয়ে আলাদা এসট্যাবলিশমেন্ট চালাতে কোনও প্রবলেম হবে না। শুধু আপনার স্ত্রীর দিদিকে ডিস্ট্রিবিউটরশিপটা নিতে রাজি করিয়ে ফেলুন তাড়াতাড়ি। ফোনে আমাকে জানিয়ে দেবেন কবে, কোন টাইমে আসতে হবে।

—দাঁড়ান, এখনই কথা বলে নিচ্ছি। বলে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করলেন অনুপম। আবার 'আপনি'তে ফিরে গেছেন।

সায়র বলল, এখন থাক না। উনি কাজের মধ্যে আছেন। বাড়ি ফিরলে আপনি গুছিয়ে সব বলবেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে রাখবেন আমার হয়ে।

—না না, আপনি থাকতে থাকতে ফোনটা করি। পরে সবকিছু যদি গুছিয়ে না বলতে পারি, যা সব কোয়েশ্চেন করে না! বলতে বলতে ফোনের সুইচ টিপতে লাগলেন অনুপম। কানে নিয়েছেন ফোন। 'লাল্টু বলছি' দিয়ে কথা শুরু করে চলে গেলেন তফাতে। কী কথা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছে না সায়র। ফোনের ও প্রান্তের প্রতি অতিরিক্ত সমীহ প্রকাশ পাচ্ছে অনুপমের মাথা নাড়ার ভঙ্গিতে।

শর্টেই গোটা ব্যাপারটা বলতে পেরেছেন অনুপম। ফোনটা এমনভাবে হাতে নিয়ে ফিরে আসছেন, বোঝা যাচ্ছে ও প্রান্তের ফোন এখনও চালু আছে। কাছে এসে ফোনসেট বাড়িয়ে ধরে অনুপম বললেন, নিন, কথা বলুন।

বুকটা একটু বুঝি দুরু দুরু করে উঠল সায়রের, জয়িতা নাগের সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

প্রথম কথা হতে যাচ্ছে তার। সায়রের কেমন জানি মনে হচ্ছে, উনি আমাকে বোধহয় দেখতে পাচ্ছেন। ফোন কানে নিয়ে যতটা সম্ভব নর্মাল গলায় সায়র কোম্পানির নাম আর নিজের নকল নামটা বলল। তারপর বলে, আপনি তো অনুপমবাবুর থেকে প্রাইমারি ব্যাপারটা শুনলেন। এবার আপনার সামনাসামনি বসে কথা বলতে চাই। কবে সময় দিতে পারবেন? একটু তাড়াতাড়ি হলে সুবিধে হয়।

—কামিং সানডেতে চলে আসুন। বাড়ি থাকব আমি। বললেন মহিলা। টোনাল কোয়ালিটি দারুণ। একইসঙ্গে অসম্ভব ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে গলায়।

কনফিডেন্স লো হয়ে যাচ্ছে সায়রের। জিজ্ঞেস করে, সানডে কোন সময় এলে আপনার সুবিধে হয়?

উত্তর দিতে সময় নিচ্ছেন মহিলা। ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে ভেসে এল পুরুষকণ্ঠ, কে? ফোন ধরা হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল সায়রের, পরিষ্কার বাবার গলা! দুজনে এখন একসঙ্গে।

ও প্রান্ত থেকে জয়িতা নাগ বললেন, বিকেলের দিকে আসুন। ইন বিটুইন ফোর, ফাইভ।

—ইটস অল রাইট। বলে কোনওমতে লাইন কাটল সায়র। তার অনিচ্ছাতেই ফোন ধরা হাত এখন কাঁপছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পাঁচ

—বিজনেসের ফোন মনে হল। বলল দেবাংশু।

কফির মগ ঠোঁটে তুলে 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়ল জয়িতা।

দেবাংশু বলে, এত লোড নেওয়া বোধহয় তোমার ঠিক হচ্ছে না। বোনের বর তো আছে বিজনেস দেখার জন্য।

কফি শপের কাচের দেওয়াল ভেদ করে জয়িতা তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। বলে ওঠে, লাল্টু যদি কমপিটেন্ট হত, তাহলে তো চিন্তাই ছিল না। ছোটখাটো ব্যাপারে ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতাও ওর নেই। ক-দিন পর বাবা হবে, কোনও দায়িত্ব বোধ তৈরি হল না।

—লালি ক'মাস ক্যারি করছে যেন?

—সাত মাস। বলার পর হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, এইভাবে জয়িতা দেবাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, লোড নেওয়া ঠিক হচ্ছে না কেন বলছ? এই চাপ তো আমি সদ্য নিইনি। অনেকদিন ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি। এখন আমার পক্ষে চাপটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, কেন মনে হল তোমার?

অপ্রস্তুত বোধ করে দেবাংশু, কাজের চাপের প্রসঙ্গটা খুব একটা ভাবনাচিন্তা করে বলেনি। মনে হচ্ছিল জয়িতার পরিশ্রম যেন বেড়েই চলেছে, তাই বলেছে কথাটা।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

নামানো মাথা তুলতে গিয়ে দেবাংশু দেখে, উত্তরের জন্য দিদিমণির মতো তার দিকে চেয়েই রয়েছে জয়িতা। ফের দৃষ্টি নামাতে যাবে, জয়িতা বলে উঠল, আমাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য তোমার ওপর রাগ দেখিয়েছি বলে? তোমার মনে হয়েছে কাজের চাপে মেজাজ বশে থাকছে না আমার।

—ধরো তাই।

—না, ধরব না। লজিকটা আমি তৈরি করলাম। এটা আমার গেজ ওয়ার্ক। তুমি এগজ্যাক্টলি কী ভেবে কথাটা বললে, সেটা বলো।—একটু থেমে ফের জয়িতা বলল, তোমার কী মনে হচ্ছে, আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে, বুড়ি হয়ে যাচ্ছি, তাই এত কাজের চাপ নেওয়া ঠিক নয়?

দেবাংশু পড়ল আরও গভীর গাড্ডায়। স্বপক্ষ সামাল দিতে বলে উঠল, আমি এত ভেবে কথাটা বলিনি। দ্যাট ডে ইয়োর বিহেভিয়ার ডিড নট সুট ইউ। তোমাকে কোনওদিন ওই অ্যাপ্রোচে কথা বলতে দেখিনি। সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যারিড এ ওভার বার্ডেন অন ইয়োর শোলডার। স্ট্রেস পড়ছে তোমার?

—স্ট্রেস কি শুধু কাজেরই হয়, অন্য কিছুর হতে পারে না? কথাটা বলে নিয়ে ফের কাচের দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরাল জয়িতা। অসন্তোষের মধ্যে আদৌ কোনও অভিমান আছে কিনা ধরতে পারে না দেবাংশু। ইদানীং মাথাটা তার ভালো কাজ করছে না। জয়িতার স্ট্রেস নিয়ে যে অনুমানটা সে করছে, মুখ ফুটে বলা যাবে না। আন্দাজটা যদি মিলে যায়, মানে জয়িতার বিয়ের ঠিক হয়েছে তাই দেবাংশুকে এড়াতে চাইছে। খুব সমস্যায় পড়ে যাবে দেবাংশু। জয়িতা হয়তো চাইছে মনের কথা বলে হালকা হতে, কথার মাধ্যমে ইঙ্গিত দিচ্ছে অন্যত্র বিয়ের ব্যাপারটা। দেবাংশু সেটা কিছুতেই শুনতে চায় না। জয়িতার সঙ্গ এখন তার কাছে ভীষণ জরুরি। এই যেমন সায়রের পালটে যাওয়া আচরণের কী সুন্দর ব্যাখ্যা দিল একটু আগে। অনেকটাই নিশ্চিন্তবোধ করছে দেবাংশু। এখন মনে হচ্ছে ছেলেকে নিয়ে এতটা ভাবার কিছু নেই।

জয়িতার সেই ব্যবহারের পর দেবাংশু আর যোগাযোগ করতে সাহস পায়নি। জয়িতাও কোনও খোঁজ নেয়নি। অথচ দুজনের অফিসের দূরত্ব পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। সায়রের ডিসট্র্যাক্টেড অ্যাটিচিউডের কোনও বদল হচ্ছে না দেখে, পরামর্শের জন্য জয়িতাকে আজ এসএমএস করেছিল দেবাংশু, ছুটির পর কি দেখা করা যাবে?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

উত্তর এল, না। টিফিন আওয়ারে রায় কাফেতে আসতে পারি।

'তাই সই,' একটু মজা মিশিয়ে এস.এম.এস. দিয়েছিল দেবাংশু। যদিও মজার মুড তার নেই। জয়িতার সঙ্গে সম্পর্কের কাঠিন্য কাটিয়ে তোলার জন্যই ওইভাবে লিখেছিল। দুটো বাজার আগেই রায় কাফেতে চলে এসেছে দেবাংশু। দুজনের অফিসের মাঝখানে কাফেটা। জয়িতা এল খানিক পরে। থমথমে মুখ। মজার এমএমএস বরফ গলাতে পারেনি। কেন ছুটির পর দেখা করতে পারবে না, এখনও অবধি জিজ্ঞেস করে উঠতে পারেনি দেবাংশু। চেয়ার টেনে বসে জয়িতা গম্ভীরভাবে বলেছিল, বলো, কী বলবে?

কতটা সময় পাবে না পাবে, এই অনিশ্চয়তায় দেবাংশু আর ভূমিকায় যায়নি। সায়রের প্রসঙ্গ প্রথমেই এনে ফেলেছিল। বাবাকে এড়িয়ে যাওয়া, খারাপ বিহেভ করা, মদ খেয়ে বেহেড হয়ে বাড়ি ঢোকা। সর্বোপরি হিমিকাকে মিথ্যে বলে অন্ধকারে রাখা। এসবের কারণ কী? সমস্ত বিবরণ মন দিয়ে শুনে জয়িতা বলল, এত চিন্তা করার মতো কিছু হয়নি। অ্যাডোলেসেন্সে মুড ফ্ল্যাকচুয়েট কমন ব্যাপার।

দেবাংশু বলেছিল, অ্যাডোলেসেন্স তো অনেক আগেই শুরু হয়েছে ওর। এরকম কখনও দেখিনি।

—নিরাপত্তার যে ঘেরাটোপে আগে সায়র বসবাস করত লোপা বউদি চলে যাওয়াতে বলয়ে অনেকটাই শূন্যতা তৈরি হয়েছে, মেন্টাল স্টেবিলিটি খানিক ডিস্টর্টেড হয়েছে ওর। সময় যেতে দাও। ও যতই খারাপ ব্যবহার করুক, তুমি নর্মাল বিহেভ করে যাও ওর সঙ্গে। দেখবে সায়র নিজেকে নিজেই সামলে নিয়েছে। মায়ের অভাবে ওর যেহেতু মন ভালো নেই, চাইছে তুমিও খারাপ থাকো। এটা তোমার প্রতি নির্ভরতা এবং ভালোবাসার আর এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ।

প্রায় মেজদার কথাই বলল জয়িতা। কিন্তু কত গুছিয়ে, র‍্যাশন্যালি। মেজদার বক্তব্যে যুক্তিকে আড়াল করে রাখে ইমাজিনেশন। বলেছে, বাড়িতে দেবাংশুর পোর্শানে লোপার শোক বাসা বেঁধে রয়েছে। দেবাংশুকে ছেড়ে সেই শোক এখন ঘিরে ধরেছে সায়রকে। এর থেকে রেহাই পেতে গেলে লোপার ব্যবহার্য সমস্ত জিনিস ঘর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। লোপার ছবিগুলোও সরিয়ে ফেলার কথা বলেছিল কিনা, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না দেবাংশুর। এটা কোনও পদ্ধতি হতে পারে না। লোপার সব জিনিস সরিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দিলে আরও বেশি ফাঁকা লাগবে, আরও প্রকট হবে ওর না থাকাটা। জিনিসগুলো সামনে রেখেই বেরিয়ে আসতে হবে শোক থেকে। একমাত্র সময় সাহায্য করবে এ ব্যাপারে।

—কী, আমার স্ট্রেসের আর কী কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয়? কাচের দেওয়াল থেকে মুখ ফিরিয়ে আগের প্রশ্নটাই এবার সরাসরি করল জয়িতা। তারপর মগ তুলে ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক মারল।

দেবাংশু কিছুতেই নিজের অনুমানটা বলবে না। চুপ করে থাকল। জয়িতা ফের বলে ওঠে, বুড়ি হয়ে যাচ্ছি বলে প্রেশার নিতে পারছি না, এটা কি মানছ?

—না। বুড়িটাও মানছি না। বুড়ি হয়ে যাচ্ছি আবার কী কথা! তুমি বত্রিশ। আমার থেকে পনেরো বছরের ছোট। আমার কি তাহলে প্রস্থানের সময় হয়ে গেল? হালকা মজা করার চেষ্টা করল দেবাংশু।

মেজাজের কোনও রদবদল হল না জয়িতার। সিরিয়াস এক্সপ্রেশনেই জিজ্ঞেস করল, কিছু তো একটা ভেবে লোড পড়ার কথাটা বলেছ, সেটা যদি বয়স না হয়, আর কী কারণে আমি মেজাজ হারাচ্ছি?

কোণঠাসা করে ফেলেছে জয়িতা, অনুমানটা বলিয়ে ছাড়বে। বলতে যখন হবেই, যতটা সম্ভব লঘুভাবে বলার চেষ্টা চালাল দেবাংশু, আসলে আমার মনে হচ্ছে তোমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে বাড়িতে। এইসময় আমার গিয়ে পড়ায় বাড়ির লোকের সামনে তুমি খুবই বিব্রত বোধ করছিলে। আমার মনে হওয়া অবশ্য ভুল হতেই পারে, তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই আশঙ্কাটাতে ভুগি আমি, এই বুঝি তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল।

—বিয়ে ঠিক হলে তোমার কী অসুবিধে?

—সংসার ছেড়ে তখন তো আর এত ঘনঘন ইচ্ছেমতো দেখা করতে পারবে না। ইচ্ছেটাও হয়তো মরে যাবে নতুন সংসার পেয়ে।

—তার মানে তুমি চাও সারাজীবন আমি কুমারী হয়েই কাটাই। আমার নিজের কোনও সংসার যেন না হয়। বেশ মজা, যখন তোমার মনখারাপ হবে ডেকে পাঠাবে। তোমাকে ভালোবেসে আমি না হয় বিয়ের কথাটা ভুলে থাকলাম, আমার মা, বাড়ির অন্যসব লোকেরা, পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন, এদের কথা ভেবে দেখেছ কখনও? কত হতাশা, প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় আমাকে, বুঝতে পারো না?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মনটা ভারী হয়ে এল দেবাংশুর। বলল, পারি। তোমাকে আগেও বলেছি আমার শুভবুদ্ধি, বিবেকবোধ চায় তোমার নিজের সংসার হোক, সুখে ঘরকন্না করো তুমি। আমাকে ভুলতে তোমার যেন কষ্ট না হয়। কিন্তু আমার অবুঝ কাঙাল মন চায় না তোমার বিয়ে হোক। অন্য কোনও পুরুষের বাহুলগ্না হিসেবে তোমাকে আমি কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমার তো সে-অধিকার নেই যে, বলব বিয়ে কোরো না তুমি। কীসের জোরে বলব? বিয়ের সাবস্টিটিউট আমি কী দিতে পারি তোমাকে? তুমি যদি বিয়ে কর, কিছু বলারই নেই আমার। কিছু করারও নেই।

টানা কথা বলে দম ছাড়ার কথা দেবাংশুর। শ্বাস ছাড়ল জয়িতা। হতাশ শ্বাস। দেবাংশু বাড়ি পৌঁছে যাওয়াতে কেন রেগে গিয়েছিল, তা জয়িতার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির জটিল ব্যাপার। দেবাংশু কেন, যেকোনও কারোর পক্ষেই বিষয়টা অনুভব করা মুশকিল। কিন্তু এতক্ষণ যে কথাগুলো জয়িতা বলল সেটা তো একটিই উক্তি শোনার জন্য। এটুকু বোঝার মতন মানসিক অবস্থা এখন নেই দেবাংশুর। বেচারার ওপর রাগ, অভিমান করা বৃথা।

—সত্যিই কি বিয়ের কিছু ঠিক হয়েছে? আকুল গলায় জানতে চাইল দেবাংশু।

জয়িতা ভালো করে একবার দেবাংশুর মুখের দিকে তাকাল। দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে 'না' জানাল। দেবাংশু বলল, তা হলে। হঠাৎ সেদিন খেপে গেলে কেন?

—জানি না। বিশেষ কারণ ছাড়াই ইদানীং মেজাজ বড় চড়ে যাচ্ছে। তুমি হয়তো ঠিকই বলছ, কাজের প্রেশারটা বেশি হয়ে যাচ্ছে আমার পক্ষে।

—কোথাও বেড়াতে গেলে হয় না? একটু রিলিফ হত। জয়িতা অবাক হয়ে তাকায় দেবাংশুর দিকে। বলে, বেড়াতে! কার সঙ্গে?

একটু সময় নিয়ে দেবাংশু বলল, আমার সঙ্গে। আমারও কোথাও একটু ঘুরে আসা প্রয়োজন। একইরকম পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠছি। মেজদাও সেদিন বলল, সায়রকে নিয়ে কোথাও দু'চারদিনের জন্য ঘুরে আয়। সায়রকে বললাম, রাজি হল না।

চোখ সরু করে কথাগুলো শুনল জয়িতা। তারপর বলল, আমার সঙ্গে যাবে, বলতে পারবে সায়রকে?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—না। এটা হজম করার মতন মনের অবস্থা এখন ওর নয়। আরও কিছুটা সময় গেলে আশাকরি বলা যাবে।

—লোপা বউদি থাকতে কখনও তো দু'চারদিনের জন্যে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলনি! বউকে কী জবাব দেবে, সেই ভেবে তোলনি কথাটা?

—জবাবের ব্যাপারটা তো আছেই। তাছাড়া এরকম পরিস্থিতি তো কখনও আসেনি, যখন তোমার আমার দু'জনেরই কোথাও একটু ঘুরে আসা দরকার। যদি যেতেই হয় দুজনকে, একটা জায়গাতেই যাই।

ঘাড় কাত করে কফির মগ নাড়াচাড়া করতে করতে সেইদিকে তাকিয়ে জয়িতা বলতে থাকল, সেইরকম বেড়ানো তো, নাম ভাঁড়িয়ে সিঁথিতে ধ্যাবড়া করে সিঁদুর দিয়ে হোটেলে গিয়ে ওঠা।

কথাটা বিঁধল দেবাংশুর গায়ে। উত্তর দিতে একটু সময় নিল। বলল, আজকাল বোধহয় এত আড়াল লাগে না। দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। তবে আমরা এক হোটেলে উঠলেও আলাদা রুমে থাকতেই পারি। এমনকী ইচ্ছে করলে দু'জন দুটো ভিন্ন হোটেলেও ওঠা যেতে পারে।

—বাড়িতে আমি কী বলে বেরোব? কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি? এ তো একবেলার ব্যাপার নয়।

দেবাংশু চুপ করে থাকল। ওয়েটার এসে মগ দুটো ট্রেতে তুলে নিয়ে জানতে চাইল, আর কিছু দেব আপনাদের?

দু'জনের থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে ফিরে গেল ওয়েটার। ফের জয়িতাই বলে ওঠে, বাড়িতে মিথ্যে বলতে বলছ তো? মিথ্যে যদি বলতেই হয়, মিথ্যে সিঁদুর পরতে অসুবিধে কোথায়!

উপর্যুপরি বাক্যবাণে বিধ্বস্ত দেবাংশু আত্মসমর্পণের সুরে বলে, সরি, প্রোগ্রামটার কথা বলা উচিত হয়নি আমার। বলার আগে খতিয়ে ভাবার দরকার ছিল। কিন্তু আমি যে কোথায় যাই, কার কাছে? সায়র বলছিল কোনও রিলেটিভের বাড়ি যেতে। তারা ডাকেও বারবার। ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লে আবার সেই লোপার কথা উঠবে। যেসব ছোটখাটো ইন্সিডেন্ট, যা হয়তো আমি জনি না, আমার সামনে ঘটেনি অথবা ভুলে গেছি। ওরা মনে করিয়ে দেবে সব।

কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল জয়িতা, টিফিন আওয়ার্স শেষ হতে এখনও দশ মিনিট বাকি। আরও আধঘণ্টা দেরিতে অফিসে ঢুকলে কেউ কিছু বলবে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

না। হাতে যে কোনও আর্জেন্ট কাজ পড়ে আছে, তাও নয়। তবু এখানে বসে থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে সব কথা বলা হয়ে গেছে, ছোঁড়া হয়ে গেছে সব তির। পিঠের একপাশ হালকা লাগছে, যেখানে ঝোলানো থাকে তির রাখার ঝুড়ি। এরপরও প্রার্থিত উত্তরের জন্য বসে থাকা হ্যাংলামি। জয়িতা কী শুনতে চাইছে, বুঝেও কি এড়িয়ে গেল দেবাংশু? জীবনসঙ্গীর যোগ্যই মনে করে না জয়িতাকে। এক দু'ঘণ্টার আড্ডা, ঠিক আছে। চলে যায়।

ফের একবার অযথাই ঘড়ি দেখে জয়িতা। দেবাংশু বলল, তুমি কি উঠবে?

—হ্যাঁ। কিছু কাজ ছেড়ে এসেছি। উঠতে হবে। মিথ্যেটা বলে নিয়ে জয়িতা বলল, একা বেড়াতে গিয়েও তুমি লোপা বউদিকে ভুলে থাকতে পারবে না। বরং আরও বেশি বেশি করে মনে পড়বে। তার চেয়ে কোনও আত্মীয়বন্ধুর বাড়িতেই যাও। মাঝে মাঝে লোপা বউদির কথা উঠলেও, অন্য গল্প আড্ডাও হবে। ওদের নর্মাল লাইফে গিয়ে পড়লে খানিকটা রিফ্রেশ ফিল করবে তুমি।

কথা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জয়িতা। এবার ফিরে যাবে। একটা প্রশ্ন করব করব ভেবেও এতক্ষণ করে উঠতে পারেনি দেবাংশু। এখন জিজ্ঞেস করেই ফেলে, শুধু কি আজই ছুটির পর দেখা করার অসুবিধে ছিল? কোনও কাজ আছে তোমার? না কি...

—না কি, কী? ভ্রূ জোড়া করে রাগত মুখে জানতে চায় জয়িতা।

—নাকি আর কোনওদিনই দেখা করবে না?

—তা হলে আজ দেখা করলাম কেন?

—এ তো প্রায় অফিশিয়াল মিটিং। বলে মাথা নামিয়ে নিয়েছে দেবাংশু। মুখ যখন তুলল, দেখে, কাচের ওপারে রাস্তা পার হচ্ছে জয়িতা। বেগুনি, হলুদ কম্বিনেশনে দারুণ একটা শাড়ি পরে এসেছিল আজ। রোদের মধ্যে খুব ব্রাইট লাগছে শাড়িটা। কাফেতে যখন ঢুকেছিল, দেবাংশু এভাবে লক্ষ করেনি। শাড়ি জেনারেলি কমই পরে জয়িতা। আজ হঠাৎ কেন পরল? বিয়ের আগে মেয়েরা ঘনঘন শাড়ি ট্রাই করে। অভ্যস্ত করে নেয় নিজেকে। এখনও নব্বই শতাংশ বাঙালি বাড়িতে বউদের শাড়ি পরার চল। বিয়ে ফাইনাল হয়ে গেছে জয়িতার। মুখ ফুটে বলতে পারল না। দেবাংশুর মনের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

অবস্থা জানে, বোঝে এসময় দেবাংশুর পাশ থেকে সরে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু ও নিরুপায়, দেবাংশুর কথা ভেবে তো বিয়ের সম্বন্ধ আসবে না। ভালো পাত্র পেয়েছে নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে। বয়সও হয়ে যাচ্ছে জয়িতার। এরপর সত্যিই অনেক দেরি হয়ে যাবে।

ওয়েটার যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, দেবাংশু বলল, আমাকে আর একটা দাও।

—ইয়েস স্যার। বলে সরে গেল ওয়েটার।

কাচের বাইরে তাকিয়ে থাকে দেবাংশু। বাস, অন্যান্য গাড়ি, পথচারী চলাচল করছে। অনেক আগেই সামনের দৃশ্যপট থেকে মুছে গেছে জয়িতা। আর কোনওদিনও হয়তো আসবে না। এত কথা না বলে আজ ওকে চোখ ভরে দেখে নিলে হত। সত্যিই বড় সুন্দর দেখতে জয়িতা! তা ছাড়াও কী একটা যেন আছে! কীরকম যেন চেনা চেনা ভাব। নিজের আয়ুর থেকেও বেশিদিনের যেন পরিচয়। একেই হয়তো প্রেমিকরা বলে মানসপ্রতিমা।

ওয়েটার কফির মগ নামিয়ে দিয়ে গেল টেবিলে। সঙ্গে বিল পাউচ। তাড়া মারছে। জানে এটাই শেষ অর্ডার, তাই বিল। সঙ্গিনী উঠে গেছে, দেবাংশু বসে থাকলে টেবিল ঘিরে ফাঁকা তিনটে চেয়ারে কেউ বসবে না। তাড়াতাড়ি জায়গা ছাড়তে হবে দেবাংশুকে। ঠিক যেমন প্রতিশ্রুতিবিহীন সম্পর্কে আর আটকে রাখা যাবে না জয়িতাকে। কথার মারপ্যাঁচে জয়িতা আজ প্রতিশ্রুতি চাইছিল। অন্যত্র বিয়ের আগে শেষ চান্স দিচ্ছিল দেবাংশুকে। কোনওক্রমে প্রশ্নবাণ এড়িয়ে সম্পর্কের শর্ত একই রেখেছে দেবাংশু। মিথ্যে অঙ্গীকার করে কী লাভ! জয়িতাকে ঠকানো হত। লোপাকেও একপ্রকার ঠকিয়েছে সে। ওর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখেনি। নেয়নি মনের খবর। দেবাংশু প্রায় নিশ্চিত জয়িতার সঙ্গে তার সম্পর্কটা জানতে পেরেছিল লোপা। বহিরঙ্গে ওকে যতটা খোলামেলা স্বভাবের মনে হত, আসলে তা ছিল না। মনের গভীরে নিজস্ব সত্তাটিকে লুকিয়ে রাখত। ওর সবচেয়ে কাছে থাকার কারণে দেবাংশু বেশ কয়েকবার সত্তাটির অস্তিত্ব টের পেয়েছে। যেমন একবার পুজোর বাজারে দেবাংশু দুই দাদা আর ভাইয়ের জন্য অফিসের কাছে খাদির বড় শোরুম থেকে পাঞ্জাবি কিনেছে। নিজের জন্যও নিয়েছে একটা। বাড়ির মেয়ে এবং বাচ্চাদের কেনাকাটা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

করবে পরে, লোপার সঙ্গে গিয়ে। লোপা পাঞ্জাবি চারটে দেখে খুব ভালো হয়েছে বলার পরও কিন্তু কিন্তু ভাব করে বলেছিল, মেজদারটা একটু যেন কমা কমা লাগছে।

একদম ঠিক ধরেছিল লোপা। চারটে চাররকম নিতে গিয়ে মেজদার পাঞ্জাবিটা সামান্য কম দামের হয়ে গিয়েছিল। লোপাকে সে কথা বলে দেবাংশু বলেছিল, ছেড়ে দাও, কে আবার পালটাতে যাবে। পুজোর সিজনে ভীষণ ভিড় দোকানে। মেজদার তো জামাকাপড় নিয়ে অত বাছবিচার নেই। যাহোক হলেই চলে যায়। এই যে পুজো উপলক্ষে দেওয়া হচ্ছে, পুজোর একটা দিনেও গায়ে তুলবে না। পুরনো জামা পরেই ঘুরে বেড়াবে।

দেবাংশুর কথা মিথ্যে প্রমাণ করে মেজদাকে অষ্টমীর দিন দারুণ একটা পাঞ্জাবি পরে ঘুরতে দেখা গেল। নিজের একটা ওরকম হলে হয় টাইপের মন টানার মতো পাঞ্জাবি। মেজদাকে সামনে দাঁড় করিয়ে পাঞ্জাবিতে চোখ বুলিয়ে দেবাংশু বলেছিল, পাঞ্জাবিটা তো খুব ভালো হয়েছে। কোথা থেকে কিনলে, নাকি কেউ দিল?

—যাঃ কলা। নিজে কিনে আনলি, নিজেই ভুলে গেলি! স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিল মেজদা।

দেবাংশু অবাক হয়ে বলেছিল, আমি!

—লোপা তো তাই বলল। চার ভাইয়ের পাঞ্জাবি তুই নাকি পছন্দ করে কিনে এনেছিস। আমার তো এত পছন্দ হয়েছে, চারদিন এটা পরেই কাটিয়ে দেব। বলে রাজকীয় ভঙ্গিতে পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল মেজদা।

ততক্ষণে যা বোঝার বুঝে গেছে দেবাংশু। লোপাকে গিয়ে বলেছিল। পাঞ্জাবিটা তো পালটাওনি দোকান থেকে, বিল আমার কাছে আছে। তোমার যদি অতই অপছন্দ হয়ে থাকে, বলতে, পালটে আনতাম। আবার কিনতে গেলে কেন?

—পালটানোর কী দরকার, মেজদার নাম করে এনেছ, মেজদার জন্মদিনে দেব। পুজোয় তোমাদের তিনজনের পাশে মেজদারটা মানাত না, তাই কিনে দিয়েছি। দাম কিছু বেশি নয়, তোমাদের তিনজনের মতোই।

এরকমই ছিল লোপা। কাউকে আঘাত না করে, জেদ না করে চেষ্টা করত নিজের ইচ্ছেটা বহাল রাখতে। এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা আছে। সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটিয়েছিল বাপের বাড়ির সম্পত্তি নিয়ে। শ্বশুরমশাই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

একদিন অফিসে ফোন করে ডেকে পাঠালেন চন্দননগরে। বললেন, লোপাকে না জানিয়ে আসতে।

একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে দেবাংশু গিয়েছিল শ্বশুরমশাইয়ের ফ্ল্যাটে। শ্বশুরবাড়ি কোনওদিনই সে একা হ্যান্ডল করে না। লোপা সঙ্গে থাকে। আজ কী এমন হল, যে শ্বশুরমশাই আলাদা করে তাকে ডাকছেন? শাশুড়ি মা অথবা শ্বশুরমশাইয়ের নিজেরই মারাত্মক কোনও রোগ ধরা পড়েছে কি? মেয়েকে খবরটা জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। বুঝতে পারছেন না লোপা কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে, কতটা শক পাবে। তাই জামাইকে আলাদা করে ডেকে নিলেন। মৃত্যু, অসুস্থতা এ ধরনের খবরের ভায়া হওয়ার যোগ্য দেবাংশু একেবারেই নয়। কারোর দুর্ভাগ্যের খবর তাকে কীভাবে জানাতে হয় দেবাংশু জানে না। দু'একটা ঘটনায় বিরাট গোলমাল পাকিয়েছে। ওটা একটা আলাদা আর্ট।

কাঁপা পায়ে শ্বশুরমশাইয়ের দোতলার ফ্ল্যাটের সিঁড়ি ভাঙছিল দেবাংশু। সদ্য বিরাট বাড়ি জমি বিক্রি করে বুড়োবুড়ি উঠে এসেছেন ফ্ল্যাটে। ছেলে পরিবার নিয়ে থাকে আমেরিকায় বোস্টনে, মেয়ে লোপার বিয়ে হওয়ার পর ঝাড়া হাত-পা। অত বড় বাড়ি রেখে হবেটা কী!

শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রোগ-ব্যাধির দুশ্চিন্তা কাটল দেবাংশুর। জটিলতা অন্য জায়গায়। শ্বশুরমশাই চান সম্পত্তি বিক্রির টাকা দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিতে। কয়েকদিন আগে লোপাকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি নিজের ইচ্ছের কথা বলেন। লোপা তখনই জানিয়ে দেয় বাপের বাড়ির সম্পত্তি সে নেবে না। তাতে নাকি দেবাংশুকে ছোট করা হবে। স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। দেবাংশু সেটা যথাযথভাবে পালন করছে। বিয়ের পরের দিন বউয়ের সাজে সে যখন দেবাংশুর সঙ্গে বাপের বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছিল, পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের আঁচলে সেই যে কনকাঞ্জলি দিয়ে বাবা-মায়ের ঋণ শোধ করে গেছে, নতুন করে আর কোনও টাকা-পয়সা সে নেবে না। বিয়ের ওই আচার সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। নিজের লাভের জন্য অন্যসব আচার-প্রথা মানব, কনকাঞ্জলি ভুলে যাব, এটা লোপা উচিত বলে মনে করে না। —গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, মেয়েটা চিরকালই ইমোশনাল ফুল। নিজের সন্তান বলে মনেই হয় না। তোমার শাশুড়িমা, আমি কেউই এতটা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ইমোশনাল নই। ও যে কার থেকে এই স্বভাবটা পেল। তুমি ওকে বোঝাও।

—আমি এ ব্যাপারে ওকে কিছু বলতে পারব না। সিদ্ধান্তটা লোপাকেই নিতে হবে। প্রাপ্যটা যেহেতু সম্পূর্ণ ওর। আমার দিক থেকে কিছু বলা মানে ইনসিস্ট করা। বলেছিল দেবাংশু।

শ্বশুরমশাই বললেন, স্ত্রীর ভুল শুধরে দেওয়াও তো তোমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই ভুলটা শোধরালে ওর চোখে ছোট হয়ে যাবে বলে, আর্থিকভাবে দুর্বল করে রাখবে ওকে! সেখানে তোমার ভাবমূর্তিটা বড়? এ-ও তো ওর প্রতি এক ধরনের বঞ্চনা। একটু ভেবে দেখলে, প্রকারান্তরে তুমিও ওকে ঠকাচ্ছ। আমার বোকা মেয়েটা বসে বসে ঠকছে।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট শ্বশুমশাইয়ের যুক্তিতে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল দেবাংশু। সেই প্রথম বুঝেছিল আত্মমর্যাদা জিনিসটাও খুব একটা মহান ব্যাপার নয়, ক্ষেত্রবিশেষে আত্মমর্যাদা অন্যকে ছোটও করে। শ্বশুরমশাই আরও বলেছিলেন, আমি লোপাকে বললাম, তুই টাকাগুলো নিয়ে কোথাও দান করে দে। এ ব্যাপারে তো আমার কিছু বলার নেই। লোপা বলল, তোমার টাকা দান করে আমি নাম কিনতে যাব কেন? আমার পোর্শান তুমি দান করে দাও। আমি চ্যারিটি করব আমার আর দেবাংশুর ক্ষমতায়।

শ্বশুরমশাই যখন কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন, সোফায় বসে শাশুড়িমা আঁচল দিয়ে মুছে যাচ্ছিলেন নিজের চোখের জল। শ্বশুরমশাই ওঁকে খেয়াল করালেন, কি গো, ছেলেটা অফিস থেকে সোজা চলে এসেছে, ওকে কিছু খেতে-টেতে দেবে না।

শশব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়েছিলেন শাশুড়িমা। তারপর শ্বশুরমশাই ভালো করে বোঝাতে লাগলেন দেবাংশুকে। বলেছিলেন, ইমোশান তখনই ভালো, যা কারোর না কারোর উপকারে লাগছে। দেখো, আমার ছেলের তো টাকার দরকার নেই, যথেষ্টর চেয়ে অনেক বেশি আছে। ওর ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার ভার ওদেশের সরকারের ওপর। যেহেতু দুজনেই জন্মসূত্রে ওখানকার নাগরিক। তারপরেও তো সৌম্য বলছে না, বাবা, সম্পত্তির টাকা আমি নেব না। টাকার মূল্য সে বোঝে। কখন কীভাবে কাজে আসবে, কেউ জানে না। সৌম্য যখন পাবে, লোপা বাদ যাবে কেন? লজিকালি দেখলে টাকাটা লোপার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সায়র বড় হয়ে কী পড়বে, কী

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

করবে, কতটা টাকা লাগবে এখনই জানা যাচ্ছে না। আমাদের দেশের সরকার স্টুডেন্টদের কেরিয়ার গড়ার ব্যয়ভার নিতে অক্ষম। টাকাটা সায়রের জীবন গড়তে কাজে লাগবে। এছাড়াও টাকার সংস্থান থাকা তো ভালো, আত্মীয় পরিজন কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা যাবে।

কথার এই পর্যায়ে শাশুড়িমা চা খাবারদাবার নিয়ে এসেছিলেন। বাকি কথার ভার নিয়েছিলেন শাশুড়িমা। বলেছিলেন, তুমি লোপাকে গিয়ে বোঝাও। তোমাকে ছোট করা হবে ভেবেই টাকাটা ও নিচ্ছে না। কনকাঞ্জলি-ফানজলি ওসব ছুতো। আচারবিচার মেনে যেন উলটে দিচ্ছে! ও তো প্রথমে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করবে না বলে দিয়েছিল। বলেছিল, যাকে অতবার দেখেছি, তার সঙ্গে আবার শুভদৃষ্টি কী! ওসব ঢঙ তার নাকি একেবারে পছন্দ হয় না। রেজিস্ট্রি বিয়ে করবে বলেছিল। আত্মীয়স্বজন কে কী বলবে, এই দোহাই তুলে ওকে নিরস্ত করা হয়। আমাদের দুই সন্তান নিজেদের জীবনে আজ সুখী। সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে আমরাও নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমাদের অবর্তমানে এই ফ্ল্যাটটাও দু'জনে পাবে।

লোপাকে কনভিন্স করানোর বিরাট দায়িত্ব নিয়ে চাঁদপাড়ার বাড়িতে ঢুকেছিল দেবাংশু। কিন্তু সেই কৌশল তার জানা নেই। তাই সরাসরি কথা পেড়েছিল লোপার সামনে। বলেছিল, সম্পত্তি নিয়ে এত কথা বলে এলে বাবা, মায়ের সঙ্গে, আমাকে তো কিছু জানাওনি! বাবা আজ আমায় ডেকে তোমার মতামত জানালেন।

সোৎসাহে লোপা বলেছিল, আমার ডিসিশন ঠিক আছে কি না বলো? কী ভেবেছে আমাদের, গরিব? বাপের বাড়ির সম্পত্তির জন্য হাঁ করে বসে আছি।

চন্দননগর থেকে ট্রেনে চাঁদপাড়ায় আসতে আসতে দেবাংশু সম্পত্তি অ্যাকসেপ্ট করার ব্যাপারে একটাই যুক্তি ভাবতে পেরেছিল। সেটাই বলে লোপাকে, দেখো, বাবার টাকাটা ন্যায়ত একইসঙ্গে আইনত তোমার। এদিকে সায়র শুধু আমার সন্তান নয়, তোমারও। তুমি যদি টাকাটা না নাও, মায়ের দিক থেকে সে বঞ্চিত হবে। টাকা তুমি নাও, তোমার আর সায়রের নামে ফিক্স করা থাকবে ব্যাঙ্কে। আমি এর মধ্যে জড়িত থাকছি না। তাতে তোমার বরের সম্মান রক্ষাও হবে।

তখনই সেই কথাটা বলেছিল লোপা, কী ব্যাপার গো, তুমি কি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আমাদের রেখে পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছ? টাকাকড়ি গুছিয়ে দিচ্ছ সব।

দেবাংশুর যুক্তি মেনে নিজের অংশ বাবার থেকে নিয়েছিল লোপা। 'পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান' কথাটা বলেছিল নেহাতই মজা করে। জয়িতার সঙ্গে তখনও আলাপ হয়নি দেবাংশুর। কিন্তু যে মেয়ে স্বামীর অগোচরে এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বাপের বাড়ির সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে দু'বার ভাবে না, আলোচনাও করে না দেবাংশুর সঙ্গে, তার সত্তাটি কত সাবলম্বী, তা নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। দেবাংশুর মন থেকে তাই কিছুতেই এই সন্দেহটা যায় না, যে জয়িতার ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল লোপা। কোনও অভিযোগ জানায়নি দেবাংশুকে। তাতে নিজের গভীরে থাকা সত্তাটিকে অপমান করা হত। কষ্টটা মুখ বুজে সহ্য করেছিল। দেবাংশুর এই সন্দেহটা লোপা মারা যাওয়ার পর যতটা সুতীক্ষ্ণ ছিল, সময়ে যেতে ধীরে ধীরে ভোঁতাও হয়ে আসছিল। দুদিন আগে নাকি তিনদিন, অফিসের সুতপনদা একটা কমেন্ট করলেন, সন্দেহটা ফের মাথা চাড়া দিয়েছে। ঠিক সেই কারণেই জয়িতা আজ যে প্রতিশ্রুতি শুনতে চাইছিল, বলে উঠতে পারল না দেবাংশু।

ইয়াং এক পেয়ার দেবাংশুর টেবিলের দুটো ফাঁকা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। শেষ না হওয়া কথা নিয়ে বসেছে ওরা। বলে যাচ্ছে কথা। দেবাংশুর বসে থাকা নিয়ে ওদের কোনও মাথাব্যথা নেই। টেবিলে রাখা বিলপাউচের দিকে চোখ যায় দেবাংশুর, মনে পড়ে ভাবনার ঘোরেই সে পাউচে একশোর একটা নোট রেখেছিল, ওয়েটার বিলের টাকা কেটে ব্যালেন্স রেখে গেছে পাউচে। ফোল্ড খুলে ওয়েটারের টিপস রেখে বাকি খুচরো তুলে নেয় দেবাংশু।

কাফে থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে দেবাংশু। ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে, অফিসেই যাচ্ছে। কোনও জরুরি কাজ তার অপেক্ষায় বসে নেই অফিসে। ইচ্ছে করলে অন্য কোথাও যেতে পারে। কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে? যাওয়ার জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। পাশ দিয়ে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকজন। দেবাংশুর মাথায় গোঁত্তা মারছে পুরনো একটা কথা, জনারণ্যে একা! জনারণ্যে একা!...বহুবার শোনা, আজ যেন কথাটার মর্মে পৌঁছতে পারছে দেবাংশু।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

হাঁটতে অবশ্য বেশ ভালোই লাগছে। আরাম হচ্ছে রোদটাতে। কলকাতায় শীত এসে গেল। চাঁদপাড়ায় ঠাণ্ডা বেশি পড়ে। দুপুরে এই সময়ে রোদে পিঠ দিয়ে চ্যাটার্জি বাড়ির বউয়েরা ভিতর দালানে বসে তাস, লুডো খেলে। এবার একজনের গায়ে এই রোদ পড়বে না।...গলার কাছটায় কষ্ট ঠেলে উঠল দেবাংশুর। লোপার না থাকাটা মনে করে চারপাশটা হঠাৎ জনশূন্য লাগছে। শুধু ধবধবে রোদ।

কারোর সঙ্গে ধাক্কা লাগল সজোরে, ঠোঁট থেকে পড়ে গেল সিগারেট। এক পাক ঘুরে গেল দেবাংশু। ধাক্কা লাগা মানুষটির কাছে ক্ষমা চাইতে যাবে। দেখা গেল লোকটাই কাঁচুমাচু মুখে, 'সরি দাদা, সরি' বলে এগিয়ে গেল। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল দেবাংশুর মন। পথেঘাটে এখনও কত ভদ্র, বিনয়ী মানুষ হাঁটাচলা করে। দোষটা দেবাংশুরই ছিল, লোপার কথা মনে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল পুরোপুরি। মনের এই অবস্থা কতদিন চলবে, জানে না দেবাংশু। এখন কোন ভরসায় জয়িতাকে বলবে, বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করে দাও। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, আমরা বিয়ে করব। কিছুদিন মানে কতদিন? দেবাংশু জানে না। সায়রকেও ব্যাপারটা জানাতে হবে, এখন যে মুডে আছে প্রসঙ্গটা তোলাই যাবে না। তার চেয়েও বড় কথা, জয়িতা যদি বলে, বিয়ের পর আমি ওবাড়িতে উঠব না। শেয়ার করব না লোপাবউদির ঘর, রান্নাঘর, বিছানা। আমরা নতুন বাড়িতে সংসার পাতব। এমনটা চাইতেই পারে জয়িতা। চাওয়াটা অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু দেবাংশু যে পারবে না ওবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ওবাড়ির আলোছায়া, বাতাসের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। প্রথম পাখির ডাক চিনেছে ওবাড়িতে থেকেই। ছোটবেলায় পুজোর প্রথম ঢাক শুনলে ছুটে বেরিয়ে যেত ওই সদর পেরিয়ে। মাঠে খেলতে খেলতে সন্ধে নেমে গেলে খোলা সদর দরজা যেন ডাকত, দেবু, চলে আয়। পড়তে বোস।...ও বাড়ির বাতাসের পরত তুললে নিজের কিশোরবেলাটা দেখতে পায় দেবাংশু। ছোটাছুটি করছে, খেলছে, পড়তে পড়তে ঢুলে পড়ছে। যৌবনে পা রাখা দেবাংশু ছাদের কোনায় বসে ঝুঁঝকো আলোতে নিষিদ্ধ বই পড়ছে। বইয়ের নায়িকা তখন পাড়ার কুন্তলাদি। এইভাবে একদিন কলেজ, চাকরির শুরু। উঠোনে মালা পরে শুয়ে থাকা মা, বাবার একে একে প্রস্থান। তারপর আর পরত সরাতে লাগে না, এখনকার বাতাসেই দেখতে পায় নতুন

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বউয়ের সাজে লোপাকে, ওর ঘরকন্না, নীচের বৈঠকখানা থেকে ভেসে আসে লোপার গানের ক্লাসের কোরাস। এই সবটা নিয়েই দেবাংশু। সাতচল্লিশ বছর ওবাড়িতে থাকতে থাকতে শিকড় অনেকটাই চাড়িয়ে গেছে। এখন আর উপড়ে আনা সম্ভব নয়। বাড়ির দেওয়ালে, ছাদ, বারান্দার পাঁচিলে হাত রাখলে মা, বাবা, লোপার হাতের স্পর্শ পায়। বাকি জীবনটা ওই বাড়িতেই কাটিয়ে দিতে চায় দেবাংশু। জয়িতার কথায় সে যেমন অন্য কোথাও থিতু হতে পারবে না, জয়িতা যদি রাজি হয়ে এবাড়িতে চলেও আসে, চিরকাল নিজেকে আউটসাইডার বলেই মনে হবে জয়িতার। দেবাংশু আজ বিয়ের অঙ্গীকার না করে জয়িতার উপকারই করেছে। সায়রেরও উনিশ বছর বয়স হয়েছে, জয়িতাকে মায়ের আসনে বসাতে পারবে না। হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, নয়তো দেবাংশুকে বলবে, অন্য কোথাও গিয়ে থাকো।

সায়রকে ছেড়ে থাকতে পারবে না দেবাংশু। ছেলের দৃপ্ত চলাফেরা দেখলে নিজের বয়স হয়ে যাওয়া নিয়ে আক্ষেপ হয় না। মনে হয় আমি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। সায়রের কান দিয়ে নতুন করে পাখির ডাক শুনেছে দেবাংশু। ঢাকের শব্দ শুনে তার হয়ে সায়র বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। দেবাংশুর গলায় গান তেমন আসে না, সায়র ওর হয়ে গায়। জীবনে বহু জায়গায় যাওয়া হয়নি, অনেক কিছু পাওয়া হয়নি দেবাংশুর। সায়র পাবে। ঘুরবে কতশত জায়গায়, দেবাংশুর মন ছায়ার মতো লেগে থাকবে ওর সঙ্গে। নিজের জীবনের শেষ পৃষ্ঠা অবধি লেখা হয়ে আছে, দেবাংশু সেটা দেখতেও পায়। সেখানে জয়িতার উপস্থিতি কয়েকটা পরিচ্ছদে মাত্র। যেন সিগনাল না পেয়ে কোনও নিসর্গের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়া ট্রেন। নিসর্গ হচ্ছে জয়িতা। ওই মনোরম প্রকৃতি দেখে প্রায় প্রত্যেক যাত্রীরই মনে হয় এখানে নেমে গেলে হত, থেকে গেলে হত অথবা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বাসা বাঁধব। কিছুই হয় না সাধারণত। ট্রেন সিগনাল পেয়ে বাঁশি দিলে, দু'একজন যারা নেমেছিল ট্রেন থেকে, তারাও ছুটতে ছুটতে এসে উঠে পড়ে। ট্রেন গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। ব্যতিক্রম কি নেই? আছে? ব্যতিক্রমীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেবাংশুর নেই। ব্যতিক্রম মানেই যে এক নিষ্ঠুর, নিদারুণ বিচ্ছিন্নতা। লাখে হয়তো একটা মানুষ পারে এই কষ্ট সহ্য করতে। দেবাংশু পারবে না। সে বিশেষ ধরনের মানুষ নয়, অত্যন্ত অ্যাভারেজ। নিজের জীবনে ডেকে এনে জয়িতাকে সে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলতে চায় না। প্রথম

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

প্রথম জয়িতার কষ্ট হবে দেবাংশুকে ভুলে অন্য কাউকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। সংসারের মায়ায় জড়িয়ে সুখ খুঁজে পাবে ঠিক। জীবন থেকে অনেকটা সুখ-আনন্দ জয়িতার প্রাপ্য। সে কেন আধবুড়ো দেবাংশুকে বিয়ে করতে যাবে? যার একটা উনিশ বছরের ছেলে আছে। বাড়ির বাতাস জুড়ে রয়েছে দেবাংশুর আগের স্ত্রীর জন্য পরিবারের সকলের সন্তাপ। জয়িতা এবাড়িতে এসে সুখী হত না। জয়িতার মা, বাড়ির লোক চাইত না এরকম একটা সেকেন্ড হ্যান্ড পাত্রের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে হোক। জয়িতা এখনও যথেষ্ট সুন্দরী, আসল বয়স টের পাওয়া যায় না। ঝকঝকে একটা সংসারে রানির মতো থাকতে পারে সে। এই উজ্জ্বল সম্ভাবনাটা নষ্ট করা উচিত হত না দেবাংশুর। এক জীবনে সে দুটো মেয়েকে ঠকাতে পারবে না। লোপাও তো সুখেই ছিল চাঁদপাড়ার বাড়িতে। জয়িতার খবরটা কানে না পৌঁছোলে এভাবে সরে যেত না। শেষের দিকে হয়তো খেত না প্রেশারের ট্যাবলেট। জীবন থেকে নিজেকে উইথড্র করছিল। নইলে কথা নেই বার্তা নেই। দুম করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল কেন? অফিসের সুতপনদা সেদিন ওই কথাটা না বললে দেবাংশু লোপার মৃত্যুর জন্য নিজেকে এভাবে দায়ী করত না। আগেও সন্দেহটা হত, তবে অনেক ফাঁক ছিল। মনে হত অপরাধবোধ থেকে আমি এমনটা ভাবছি। লোপাকে বুঝতে না দিয়ে অন্য একজনকে ভালোবেসে যাওয়ার অপরাধ। কেউ যদি লোপার কানে জয়িতার কথা তুলেও থাকে, বলে, তোমার বরকে ওই মেয়েটার সঙ্গে প্রায়ই ঘুরতে বা আড্ডা মারতে দেখা যায়। লোপা এত ব্যাকডেটেড, ছোটমনের মেয়ে নয় যে, ধরে নেবে দেবাংশুর সঙ্গে মেয়েটার প্রেম আছে। দেবাংশুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করত, মেয়েটা কে?—এটাই ছিল সন্দেহের ফাঁক। দেবাংশুর মনে হতে শুরু করেছিল লোপার কানে কিছুই পৌঁছোয়নি। মনের কষ্ট চেপে মারা যায়নি সে। শরীরের কারণেই চলে গেল তাড়াতাড়ি। সুতপনদার মন্তব্যের পর সেই ধারণা ভেঙে গেছে তার। লাইব্রেরিতে বড় একটা আসেন না সুতপনদা, কেউই আসে না। সবাই এখন ইন্টারনেট থেকেই কাজ সেরে নেয়। সুতপনদা এসেছিলেন নিজেদের কাগজ নিয়ে কিছু একটা লিখতে গিয়ে আটকে যাওয়ার জন্য। দেবাংশুকে বলেছিলেন, পঁচানব্বই সালের মার্চ মাসের বান্ডিলটা দাও।

এনে দিয়েছিল দেবাংশু। কাগজ ওলটাতে ওলটাতে সুতপনদা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বললেন, মুখ শুকনো করে আর কতদিন ঘুরবে? মেয়েটাকেই-বা ঝুলিয়ে রেখে কী লাভ! এবার ঘরে তোলো।

দেবাংশুর বুঝতে অসুবিধে হয়নি, জয়িতাকে ইঙ্গিত করছেন সুতপনদা। ভিতর ভিতর বেশ বিরক্ত হয়েছিল। সেটা প্রকাশ না হতে দিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, ওকেই বিয়ে করব কী করে ধরে নিলেন? সম্পর্কটা বন্ধুত্বের হতে পারে না?

কাগজ থেকে মুখ তুলে সুতপনদা চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়েছিলেন দেবাংশুর দিকে। বলেছিলেন, কোনটা শুধুই বন্ধুত্ব আর কোনটা বিশেষ বন্ধুত্ব, পাশাপাশি থাকলেই বোঝা যায়। তোমরা যখন পাশাপাশি থাকো বিশেষ বন্ধুত্বের কেমিস্ট্রিটা চোখে পড়ে। বোঝাই যায় তোমরা একে অপরকে কতটা চাও।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নার্ভাস লাগতে শুরু করেছিল দেবাংশুর, তাহলে কি জয়িতার কথা কারোর মুখ থেকে শুনে লোপা আড়াল থেকে দেখে গেছে তাদের? চোখে পড়েছে কেমিস্ট্রিটা? তারপরই জীবন থেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। অভিমান করে সব ছেড়ে একেবারের জন্য চলে গেছে। দেবাংশুকে কোনও প্রশ্ন করে নিজেকে ছোট করেনি। ওর মৃত্যুর জন্য দেবাংশুই দায়ী। মানুষ অনেক কিছু গোপন করতে পারলেও, ভালোবাসাটা লুকোতে পারে না। অজান্তেই প্রকাশ হয়ে যায়। দেবাংশু, জয়িতাকে পাশাপাশি দেখে নিজের ভালোবাসার ভাঁড়ার শূন্য মনে হয়েছিল লোপার।

অফিসে ঢুকে লিফটে করে চারতলায় চলে এসেছে দেবাংশু। লাইব্রেরিতে ঢুকে নিজের টেবিলের দিকে চোখ গেল, পেপারওয়েট চাপা দেওয়া একটা কাগজ। এগিয়ে গিয়ে কাগজটা তুলে নেয়, একটা চিঠি। হাতের লেখা দেখে প্রফুল্লতায় ভরে যায় মন। আদিত্য এসেছিল। লিখেছে, একটা কাজে অল্প সময়ের জন্য কলকাতায় এসেছি। ভাবলাম দেখা করে যাই। কতদিন দেখিনি। থাকিস কোথায়! ফোন করলাম না, বসতে বলতিস। সময় নেই। চারটের ট্রেনটা না ধরলে গ্রামে ফিরতে মাঝরাত। ভালো থাকিস।—আদিত্য।

চিঠিটা বারকয়েক পড়ে পকেটে পুরল দেবাংশু। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। প্রায় চার-পাঁচবছর হয়ে গেল আদিত্যর সঙ্গে দেখা হয়নি। লোপার মারা যাওয়ার খবর নিশ্চয়ই পেয়েছে। দেখা করতে আসেনি। হয়তো

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

হতভাগ্য বন্ধুকে ফেস করতে পারবে না বলেই যায়নি চাঁদপাড়ায়। লোপা চলে যেতে দেবাংশুর আশপাশটা এমন বদলে গেল, ভুলতেই বসেছিল আদিত্যর কথা। আজ চিঠি না রেখে গেলে, আবার কবে ওকে মনে পড়ত, কে জানে! কলেজ থেকে হলায় গলায় বন্ধুত্ব। রিলেশনটা রয়ে গিয়েছিল ওর গ্রামের বাড়ি ফিরে যাওয়া অবধি। মানিকতলায় মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছে আদিত্য। পুরো কলকাত্তাইয়া। দেবাংশুকে কলকাতা চিনিয়েছিল আদিত্যই। চাঁদপাড়া কলকাতার কাছে হলেও মফস্‌সলের কিছুটা জড়তা দেবাংশুর মধ্যে ছিলই। আদিত্য চাকরি পেল এলআইসিতে। ছুটির পর দুই বন্ধু দেখা করত কফি হাউসে, বারে। দেবাংশুর অবশ্য মদের প্রীতি ছিল না। আদিত্যর জোরাজুরিতে খেতে হত। তারপর একসঙ্গে সিনেমা। নাটক দেখা তো ছিলই। এক কথায় আদিত্য দাপিয়ে বেড়াত কলকাতা, দেবাংশু ওর স্যাঙাত। আদিত্য চাঁদপাড়ার বাড়িতে গেছে, বেশ কয়েকবার রাতও কাটিয়েছে। দেবাংশুও মানিকতলায় ওর মামার বাড়িতে থেকেছে। মামারা স্বর্ণকার। আদিত্যকে মাথায় করে রাখত। ওবাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘরটা ছিল আদিত্যর দখলে। সব সেপারেট ব্যবস্থা। প্রচুর মেয়ের সঙ্গে ঘুরেছে। কাউকে বউ করার যোগ্য মনে করেনি। মামারা দেখাশোনা করে বিয়ে দিল মালবিকার সঙ্গে। দেবাংশুর ততদিনে বিয়ে হয়ে গেছে। বারচারেক হয়তো দুই বন্ধু নিজেদের বউসমেত একসঙ্গে বাইরে বেড়াতেও গেছে। আদিত্যর আমুদে স্বভাব পছন্দ করত লোপা। দু'জনে জমত খুব। লোপার গানের ভীষণ ভক্ত ছিল আদিত্য। যখন তখন যেখানে সেখানে গান শুনতে চাইত। নিজের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার কোনও আগ্রহ ছিল না আদিত্যর। মা, বাবাকে দেখতে আলেকালে যেত। রাত কাটাত না, চলে আসত দিনের দিন। দেবাংশু অনেকবার ওর গ্রামে যেতে চেয়েছে, নিয়ে যেত না আদিত্য। বলত, একেবারে অজগ্রাম। পাকা রাস্তা নেই, ফ্যান-লাইট নেই। বাস থেকে নেমে ছ'কিলোমিটার হাঁটতে হয়। গ্রামের ছেলেরা সব খালি গায়ে থাকে, মেয়েদের ব্লাউজ পরার চল নেই। অত গাঁইয়া পরিবেশ তোর ভালো লাগবে না। আদিত্য বাবা, মা-র বড় সন্তান। ওর পরে দু'ভাই এক বোন। তারা গ্রামের বাড়িতেই থাকত। মাইলের পর মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে স্কুল-কলেজ যেত তারা। লেখাপড়াতেও ভালো ছিল। আদিত্যর স্কুলবেলার খানিকটা ওভাবেই কেটেছে। মামারা ওকে কলকাতায় নিয়ে এসে সম্ভবত ক্লাস এইটে ভর্তি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

করায়। মামারাই ওকে ঘষেমেজে কলকাতার ছেলে বানিয়ে দিয়েছিল। মামাদের অরিজিন কিন্তু গ্রামে। সোনার কাজ শিখতে বড়মামা এসেছিল কলকাতায়। কাজ শিখে রীতিমতো দোকান ফেঁদে বসল। মাঝে মাঝে আদিত্যর বাবা, মা চলে আসত কলকাতায় কিছুটা মামাদের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করতে, বেশিটা বড় সন্তানকে দেখতে। মানিকতলার বাড়িতে আদিত্যর বাবা-মাকে প্রথম দেখেছে দেবাংশু। পাটভাঙা কাপড়জামা পরে আড়ষ্টভাবে ঘোরাফেরা করছেন। একবারের কথা খুব মনে আছে, আদিত্যর বাবা-মা তখন কলকাতায়। বাবা কোথা থেকে যেন ফিরলেন। পরনের ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি। আদিত্য দেবাংশু সেই সময় মানিকতলার বাড়ির সদর দিয়ে বেরোচ্ছিল, আদিত্যর চোখ গেল বাবার পায়ে। বলে উঠেছিল, চটি কোথায় ফেলে এলে?

কাকাবাবু থতমত খেয়ে পায়ের দিকে তাকালেন। তারপর মুখ তুলে শিশুর সারল্যে বলে উঠেছিলেন, এই রে, পরে যেতেই ভুলে গেছি। অভ্যেস নেই তো।

—তা তুমি গিয়েছিলে কোথায়? জিজ্ঞেস করেছিল আদিত্য।

কাকাবাবু বলেছিলেন, ওই আহিরিটোলার দিকে, সুদর্শনের সঙ্গে দেখা করতে। বারবার করে বলে যেতে।

বাবাকে আর কিছু বলল না আদিত্য। দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বাবার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে দেবাংশু জেনেছিল সুদর্শনকাকা আদিত্যদের গ্রামের লোক। কলকাতায় এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

লোপার জোরাজুরিতে আদিত্য একবার বাধ্য হয়েছিল ওদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে। দেবাংশু, লোপা তো ছিলই, মালবিকাও গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেবাংশু তো অবাক, এতদিন সব মিথ্যে বলেছে আদিত্য! বাস থেকে নামার পর এক পাও হাঁটতে হয়নি, উঠেছিল ট্রেকারে। রাস্তা পাকা। দু'পাশে সোনাঝুরি, ইউক্যালিপটাস। সরকার থেকে লাগানো। ট্রেকার থেকে নামার পর কাঁচা রাস্তা, সেটুকুও যাওয়া হল ভ্যানরিকশায়। গ্রামের নাম শশিন্দা। পশ্চিম মেদিনীপুরের বর্ডারে গ্রামটা। আদিত্যদের বাড়িটা মাটির হলেও, দোতলা। গ্রামের শেষ বাড়ি। তারপরই কেলেঘাই নদীর খাল। ওপারে পূর্ব মেদিনীপুর। গ্রামে ইলেকট্রিসিটি এসেছে। আদিত্যদের বাড়িতে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ফ্যান লাইট সবই জ্বলে। তবে গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িই ইলেকট্রিক লাইন নেয়নি। তাদের বক্তব্য, সন্ধের পর আর কী কাজ! খামোখা কারেন্টের বিল দিতে যাব কেন!

গ্রামে দিন শুরু হয় কাকভোর থেকে। সন্ধে নামতে না নামতে রাত। আদিত্যদের বাড়ি ঘিরে নিজেদের প্রচুর জমিজমা, পুকুর। চারপাশ সবুজ হয়েছিল তখন। সেটা বোধহয় পুজোর মাস। সব দেখে-টেখে দেবাংশু আদিত্যকে বলেছিল, তুই, ব্যাটা এত মিথ্যে বলতিস কেন? তো রীতিমতো বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সবরকম সুযোগ সুবিধাই আছে।

—হালে হালে হয়েছে এ সব। আগে একেবারে ভূতুড়ে গ্রাম ছিল। তাও তো কাছাকাছি বড় স্কুল নেই। কলেজ সেই দাঁতনে। হাসপাতাল বলতে ষাট কিলোমিটার দূরে, মেদিনীপুর। আক্ষেপের গলায় বলেছিল আদিত্য।

দেবাংশুরা যখন গিয়েছিল বাড়িতে মা-বাবা ছাড়া ছোটভাই আর বোন। দু'জনেই কলেজে পড়ছে। ভাই এম.এ ক্লাসে। মেজ চাকরি পেয়ে চলে গেছে কানপুর। ওবাড়ির আর একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য হচ্ছেন আদিত্যর ঠাকুমা। পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে ঠাকুমার কথা এমনভাবে উচ্চারণ করত আদিত্য, যেন বাড়ির কোণে পড়ে থাকা এক বুড়ি। শশিন্দায় গিয়ে দেখা গেল সেরকমটা নয়। ও বাড়িতে ওঁর উপস্থিতিই সবচেয়ে উজ্জ্বল। উজ্জ্বলতার প্রথম কারণ, গায়ের রং খুব ফর্সা। ওই রং আদিত্য নিজে এবং বাবা, ভাই-বোন খানিকটা পেলেও, মা শ্যামলা। ঠাকুমার বয়স তখনই বোধহয় পঁচাশি পেরিয়েছে। একসময় অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। তার সমস্ত প্রমাণ লিপিবদ্ধ ছিল বয়সের কারণে একটু ঝুঁকে যাওয়া শরীরে। দালানের খুঁটিতে টাঙানো দড়ির দোলনায় বসে থাকতেন, যেন ওবাড়ির আদরের কাকাতুয়া।

দেবাংশুরা যখন গ্রামের বাড়ি পৌঁছে ঠাকুমাকে প্রণাম করতে গেল, উনি পা পিছিয়ে নেননি। প্রণাম নেওয়ার পর দু'হাতে গাল ধরে কপালে চুমু খেয়েছিলেন। চুমুর পর লোপা তো খানিকক্ষণ ওঁকে জড়িয়ে রইল। গ্রামে থাকার হীনম্মন্যতায় আদিত্যর মা, বাবা প্রণাম নিতে চাইতেন না, সসংকোচে 'থাক, থাক' বলে পিছিয়ে যেতেন। আদিত্যর মামার বাড়িতেই এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল দেবাংশুর। গ্রামের বাড়িতে আর অন্যথা হয়নি। দোলনায় বসা ঠাকুমার মুখে লেগে থাকত ফচকে মার্কা হাসি, টেনশন ফ্রি অ্যাটিটিউটে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

অবজার্ভ করতেন সংসারের কাজ। কাউকে হয়তো নির্দেশ দিলেন, ওরে যা, স্নান করে আয়। এবার খেতে দেবে তো। অথবা বউমা বলাইকে একবাটি মুড়ি দিয়ো, খিদে পেয়েছে ওর।

বলাই মুনীশ খাটে। খিদের কথা সে বলেওনি, হয়তো পায়ইনি খিদে। দোলনা থেকে হেঁটে যেতেন পাকশালায় রান্নার তদারকি করতে। আদিত্য বলেছিল, বুড়ির চোখের অবস্থা বেশ খারাপ। ভালো দেখতে পায় না। রোগ বলতে ওই একটাই। অথচ এমন ভান করছে দেখ, যেন সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। চশমা রাখতে চায় না চোখে। খবরের কাগজ পড়ার সময়টুকু পরে।

স্কুলে উঁচু ক্লাস অবধি পড়েছিলেন আদিত্যর ঠাকুমা। সেবার দ্বিতীয় দিনেও যখন ঠাকুমাকে ব্লাউজ পরিহিত অবস্থায় দেখা গেল, দেবাংশু বুঝল এটা আদিত্যর আর একটি মিথ্যে। বাড়িতে অতিথি আসছে বলে হয়তো প্রথমদিন ব্লাউজ পরে ভদ্র সেজেছিলেন, পঁচাশি বছর বয়সেও। পরের দিন কেউ এটিকেটের ধার ধারে না। তাছাড়া আদিত্যর মা এবং গ্রামের অর্ধেকের বেশি মহিলাকে ব্লাউজ ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল। আদিত্যর বোন সালোয়ার কামিজ। দেবাংশু যখন এ ব্যাপারে আদিত্যকে চেপে ধরল, তুই যে বলেছিলি তোর গ্রামের মেয়েরা ব্লাউজ পরে না, এ তো দেখছি প্রায় সকলেই পরে। এমনকী তোর ঠাকুমা পর্যন্ত।

আদিত্য বলেছিল, ঠাকুমা চিরকালই পরে। মেদিনীপুর শহরের বনেদি বাড়ির মেয়ে। ঠাকুর্দা ফুসলিয়ে বিয়ে করে এনেছিল। ঠাকুমার কারণেই আমাদের বাড়ির রীতি-রেওয়াজ মোটামুটি ভদ্রগোছের। বাকি যে উন্নতি দেখছিস গ্রামের, বেশি দিনের নয়। কিছুদিন আগে ছ-কিলোমিটার রাস্তাটা পাকা হওয়াতে সহজেই শহরের হাওয়া ঢুকে আসছে গ্রামে।

যে আদিত্য নিজের দেশবাড়িকে এত হেয় করত, সে এখন ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। আদিত্য মালবিকার কোনও সন্তান হয়নি। সদা প্রাণচঞ্চল আদিত্য ধীরে ধীরে মুষড়ে পড়েছিল কলকাতায় থাকতে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই নানান চিকিৎসা, বহু ডাক্তারঘর করেছে। সুরাহা হয়নি। সম্পর্কে তাতে কোনও চিড় বা ফাটল ধরেনি দু'জনের। একে অপরকে খুবই ভালোবাসত। আদিত্যর বরাবরই বাচ্চাদের ওপর টান ছিল। মালবিকার তো থাকবেই, মেয়েদের যেমন থাকে। ওদের শুকনো মুখ দেখে কষ্ট হত দেবাংশু,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

লোপার। সায়রকে ঠেলে দিত আদিত্য, মালবিকার মাঝে। ছোট থাকতে দু'চারবার সায়র রাত কাটিয়েছে মানিকতলায় ওদের বাড়িতে।

আদিত্য বাবার শেষশয্যায় সেই যে শশিন্দায় গেল, আর ফিরল না। ওখান থেকেই চাকরিতে রিজাইন দিল। তারপর থেকে খুব দরকার ছাড়া কলকাতায় আসে না। এলে প্রথম দিকে অবশ্যই দেখা করত দেবাংশুর সঙ্গে। শশিন্দায় ফাইনালি থেকে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলেছিল, মাকে বিল্টু কলকাতায় নিয়ে গেল, ঠাকুমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ঠাকুমার ইচ্ছে নেই। বিল্টু আদিত্যর ছোটভাই, রাইটার্স-এ চাকরি করছে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আদিত্যর মায়া পড়ে গেল নিজের গ্রামের প্রতি। ভাবল, চাকরিবাকরি করে কী হবে! কাউকে মানুষ করার দায় নেই। গ্রামের জমিবাড়ি সব বিক্রি করে দিতে হবে। তার চেয়ে ওখানে গিয়েই থাকি। চাকরির জমা টাকা আর চাষের রোজগার থেকে বাকি জীবনটা দিব্যি কেটে যাবে।

কলকাতায় এলে আদিত্য বলত, দু'একটা দিন হাতে নিয়ে চ আমার ওখানে। দেখবি আমি মালবিকা কেমন জমিয়ে জীবনযাপন করছি।

যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি লোপা, দেবাংশুর। এবার যাবে। ক-টা দিন কোথাও যাওয়ার হলে আদিত্য মালবিকার কাছেই যাওয়া ভালো। ওদের সান্নিধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করবে দেবাংশু। আদিত্যর ঠাকুমা এখন আর বোধহয় বেঁচে নেই। তখনই যা বয়স। দেবাংশু মিস করবে ওঁকে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ছয়

প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বাড়ি ফেরার ট্রেনটা পেল জয়িতা। সালোয়ার বা জিনস্-এর এই সুবিধে। শাড়ি পরা থাকলে মিস হত লোকালটা। আজ জয়িতা জিনস্, কুর্তা। লেডিস কম্পার্টমেন্টে ওঠা সম্ভব হয়নি। এই কামরায় অবশ্য ঠাসাঠাসি ভিড় নেই। ঝুলন্ত হ্যান্ডেল ধরে জয়িতা এখন দম নিচ্ছে। চোখ গেল সিটগুলোর দিকে, গেল না বলে চোখ টেনে নিল বলা ঠিক। এক ভদ্রলোক হাতের ইশারায় নিজের সিটটা অফার করছেন। জয়িতা সলজ্জভঙ্গিতে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। জয়িতাকে হাঁপাতে দেখে বোধহয় দয়া হয়েছে ভদ্রলোকের। চেনাজানা নেই, অনুগ্রহটা নিতে যাবে কেন? দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে প্যাসেঞ্জারের ফাঁক দিয়ে দরজার বাইরে চেয়ে রইল জয়িতা। এর আগেও এরকম হয়েছে, দৌড়ে হয়তো জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠতে হল, গরিফার কোনও চেনা লোক নিজের সিট ছেড়ে দিয়েছে জয়িতাকে। এখন যে ভদ্রলোক সিট অফার করলেন, জয়িতার অচেনা হলেও, লোকটি সম্ভবত জয়িতাকে চেনেন। ওঁর ডাকার ধরনটা দেখে অন্তত তেমনই মনে হল। এমনও হতে পারে ভদ্রলোকের সঙ্গে কখনও হয়তো আলাপ হয়েছিল, জয়িতা ভুলে গেছে। যদিও জয়িতা একেবারেই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ভুলো মনের নয়, এক দেখাতেই মানুষকে মনে রাখতে পারে। বিশেষ করে পুরুষদের, মুখচোখ থেকে ভাষা অনুবাদ করে নিতে হয় যে। এই ভদ্রলোককে অবশ্য সো কলড হ্যাংলা টাইপের মনে হল না। অনেকে আছে, সুন্দরী যুবতী দেখলে সিট অফার করে। তারপর গুটিসুটি পায়ে আলাপ জমাতে আসে। তারাই বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেখলে কিন্তু সিট ছাড়ে না। ইনি সেরকম নন, চেহারায় শিক্ষাদীক্ষার ছাপ আছে। কে হতে পারেন তা হলে? কোনও বন্ধুর বর-টর কি? একমাত্র বন্ধুদের হাজব্যান্ডকে বড্ড গুলিয়ে ফেলে জয়িতা, যাদের বিয়ের আসরে প্রথম দেখেছে। তখন একেবারে রাজবেশ। পরে মামুলি চেহারার একটা লোক পথ আগলে যখন জিজ্ঞেস করে, চিনতে পারছেন?

মহা ফাঁপরে পড়ে যায় জয়িতা। একবার তো একজনকে বলে ফেলেছিল, চিনব না কেন! চৈতির বর তো আপনি।

মুখের আলো নিভে গিয়েছিল লোকটার। বলেছিল, আমি মন্দিরার।

তারপর থেকে আর রিস্ক নেয় না জয়িতা। বলে দেয়, সরি, ঠিক প্লেস করতে পারছি না।

ক-দিন আগে বছর পাঁচেকের ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে এসেছিল সঞ্চিতা। নিজের সংসার শ্বশুর শাশুড়ির গল্প করছিল। ওর বরের চেহারাটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না জয়িতার। গল্পগুলো ভিশুয়ালাইজ করতে অসুবিধে হচ্ছিল। যেমন সঞ্চিতা বলছিল, জানিস তো আমার বর কত লম্বা, ওর সাইজের জামা-প্যান্ট কেনা...

লম্বার সূত্র পেয়েও মনে পড়ল না বরটাকে। দুই বন্ধুর কথার মাঝে বড্ড জ্বালাচ্ছিল সঞ্চিতার ছেলেটা। দুরন্ত বাচ্চারা যেমন করে আর কি। জয়িতার তেমন কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। সঞ্চিতার দেখা গেল ধৈর্য ভীষণ কমে গেছে, বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিল ছেলেটার পিঠে। বাচ্চাটা অমনি ভ্যাঁ, সে আর থামে না। জয়িতা মৃদু ধমকের সুরে সঞ্চিতাকে বলেছিল, এত শট টেম্পার্ড হলে চলবে! মা হয়েছিস যখন সহ্যক্ষমতা একটু বাড়া।

—আর পারি না বুঝলি। বাপ-ব্যাটা মিলে আমাকে ভাজা-ভাজা করে দিচ্ছে। এখন মনে হয় কেন যে বিয়েটা করতে গেলাম! তুই অনেক ভালো আছিস বুঝলি।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

যেই না বলেছে সঞ্চিতা, জয়িতা বলেছিল, এত কষ্ট করছিস কেন! সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে আয়। তুই তো একটাই সন্তান। বাবার টাকাও আছে।

মুহূর্তে মুড বদল হয়েছিল সঞ্চিতার। নরম হয়ে গিয়েছিল মুখচোখ। বলেছিল, আর বোধহয় ছাড়তে পারব না। এমন একটা টান...। তাই তো মেরেধরে, ঝগড়া করে ওদের বশে রাখার চেষ্টা করি।

বেশ জোরালো একটা টান যে আছে, চারপাশের সংসারগুলো দেখলেই বোঝা যায়। এই হয়তো বাচ্চাকে বেদম পেটাল, ঘণ্টাখানেক বাদে সেই বাচ্চাকেই কোলে তুলে গালে দিল প্রগাঢ় চুমু। সকালেই হয়তো বরের সঙ্গে হাতাহাতির জোগাড়, বিকেলে রিকশায় বসে হাসাহাসি করতে করতে চলে গেল কেনাকাটা করতে অথবা সিনেমায়। টানটা লক্ষ করলেও, স্বাদটা অজানা থেকে গেছে জয়িতার কাছে।

সেদিন সঞ্চিতা চলে যাওয়ার পর মা বলছিল, মেয়েটার কী বিচ্ছিরি চেহারা ছিল, একেবারে খ্যাংড়াকাঠির দশা! এখন কত সুন্দর মা মা দেখতে হয়েছে। তুই বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিলি। দিন দিন পাকিয়ে যাচ্ছে চেহারা। এখনও সেই কলেজছাত্রীই লাগে। মাঝে যদি-বা একদিন শাড়ি পরে অফিস গেলি, তারপর আবার যে কে সেই।

হঠাৎ কেন সেদিন শাড়ি পরেছিল জয়িতা, ধন্দটা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে মা। শাড়ি পরতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, কী ব্যাপার, আজ শাড়ি। অফিসের কারোর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে?

—না, ইচ্ছে হল, পরলাম। বলেছিল জয়িতা। না বলে নেমন্তন্ন আছে বলে দিলেই ভালো হত। কৌতূহল থাকত না আর মায়ের, শাড়ির সূত্র ধরে মা একটা সুখসম্ভাবনার কথা ভাবতে চাইছে। খুবই অস্পষ্ট আন্দাজ সেটা। মা ভাবছে, শাড়ির প্রতি ঝোঁক হওয়া মানে বিয়ের কথাও হয়তো ভাবতে শুরু করেছে মেয়ে। অনুমানটা পুরোপুরি ফেলে দেওয়ার নয়। একেই বলে মেয়েদের ইনস্টিংক্ট। দেবাংশুর যাতে বউ ভাবতে সুবিধে হয় তাকে, সেটা ভেবেই শাড়ি পরেছিল জয়িতা। আগেও পরেছে সামনে। তখন খুব খুশি হত। মজা করে বলত, তোমাকে সব ড্রেসেই দারুণ মানায়। তবে তুমি শাড়ি পরলে আমি কমফর্ট ফিল করি। লোকজন ভর্ৎসনার চোখে তাকায় না। আধবুড়ো হয়ে বাচ্চা মেয়ের মাথা চিবোচ্ছি, ভাবে না আর। শাড়ি দু'জনের বয়সের ব্যবধান কিছুটা হলেও মেকআপ দিয়ে দেয়।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

তো সেদিন বউয়ের শোকে এমনই মুহ্যমান, জয়িতা কী ড্রেসে আছে, খেয়ালই করলেন না। বিয়ের প্রস্তাব আদায় করতে কথার কতরকম ফাঁদ পাতল জয়িতা। বাবুর কোনও হুঁশ নেই। সারাক্ষণ সায়রের মুড ডিসঅর্ডার নিয়ে কথা বলে গেল। জয়িতার কেমন জানি মনে হচ্ছিল ছেলের ব্যাপারটা দেবাংশু ইচ্ছে করে ফাঁপিয়ে বলছে। বোঝাচ্ছে, দেখো, আমার এত বড় একটা সন্তান আছে। বউ মারা গেছে বলে তোমাকে বিয়ে করব, আশা করে বোসো না যেন। বরঞ্চ বউয়ের কাছে কেস খাওয়ার ভয় নেই এখন, চলো, হোটেলে দু'রাত কাটিয়ে আসি। এই ভেবেই কথাটা বলেছিল দেবাংশু। কী কথা শুনতে গিয়ে কোন কথা শুনে ফিরতে হল জয়িতাকে! দেবাংশু যে আশঙ্কা প্রকাশ করছিল জয়িতার বিয়ে নিয়ে, সেটাও অ্যাক্টিং, মিথ্যে। আসলে ও বোঝাতে চাইছিল সামাজিক যে লক্ষণরেখাটা দু'জনের মধ্যে আছে, সেটা থাকবেই। তুমি অন্যত্র বিয়ে করে নেওয়ার হুমকি দিলেও তার কোনও নড়চড় হবে না। অথচ সেদিন দুপুরে দেবাংশু যখন এসএমএস করে ডাকল, মনে হয়েছিল আজ বোধহয় জয়িতার শুনতে চাওয়া কথাটাই বলবে। মেসেজের বয়ানের মধ্যে সেরকমই কিছু একটা ইঙ্গিত পাচ্ছিল জয়িতা। তর সইছিল না বলেই জয়িতা দেখা করতে চায় টিফিন আওয়ার্সে। ভাগ্যিস তাকে তুলতে হবে না প্রসঙ্গটা। শাড়ি পরে আসাটা সার্থক মনে হয়েছিল। ছুটির পর কোথাও মিট করে জয়িতাকে ইনিয়েবিনিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিতে হত দেবাংশুকে। সে বড় লজ্জার ব্যাপার। লজ্জা পাওয়ার সুযোগই দিল না দেবাংশু। ও বোধহয় টের পেয়েছিল জয়িতা বিয়ের কথাটা এবার তুলবে। তাই লক্ষণরেখার সীমানাটা নতুন করে দেখিয়ে দিল। ঘুরিয়ে অ্যাডভাইস দিল অন্য কাউকে বিয়ে করে নেওয়ার। বিয়ের পর দেখা করা আর সম্ভব নয়, সেটাও জানিয়ে দিল। ও যখন দেখা না করে থাকতে পারবে, জয়িতাই-বা পারবে না কেন? গত চারদিন ধরে দেবাংশুকে ভোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে জয়িতা। একটাও ফোন করেনি। অফিস ছুটির পর সোজা বাড়ির উদ্দেশে রওনা। দেবাংশুরও ফোন বা মেসেজ নেই। অর্থাৎ জয়িতাও ভুল করেনি ওর ইঙ্গিত বুঝতে। শুধু একটাই আক্ষেপ রয়ে গেল, দেবাংশু হঠাৎ গরিফার বাড়িতে পৌঁছে যেতে কেন রেগে গিয়েছিল জয়িতা, বলা হল না। এখন বলতে যাওয়াটা ন্যাকা ন্যাকা দেখাবে। কী করে বলবে, আমার খুব ইচ্ছে ছিল একেবারে বরবেশে তুমি আমাদের বাড়িতে আসো। মাথায় যে ক-টা সাদা চুল

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আছে কলপ করে ঢাকা দেবে। তুমি দেখতে এত সুন্দর, পাড়ার লোকেরা সাগ্রহে চোখ বড়বড় করে তোমায় দেখবে। বলবে, জয়ির জন্য এরকম বরই উপযুক্ত। দেরি হলেও জয়ির মতো সুন্দরী মানানসই বর পেয়েছে।

তোমার আমার বয়সের ব্যবধান আত্মীয়, প্রতিবেশীর চোখেই পড়বে না। তোমার অতীতের কথা জানতেই চাইবে না কেউ। মা তো সেই কবে থেকে উৎকর্ণ হয়ে আছে পাড়ার লোকের থেকে ওইসব শুনবে বলে। তুমি তার আগেই আমাদের বাড়িতে এসে নিজেকে বাসি করে ফেললে কেন?

—এক্সকিউজ মি!

পুরুষকণ্ঠে সম্বিত ফেরে জয়িতার। সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই ভদ্রলোক, যিনি সিট অফার করেছিলেন। কম্পার্টমেন্ট এখন অনেকটাই ফাঁকা। ব্যারাকপুরে প্রচুর প্যাসেঞ্জার নেমে গেছে। রোজই নামে। জয়িতা ভদ্রলোকটিকে বলে, বলুন!

—আমি সুরঞ্জন।

জয়িতা চিনতে পারছে না। ভদ্রলোক জয়িতার কপালে ভাঁজ দেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে বললেন, আমার নামটাও তার মানে আপনি শুনতে চাননি, তার আগেই সম্বন্ধ ক্যানসেল করে দিয়েছিলেন।

বেশ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছে জয়িতা, কোনও রেফারেন্সেই ভদ্রলোককে প্লেস করতে পারছে না। অমায়িক হেসে সুরঞ্জন সাহায্য স্বরূপ বললেন, সেই যে, চুঁচড়ো। বুলবুলির বিয়েতে আপনাকে দেখার পর টানা ফলো করে গেছি। তারপর বাড়ির লোক মারফত আমার পছন্দের কথা জানাই আপনাদের বাড়িতে।

এবার মনে পড়েছে জয়িতার। হেসে ফেলে। জিজ্ঞেস করে, তা, বিয়ে থা করেছেন তো?

—হ্যাঁ, তিনবছর হল।

ভদ্রলোকের গলায় একটু কি বিষাদের ছোঁয়া, নাকি জয়িতার শোনার ভুল? সুরঞ্জন কিন্তু কণ্ঠস্বরকে নির্দিষ্ট একটা পর্দায় রেখে কথা বলছে, পাশের লোক কিছুই শুনতে পাবে না। এই দক্ষতা জয়িতার নেই। ফের সুরঞ্জনই বলে ওঠে, কলেজ স্ট্রিটে আপনাকে মাঝেমাঝেই দেখতে পাই। আপনার অফিসের কাছেই এখন আমার ব্রাঞ্চ। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। দু'বছর হল বদলি হয়ে এসেছি।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—ও। তা আপনি কি এই রুটেই বাড়ি ফেরেন? ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে হয়, তাই প্রশ্নটা করল জয়িতা। উত্তর জানার কোনও আগ্রহ নেই।

সুরঞ্জন বলল, না না, আমার এই রুট হবে কেন! আমি তো চুঁচড়ো, হাওড়া দিয়ে যাতায়াত করি। আজ কাঁকিনাড়ায় এক রিলেটিভের কাছে যাব। তাই এই লোকালটা ধরলাম।

বুঝেছে ভাব করে মাথা নাড়ে জয়িতা। মুখে সৌজন্যের হাসি ধরে রাখে। ট্রেন কোনও একটা স্টেশনে থামল। ফের চলতে শুরু করেছে। সুরঞ্জন বলল, আপনি সম্ভবত এখনও বিয়ে করেননি, তাই না?

—সিঁদুর পরিনি দেখে বলছেন? ইচ্ছে করেই বাঁকা প্রশ্নটা করল জয়িতা। লোকটা মনে হচ্ছে পার্সোনাল কোয়েশ্চেনের দিকে এগোবে।

বিব্রত হয়েও ভাবটা দ্রুত ঝেড়ে ফেলল সুরঞ্জন। বলল, না সিঁদুর আজকাল অনেকেই পরে না। অন্য ধর্মে বিয়ে করলে প্রশ্ন আসে না পরার। স্কিনে স্যুট করে না অনেকের। আমি শেষ যা খবর পেয়েছি, আপনি এখনও বিয়ে করেননি।

—ঠিক শুনেছেন।

একটু সময় নিয়ে সংকোচের সঙ্গে সুরঞ্জন বলে, অনেক দিন ধরেই একটা কথা আপনার কাছে জানতে ইচ্ছে করে। জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাই না। আর কলেজস্ট্রিটে বেশিরভাগ সময় আপনাকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখি, সম্ভবত আপনার কলিগ

—কী জানতে চান, সেটা বলুন। কথা কেটে বলে ওঠে জয়িতা। লোকটা লিমিট ক্রস করেছে। মেজাজ চড়ছে জয়িতার।

একটা ঢোঁক গিলে সুরঞ্জন বলে, 'আপনি যখন আমাকে না দেখেই, সামান্য কৌতূহল প্রকাশ না করেই সম্বন্ধটা ক্যানসেল করে দিলেন, ভেবেছিলাম আপনি এনগেজড। কিন্তু আপনি আজ অবধি সিঙ্গল থেকে গেলেন। তাহলে সম্বন্ধটা নাকচ করার কারণ কি?

লোকটার কৌতূহল কী নিয়ে, এতক্ষণে বুঝতে পারল জয়িতা। বলে ওঠে, ওই যার সঙ্গে আমায় ঘুরতে দেখেন না, ওর সঙ্গেই আমার স্পেশাল রিলেশন আছে। ও তো বিবাহিত, তাই আমার বিয়েটা আর হয়ে ওঠেনি।

পুরো ভেবলে গেছে সুরঞ্জন। সমস্ত স্মার্টনেস উধাও। জোর করে হেসে বলল, এরকম তো হতেই পারে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় জয়িতা। মাথা ঠাণ্ডা করতে ট্রেনের চাকার শব্দে মন দেয়। ইতিমধ্যে বেশ ক-টা স্টেশনে থেমেছে ট্রেন। সুরঞ্জন বলে উঠল, আপনি ফেসবুকে আছেন?

সবিস্ময়ে সুরঞ্জনের দিকে তাকায় জয়িতা। মাথা নেড়ে 'না' জানিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন?

—আপনার সঙ্গে যদি আলাপটা বজায় রাখা যায়, ভালো লাগবে আমার। একটু পজ নিয়ে সুরঞ্জন বলে, আপনার ফোন নাম্বারটা পেতে পারি কি?

—নিন।

সুরঞ্জন সেলফোন বার করল পকেট থেকে। জয়িতা নিজের নাম্বার দিতে গিয়ে একটা ডিজিট ইচ্ছে করে ভুল বলল। সেভ করে নিয়ে সুরঞ্জন বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি একটা মিসড কল দিই। নাম্বারটা সেভ করে রাখুন আমার।

গেরোয় পড়েছে জয়িতা। সামাল দিতে বলে ওঠে, প্লিজ দেবেন না নাম্বার। 'অলরেডি অনেকগুলো সুরঞ্জন সেভড আছে ফোনে। হামেশাই গোলমাল করে ফেলি। একজনকে করব ভেবে অন্যজনের নামে কল দিই। আপনি ফোন করলে, চুঁচড়োর সুরঞ্জন বলবেন, তাহলেই বুঝে যাব।

স্বাভাবিক কারণেই হতাশ হল সুরঞ্জন। মুখে বলল, ও কে, ঠিক আছে। কোন সময় আপনি ফ্রি থাকেন, মানে কখন ফোন করলে আপনাকে ডিসটার্ব করা হবে না।

—ডিসটার্বের কিছু নেই। ব্যস্ত থাকলে ফোন ধরব না।

—না। আপনি দিনের কোন সময়টা অ্যাভেলেবল? রাতে ফোন করতেও আমার অসুবিধে নেই।

ফাঁকা সিটটা হঠাৎ যেন চোখে পড়ল এই ভঙ্গিতে জয়িতা বলে ওঠে, বসার জায়গা হয়েছে। আমি একটু বসি। আপনার কাঁকিনাড়া তো এসে গেল।

—হ্যাঁ, অবশ্যই। বলে সামনে থেকে সরে দাঁড়াল সুরঞ্জন। জয়িতা এগিয়ে গেল ফাঁকা সিটটার দিকে।

'অ্যাভেলেবল' কথাটা আবর্জনার মতো রয়ে গেছে জয়িতার মাথায়। নৈহাটি স্টেশনে নেমে রোজকার মতো সাইকেলস্ট্যান্ড থেকে নিজের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছে জয়িতা। সুরঞ্জন কী ভেবে তাকে কথাটা বলল? বিবাহিত এক পুরুষের কাছে জয়িতা যদি অ্যাভেলেবল হতে পারে, সুরঞ্জনের কাছেই-বা হবে না কেন? দেবাংশুর পরেও যদি একটু আধটু সময় বাঁচে, সেটুকুই অতি বিনয়ের সঙ্গে চেয়েছে সুরঞ্জন। জয়িতা অ্যাভেলেবল বলেই কি দেবাংশু এতদিন রিলেশন চালিয়ে গেছে? এখন বুঝেছে জয়িতা স্ত্রী হওয়ার দাবি জানাতেই পারে। যেহেতু লোপাবউদি নেই। সায়রের মুডের কথা তুলে কীরকম ট্যাক্টফুলি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে। সেদিনের পর থেকে আর কোনও খোঁজ নেয়নি। কাফে থেকে রাগ দেখিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জয়িতা। এখনও অপেক্ষা করে আছে দেবাংশুর ফোনের। তিনি হয়তো ভাবছেন, যাক বাবা, পথের কাঁটা দূর হয়েছে। মেয়েটাকে নিয়ে রাস্তায় ঘোরা যায়, বিয়ে করে বাড়িতে তোলা যায় না মোটেই। জয়িতা তার মানে এতটাই ফেলনা! নাকি জয়িতা অব্রাহ্মণ বলে চ্যাটার্জি বাড়িতে তুলতে অসুবিধে হচ্ছে তার? ওদের ফ্যামিলি যে খুব কনজারভেটিভ, সেরকম তো কোনওদিন কিছু বলেনি। বরং উল্টোটাই বলেছে। বাড়ির লোকের প্রশংসায় সর্বদাই পঞ্চমুখ থাকে সে। ও বাড়ি ছেড়ে দেবাংশু কোথাও গিয়ে বসবাস করতে পারবে না। পরিবারের লোকের সঙ্গে এতটাই ইনভলভড। জয়িতাই মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওবাড়িতে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করার। 'অব্রাহ্মণ' পয়েন্টটা এইমাত্র মাথায় এল। হয়তো এই কারণে দেবাংশুর পরিবার থেকে কিছু তুচ্ছতাচ্ছিল্য অবজ্ঞা জুটতে পারে জয়িতার কপালে। সেখানে জয়িতার সম্মানরক্ষার দায় তো দেবাংশুর। শুধুমাত্র ভালোবেসেছে বলে কত কিছুই তো কনসিডার করছে জয়িতা। লোপাবউদির ফেলে যাওয়া সংসার আর স্মৃতির মধ্যে গিয়ে থাকবে সে। সায়র কিছুতেই তাকে খোলা মনে মেনে নেবে না। ঠেলে দিতে চাইবে দূরে। বাড়ির লোক উঠতে বসতে লোপা বউদির সঙ্গে তুলনা টানবে জয়িতার। এসব জেনে বুঝেও জয়িতা পা বাড়িয়ে আছে ওবাড়ির দিকে। দেবাংশুর কোনও আগ্রহই নেই আমন্ত্রণের। তাহলে কি ওর মনের গভীরে প্রোথিত আছে বর্ণবিদ্বেষ? অবচেতনের সেই বাধাই কি দেবাংশুকে সরিয়ে রেখেছে জয়িতার শরীর থেকে? শরীরী ব্যাপারে আগ্রহ না থাকাটা জয়িতা ভাবত দেবাংশুর অপরাধবোধ। ঘরে বউ আছে। এখন মনে হচ্ছে, তা নয় অন্তর্গত প্রবৃত্তির কারণেই জয়িতাকে দূরে সরিয়ে রাখত সে। তাহলে কি ভুল মানুষকে ভালোবেসেছিল জয়িতা? চার বছরের সম্পর্কে কত মধুর, সুখের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

স্মৃতি আছে তার। সেসব তার মানে মিথ্যে? সোনা ভেবে পরা ঝুটো গয়নার মতন।...চোখ জ্বালা জ্বালা করছে জয়িতার। পাশ দিয়ে যাওয়া বাস, লরির ধোঁয়ায়, নাকি নিজের প্রতি করুণায়?

মাথা নিচু করে সাইকেল চালাচ্ছে জয়িতা। মুখ তোলে, আকাশের ঢালে কৃষ্ণপক্ষের ফালি চাঁদ। যেন তারই মতো ব্রাত্য হয়ে পড়ে আছে। এই চাঁদ নিয়েই অপূর্ব এক স্মৃতি আছে জয়িতার। দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো সেদিন। বাড়িতেও পুজো হবে। এদিকে অফিস থেকে বলেছে একটা পার্টি অ্যাটেন্ড করতে। বিগ নিউজ পেপার হাউস তাদের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে পার্টি দিচ্ছে বড় হোটেলে। অনুষ্ঠানটা এড়িয়ে যেতে পারত জয়িতা, দেবাংশুর থেকে যখন শুনল 'প্রভাতী' কাগজের প্রতিনিধি হয়ে সেও যাবে, পার্টিতে যাওয়াই সাব্যস্ত করল জয়িতা। গর্জাস শাড়ি পরে খুব সেজেছিল সেদিন। একটাই উদ্দেশ্য, দেবাংশু তো রোজ আমাকে ফর্মাল ড্রেসে দেখে, সাজলে কেমন দেখায়, আজ দেখবে।

পার্টিতে গিয়ে দেখে উলটো ছিরি, জয়িতার ঝলমলে সাজের কারণেই দেবাংশু রয়ে গেল দূরে দূরে। সে সাজেনি গোজেনি। অফিসে যা পরে আসে, তাই পরে চলে এসেছে। সেদিন পরনে ছিল বুকের প্রথম বোতাম খোলা ইন না করা শার্ট আর সাধারণ ট্রাউজার। পায়ে কাবলি চটি। কখন যে কেটে পড়ল পার্টি থেকে, টেরই পায়নি জয়িতা। মনটা একটু দমে গেলেও জয়িতা এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, যাক আমার পারপাস তো মিটে গেছে। সাজলে কেমন দেখায় আমাকে, দেখে নিয়েছে সে।

বাড়ি ফিরে তখন সাজ ছাড়েনি জয়িতা, ফোন করেছিল দেবাংশুকে, কী ব্যাপার, আজ ওরকম এড়িয়ে এড়িয়ে থাকলে কেন?

—উরে বাবাঃ, যা সেজে এসেছিলে, পাশে গেলে নিজেকে চাকরবাকর মনে হত।

—সাজটা একটু উৎকট হয়ে গিয়েছিল, তাই না?

—না না, দারুণ লাগছিল। ছোট্ট একটা অপূর্ণতা ছিল শুধু।

—কী?

—একটা টিপ পরলে পারতে।

—এ মা, তখনই বলবে তো। ব্যাগেই ছিল, ওয়াশরুমে গিয়ে পরে নিতাম।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—তুমি কি ড্রেস ছেড়ে ফেলেছ?

—না, কেন? বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো। লোকজন চলে গেলে ছাড়ব।

—তুমি বাড়ির কোথা থেকে কথা বলছ?

—উঠোনে দাঁড়িয়ে।

—আকাশের দিকে তাকাও, পূর্ণিমার চাঁদটা পরে নাও কপালে।

—বুঝেছি। কবিতা হচ্ছে। আমি চাঁদটা পরে নিলে, লোকজন তো পূর্ণিমার সুন্দর সন্ধে, রাতটা মিস করবে। কথা বলতে বলতে জয়িতা চলে এসেছিল পাঁচিলের দরজায়। চোখ গিয়েছিল ঝিলের জলে। উৎসাহ ভরা গলায় ফোনের ওপ্রান্তে থাকা দেবাংশুকে বলেছিল, আইডিয়া। আমাদের বাড়ির পাশে ঝিলের জলে চাঁদটা পড়ে আছে। ওটাই পরে নিই, কী বলো? কাউকে বঞ্চিত করা হবে না।

—ভেরি নাইস! এক্ষুনি পরে নাও। এরপর থেকে তোমার নাম হবে লক্ষ্মীপূর্ণিমা। লক্ষ্মীপূর্ণিমা নাগ।

পরে নামটা ধরে বেশ কয়েকবার ডাকতে গেছে দেবাংশু, জয়িতার ভালো লাগেনি কানে। বলেছে, সব সিচুয়েশনে ওই নাম মানায় না। ন্যাকা ন্যাকা লাগে। বাবা, মা যে নাম দিয়েছে, ওই নামেই ডেকো।

বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে জয়িতা। দোকানে দু'চারজন কাস্টমার দেখা যাচ্ছে। বাড়ির গায়ে কাঁচা রাস্তায় ঢোকার আগে নেমে পড়ে সাইকেল থেকে। ঝিলের জলে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটার দিকে তাকায়। লক্ষ্মীপূর্ণিমা নাগ হিসহিস শব্দে বলে ওঠে, ওই টিপ যখন তুমি আমায় পরিয়েছ, চাঁদের দিব্যি, তুমি আমার। কিছুতেই ছেড়ে যেতে দেব না।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সাত

আজ সকালে বাবাকে অদ্ভুত মুডে দেখল সায়র। একটু বুঝি অপ্রকৃতিস্থ। একইসঙ্গে বেশ আকর্ষণীয়। সকালে হাঁটতে গিয়েছিল মাঠে। ইদানীং রোজই যায়। সায়রের কথামতো মোবাইল ফোনটা সঙ্গে রাখে। ঘুম থেকে উঠে সায়র আজ বারান্দায় এসে টিয়াটাকে জ্বালাচ্ছিল। সেই কোন ভোর থেকে মায়ের নাম ধরে ডেকে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিল পাখিটা। বাবা বারান্দা ধরে হেঁটে এল। হাঁটায় বেশ চনমনে ভাব। কাছে এসে বলল, বুঝলি সায়র, কাল রাতে একটা মজার স্বপ্ন দেখলাম। তবে ভীষণ টেনশনের।

কন্ট্রাডিক্টারি কমেন্ট। সায়র জানতে চায়নি, কী স্বপ্ন। বাবা নিজেই বলতে লাগল, তুই, আমি আর তোর মা রাজধানী বা দুরন্ত এক্সপ্রেসে কোথাও একটা যাচ্ছি। দিল্লি ধরে নে। কেন ধরবি, সেটা পরে বলছি। তো ট্রেনটা স্টেশনহীন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে। আমি, তুই নেমেছি কিছু একটা কিনতে। দূরে দু'একটা দোকানপাট। আমাদের মাথায় আছে ট্রেনটা অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। কোন সূত্রে আছে, স্বপ্নে তো সব ক্লিয়ার হয় না। যাইহোক জিনিস কিনে ফিরছি, দেখি ট্রেনটা চালু হয়ে গেছে। এগিয়ে যাচ্ছে বেশ স্পিডেই। ট্রেনের ভিতর তোর মা। তুই, আমি হতচকিত হয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

খানিকক্ষণ দৌড়োলাম ট্রেনটা লক্ষ করে। চোখের সামনে দেখলাম শেষ বগিটাও দূরে চলে গেল। তারপর দেখছি একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করে আমরা দু'জনে রোড ধরে চলেছি। ড্রাইভার আশ্বাস দিয়েছে পরের স্টেশনে ট্রেনটাকে ধরিয়ে দেবে। পরের স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল ট্রেন অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। একগাদা টাকা দিতে হল ড্রাইভারকে। প্রায় বারোশোর মতো। আশ্চর্য দেখ, অ্যামাউন্টটা আমার সাধ্য অনুযায়ী এসেছিল স্বপ্নে। এবার হল কী, ড্রাইভারের মনোযোগ দিয়ে নোট গোনার ধরন দেখেই বুঝতে পারলাম, আমাদের ঠকিয়েছে। ও জানত ট্রেনটা আমাদের ধরাতে পারবে না। টাকাটা কামিয়ে নেওয়ার জন্যই আশ্বাসটা দিয়েছিল।

খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম দুজনে। আমি ভাবছি, দিল্লির মতো বড় স্টেশনে, রাজধানীর স্টেশন বলে কথা, তোর মা কীভাবে চেকারকে ফাঁকি দিয়ে বেরোবে। টিকিট তো রয়ে গেছে আমার পার্সে। দুশ্চিন্তায় ভেঙে গেল ঘুম। তারপর শান্তি। যাক বাবা, স্বপ্ন ছিল এটা।

—টেনশনটা তো বুঝলাম। এর মধ্যে মজার কী পেলে? সত্যিকারের কৌতূহল থেকে জানতে চেয়েছিল সায়র।

বাবা বলল, মজা মানে, এই একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি আমরা। ব্যাপারটা একদম রিয়েল বলেই মনে হচ্ছিল।—একটু থেমে বাবা বলেছিল, হ্যাঁরে, সত্যিই যদি এরকম কারোর ঘটে, তোর মায়ের মতো। কী করবে সে?

—রিজার্ভেশনটা রেলের বুকিং কাউন্টার থেকে হবে, না ই-টিকিট? পালটা প্রশ্ন করেছিল সায়র।

বাবা বলল, স্বপ্নে তো এই ইনফর্মেশনটা ছিল না। কোন টিকিট হলে সুবিধে হয়?

—ই-টিকিট হলে কোনও ঝামেলা নেই। টিকিটের ইন ডিটেল মেসেজ আসবে তোমার সেলফোনে। মেজেটা মাকে ফরোয়ার্ড করে দিলে, সেটা দেখিয়ে গেট ক্রস করতে পারবে মা। বলতে বলতে সায়র টের পাচ্ছিল সে-ও বাবার স্বপ্নটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। ঘোরটা যাতে পেয়ে না বসে, তাই তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলে গিয়েছিল।

খানিক বাদে চা করে নিয়ে এল বাবা। সায়র কম্পিউটারে বসে মেল চেক করছে। টেবিলে চায়ের কাপ দিয়ে বাবা বলল, ভাবছি, ক-টা দিন আদিত্যর গ্রামে কাটিয়ে আসি। তুইও চ না। তোকে ওরা খুব ভালোবাসত।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—আমি তো বলেছি, হবে না আমার। চাপ আছে কলেজে। তুমি ঘুরে এসো। বলেছিল সায়র।

বাবা বলল, যাই তাহলে, একাই ঘুরে আসি। ওদের কাছে একা গেলে অস্বস্তির কিছু নেই। ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা অন্যরকম। তোর কোনও অসুবিধে হবে না তো একা থাকতে?

—একা কোথায়? বাড়িভর্তি লোক। বাড়তি বিস্ময় যোগ করে কথা বলেছিল সায়র।

বাবা আর কিছু বলেনি। চলে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে। মানুষটাকে বেশ আলাদারকম মনে হয়েছিল। এরকম ঢিলেঢালা, উদাসীন টাইপের আগে কখনও লাগেনি। মা মারা যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন স্বভাবের বদল দেখা গিয়েছিল, তবে সেটা এরকম নয়। গুম মেরে থাকত, সবসময় কী যেন একটা ভাবছে। সায়রের মনে হত, মাথায় কোনও বদমতলব ঘুরছে নাকি? সুইসাইড-ফুইসাইড করে ফেলবে না তো? বাবাকে তাই চোখে চোখে রাখত সায়র। সেই ফেজটা কেটে গিয়ে বাবা নর্মালভাবে যাতায়াত করতে থাকল অফিসে। সায়র নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তখন তো আর জানত না ঘাপটি মেরে বসে আছে জয়িতা নাগ। এই উৎপাতটা কীভাবে ট্যাকল করবে, এখন অবধি ভেবে বার করতে পারেনি সায়র। ওঁর সঙ্গে কামিং সানডেতে দেখা হচ্ছে, কী বলবে বাবার বান্ধবীকে? করজোড়ে বলবে, প্লিজ, আপনি বাবার জীবন থেকে সরে দাঁড়ান। মায়ের স্মৃতি আর বাবাকে নিয়ে আমি বেশ ভালো আছি। মায়ের শোক সামলে আছি অনেকটাই। আপনি মাঝে এসে পড়লে আমার লাইফটা তালগোল পাকিয়ে যাবে।

সায়রের অনুরোধ কেন রাখতে যাবেন মহিলা? নিজের লাইফ তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তো এই দিনটার স্বপ্ন দেখতেন। মা না থাকলে বিয়ে করতে পারতেন বাবাকে। সিচুয়েশন যখন তাই দাঁড়াল, চান্সটা ছেড়ে দেবেন কোন আক্কেলে। রিকোয়েস্টের বদলে সায়র যদি হুমকি দেয়। বলে, রিলেশনটা ছেড়ে বেরিয়ে না এলে আপনার লাইফ হেল করে দেব আমি। ওবাড়িতে গেলে অতিষ্ঠ করে ছাড়ব।

চ্যালেঞ্জটা যদি নিয়ে নেন মহিলা। বাবা যদি ওঁর ফরে থাকে, কোথায় মুখ লুকোবে সায়র? একটাই রাস্তা ছিল মহিলাকে সরিয়ে দেওয়ার, মার্ডার। সেটা তো সায়রের পক্ষে সম্ভব নয়, বুঝেই গেছে। গুণ্ডা-মস্তান দিয়ে থ্রেট

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দেওয়ালে কাজ হবে না, ভেবে দেখেছে আগে। বাবার সহানুভূতি বাড়বে। শেল্টার নিতে ভদ্রমহিলাও তড়িঘড়ি চলে আসবেন চাঁদপাড়ার বাড়িতে। আর কোনওভাবে যদি ফাঁস হয়ে যায়, কাণ্ডটা কে ঘটিয়েছে, বাবার দৃষ্টিতে অনেকটাই নীচে নেমে যাবে সায়র। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে, কোনও সলিউশন না পেয়ে সায়র বুঝল নিজের থাকার জায়গাটা আগেভাগে ঠিক করে রাখা ভালো। মহিলাকে যদি না আটকানো যায়, চলেই আসেন চাঁদপাড়ার বাড়িতে। সায়র আর ওখানে থাকবে না। পাকাপাকিভাবে থাকার আর একটাই জায়গা আছে সায়রের, চন্দননগরে দাদুর বাড়ি। আজ কলেজ না গিয়ে ওখানেই গিয়েছিল সায়র। দাদু-দিদুকে একটা হিন্ট দিয়ে আসার জন্য। মেন্টাল প্রিপারেশনের সময় পাবে দুজনে। ট্রেনে করে যায়নি, বাইক নিয়ে গিয়েছিল। এখন ফিরছে। স্পিডে চালাচ্ছে গাড়ি। হিমিকা ফোনে ডেকে পাঠিয়েছে। সন্ধের আগে ফিরতে হবে। ট্রেনে করে এলেই ভালো হত, এই রাস্তায় প্রচুর রেলের লেভেল ক্রসিং পড়ে আর জ্যাম তো আছেই।

দুপুরে সায়রকে হঠাৎ উদয় হতে দেখে দাদু-দিদু অবাক, কী ব্যাপার, এতদিন পর, এইসময়। কোনও বন্ধু-টন্ধুর বাড়ি এসেছিলি নাকি?

দিদুর প্রশ্নের উত্তরে সায়র বলেছিল, তোমাদের দেখতে এলাম। আর দেখতে এলাম আমার থাকার জায়গা। কিছুদিনের মধ্যেই আমি এই ফ্ল্যাটে পার্মানেন্টলি চলে আসছি।

—চলে আয় না। কে বারণ করেছে। বুড়োবুড়ি মিলে থাকি, ভয়ও করে। কার কখন কী হয়ে যায়।

দিদুর কথা শেষ হতেই দাদু এন্ট্রি নিয়েছিল, তুই তো আমাদের কথা ভেবে আসছিস না, ও বাড়িতে কেন থাকতে চাইছিস না সেটা আগে বল।

—ও বাড়িতে প্রচুর হইচই। পড়াশোনার ডিসটার্ব হয় আমার।

—বাজে কথা বলিস না। তোদের যৌথ পরিবার হলেও, হইচই একেবারেই হয় না। হইচই করার মেয়েটাও চলে গেছে। গানবাজনাও বন্ধ। ফলস এলিগেশন না এনে সত্যি কথাটা বল। ওবাড়ির কারোর সঙ্গে কি মনোমালিন্য হয়েছে?

দাদুর কথায় সায় দিতে মন চায়নি সায়রের। ওবাড়ির সকলেই তাকে ভালোবাসে। এখানে থাকতে এলে, লুকিয়ে আসতে হবে। ওরা সায়রকে ছাড়বে না। সায়র বুঝে গিয়েছিল দাদুকে পট্টি পরানো যাবে না। তাই অন্য

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

রাস্তা নিতে হল। বলেছিল, কার সঙ্গে কী হয়েছে, কেন আসতে চাইছি, অত জবাব দিতে পারব না। তোমরা আমায় থাকতে দেবে কিনা বলো? আমার কি এখানে থাকার অধিকার আছে?

—অবশ্যই আছে। কারোর ওপর রাগ করে চলে আসছিস, রাগ পড়লেই ফিরে যাবি। মাঝখান থেকে আমাদের দু'জনের থাকার অভ্যেসটা চলে যাবে। ফাঁকা লাগবে তুই চলে গেলে।

দাদুর কথার পিঠে সায়র বলেছিল, আমি লিখে দিচ্ছি পার্মানেন্টলি এখানেই থাকব, তুমি ফ্ল্যাটের অর্ধেকটা আমার নামে লিখে দাও। পরে কোনও ঝামেলায় পড়তে চাই না।

—হাফ কেন, পুরোটাই লিখে দেব। তোর বিদেশে থাকা মামা এই ফ্ল্যাটের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। ফ্ল্যাটের হাফ পোর্শানের মূল্য ওর কাছে নস্যি। বলার পর দাদু বোঝানোর সুরে বলেছিল, তোর বাবার কথাটা ভাব। সদ্য বউ হারিয়েছে, এরপর তুই চলে এলে বড় একা পড়ে যাবে।

বিদ্রূপের হাসি চলে এসেছিল সায়রের ঠোঁটে, প্রকাশ হতে দেয়নি। যার কারণে সায়র এখানে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার প্রতিই সহানুভূতি জানাচ্ছে দাদু। এমনকী দিদুর এক্সপ্রেশানও সায় দিচ্ছে দাদুর কথায়। বাবার কীর্তি এদের বলা যাবে না, বিয়েটাকে রিকগনেশন দেওয়া হয়ে যাবে। সায়র তাই বলছিল, বাবাকে দেখার লোক ওবাড়িতে অনেকেই আছে। একা লাগবে না। আর হ্যাঁ, আমি যে এখানে আসার প্ল্যান করেছি, বাবাকে জানাবে না তোমরা। যখন বলার মনে হবে, আমিই বলব। হঠাৎ একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে আসব এখানে। সঙ্গে আমাদের পাখিটাও থাকবে।

—পাখিটা কেন? বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চেয়েছিল দিদু।

সায়র বলেছিল, পাখিটার ঠিকঠাক যত্ন হচ্ছে না ওবাড়িতে। তাই নিয়ে আসব।

মিথ্যেটা কেন বলল, জানে না সায়র। বাবা যথেষ্টই খেয়াল রাখে পাখিটার। সে তো মায়ের প্রতিও রাখত। সায়রের কেন জানি মনে হচ্ছে, বাবা এবার একদিন খাঁচার দরজাটা খুলে দেবে।

দাদু-দিদার সামনে থেকে উঠে গিয়ে সায়র তিনরুমের ফ্ল্যাটটার নিজের রুম বাছতে গিয়েছিল। গেস্টরুমটাই সবচেয়ে ভালো। দক্ষিণ খোলা, ছোট্ট

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

একটু ঝুল বারান্দাও আছে। দাদু-দিদুকে পছন্দের কথা জানিয়ে দিল সায়র।

বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে বেরোয়নি, দাদু-দিদুর সঙ্গে খেতে বসেছিল সায়র। দিদু মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কাঁদছিল। বলছিল, দাদুসোনা, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে ভালোই লাগবে। তোমাকে ছুঁয়ে থাকলে মনে হয় মেয়েকেই ছুঁচ্ছি। তবু বলব বাবার সঙ্গে কথা বলে নিয়ে এসো। যতই হোক তুমি ওদের বাড়ির ছেলে। তোমার ওপর ওবাড়ির অধিকার বেশি।—একটু থেমে চাপা হা-হুতাশের স্বরে বলেছিল, কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল। সুস্থসবল হাসিখুশি মেয়েটা চলে গেল হঠাৎ করে। এতটুকু বুঝতে দেয়নি!

দিদুর এই কমেন্টটায় ছোট্ট করে হোঁচট খেয়েছিল সায়র। আরও অনেক কিছুই বলছিল দিদু, সেসব আর মাথায় ঢোকেনি। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কমেন্টটার মধ্যে দিয়ে কি দিদু কোনও সন্দেহ প্রকাশ করে ফেলল? সচেতনভাবে করেনি, অসতর্কতায় বেরিয়ে গেছে। সায়রের মনের গভীরেও এরকম একটা সন্দিগ্ধতা বাসা বেঁধে রয়েছে, অল্প জায়গা জুড়ে, বাবা কৌশল করে মাকে সরিয়ে দেয়নি তো? সায়র এটা একটু হলেও ভাবতে বাধ্য হচ্ছে, বাবার দ্বিতীয় সম্পর্কের কথা জানতে পারার পর। আর কিছুদিনের মধ্যেই বাবা যদি জয়িতা নাগকে বিয়ে করে, একই সন্দেহ করবে সায়রদের চেনা পরিচিতরা। কিন্তু সায়র নিজের বাবাকে যতদূর চেনে, এত নিষ্ঠুর প্রকৃতির নয়। এটা একেবারেই ন্যাচারাল ডেথ। কখনও কখনও সন্দেহ গিয়ে পড়ে জয়িতা নাগের ওপর, কায়দা করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে মাকে অথবা ফোনে উত্ত্যক্ত করত কি? সংসারে অশান্তি হবে ভেবে মা এসব কথা বাবাকে জানায়নি। একা সহ্য করে গেছে। অসম্ভব সহ্যশক্তি ছিল মায়ের। শরীরের ব্যথা যন্ত্রণার কথা মুখ ফুটে বলত না। এক্সপ্রেশন থেকে অনেক কষ্ট করে বুঝে নিতে হত। একবার টিয়াটা মায়ের আঙুল কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। মা বলে বেড়ালো কুটনো কুটতে গিয়ে কেটেছে। মেজজেঠু সায়রকে আলাদা ডেকে বলেছিল, তোর মায়ের আঙুল পাখিটা কামড়ে ধরেছিল। আমি দেখেছি। বলে বেড়াচ্ছে বঁটিতে কেটেছে। পশুপাখিকে অত লাই দিতে নেই। নাম ধরে ডাকে বলে তোর মা গলে যায়। আরে বাবা, ওকে যদি লোপার বদলে সোমা বলে ডাকতে শেখানো হয়, তাই ডাকবে...তবু পাখিটাকে এবাড়িতে নিয়ে আসবে সায়র। পাখিটাই তো

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

একমাত্র সোচ্চারে মায়ের নাম ধরে এখনও ডাকে। জয়িতা নাগ কি মায়ের সহ্যশক্তিকে পরাস্ত করে দিয়েছিলেন? তাই-বা কী করে হয়, মারা যাওয়ার আগের দিনও মা বেশ হাস্যোচ্ছল ছিল। রাতে খেতে বসে কত গল্প করল আমার আর বাবার সঙ্গে। মনখারাপ থাকলে কি ওই মুডে থাকে কেউ? তাই জয়িতা নাগের ওপর সন্দেহটা ঠিক দানা বাঁধে না। পরের দিন বাবা চিৎকার করে ডেকে উঠেছিল, সায়র, তাড়াতাড়ি আয়, তোর মায়ের ঘুম ভাঙছে না।

সেদিনটা আর মনে করতে চায় না সায়র। আজ দাদু দিদুর কাছে খাওয়াদাওয়ার পর গেস্টরুমে টানটান হয়ে শুয়েছিল। ফোন এল হিমিকার, কোথায় আছিস রে?

—কলেজে। বলে দিয়েছিল সায়র।

সিরিয়াস গলায় হিমিকা বলল, ঢপ দিবি না। কলেজে যাসনি জানি।

—কী করে জানলি?

—বলব না। তুই কি আমার জন্য আজ অন্তত খানিকটা টাইম স্পেয়ার করতে পারবি?

'টাইম স্পেয়ার'-এর মতোন বিনয়ী অনুরোধ তো করে না হিমিকা! নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল সায়র; বড় কিছু ঘটল নাকি? পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, অনেকদিন হল দেখা করছে না হিমিকার সঙ্গে, এটা হয়তো অভিমানের বুলি। সায়র বলেছিল, পারব। হাফ অ্যান আওয়ার লাগবে। কোথায় যাব, তোদের বাড়ি?

—না। তোদের বাড়ির পাশে মাঠটায় চলে আয়। আমি ওয়েট করছি।

—ওখানে কেন?

—আয়, তারপর বলছি। বলে ফোন কেটে দিয়েছিল হিমিকা। সায়রের মাথায় এখন একরাশ চিন্তা, কলেজে যায়নি, হিমিকা জানল কীভাবে? কলেজের কারোর ফোন নাম্বার নেই তো ওর কাছে! নাকি আছে? সায়রের গতিবিধি জানার জন্য কারোর থেকে নিয়ে রেখেছিল নাম্বার? বাড়িতে না ডেকে মাঠে দেখা করতে চাইছে কেন? কথাগুলো কি বাড়িতে বলা যাবে না? তা হলে কি যে জন্য ডাকছে, তার সঙ্গে বাড়ি জড়িয়ে আছে? হিমিকার মা কি বাবার ব্যাপারটা মেয়েকে জানিয়ে দিলেন? এবার মেয়ে নিজের ডিসিশন জানাবে সায়রকে। সিদ্ধান্তটা যে সায়রের পক্ষে যাবে না, হিমিকার গলার স্বর শুনেই বোঝা গেছে। সায়র কলেজে না গিয়ে কোথায় আছে,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জানার আগ্রহ দেখাল না। তাহলে কি সম্পর্কটা চুকিয়ে দিতে চাইছে হিমিকা? আজকেই ব্রেক আপ!...রাস্তা ফাঁকা পেলেই বাইকের স্পিড বাড়াচ্ছে সায়র। জিটি রোড না ধরে দিল্লি রোড দিয়ে ফিরলে ভালো হত। এত জ্যাম, ক্রসিং-এ আটকাতে হত না। বাইক কেনার সময় মা পইপই করে বলে দিয়েছিল, কিছুতেই হাইওয়েতে যাবি না। কথা দে।

হিমিকার সঙ্গে রিলেশন কাট হওয়ার ব্যাপারটা জাস্ট ভাবতে পারে না সায়র। অসম্ভব ভালোবাসে হিমিকাকে। ওর উপস্থিতি, এমনকী ফোনে শোনা কণ্ঠস্বরও সায়রের স্নায়ুতন্ত্রীতে সুর হয়ে ধরা দেয়। হিমিকা যেন এমন একটা মিউজিক, বারবার শুনেও শোনা শেষ হয় না। পৃথিবীর আলো বাতাসের মতোই সায়র হিমিকার সঙ্গেও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আলো, বাতাস, হিমিকার মধ্যে কোনও একটা না থাকলে সায়র দমফাঁস অবস্থায় পড়বে। সায়র আলাদা কোনও প্রয়াস নেয়নি হিমিকাকে পেতে। মেঘ যেভাবে আদুরে আলস্যে ছোঁয় পাহাড়ের কোনও লেক, সেইভাবেই সায়রের জীবনে এসেছিল হিমিকা। আলাপের সূত্রও মিউজিক। ভানুদার গিটার ক্লাস থেকে বেরিয়ে সায়র ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছিল চাঁদপাড়ার বইমেলায়। স্টেজে তখন মিউজিক সিস্টেম চালিয়ে নাচের অনুষ্ঠান চলছে। নাচছে এলাকার মেয়েরা। বইয়ের মেলায় এই ধরনের অনুষ্ঠান একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না সায়রের। মেলা কমিটি ভিড় টানার দোহাই দিয়ে যদি-বা নাচগানের ফাংশান করেন, গান মিউজিক সিস্টেমে বাজবে কেন? নাচের মেয়েদের মতোন এলাকার গায়ক গায়িকারা সুযোগ পাক। তাহলে নিজেদের এলাকার কালচারকে খানিকটা প্রমোট করা হয়। ওই নাচের অনুষ্ঠান দেখতে একটাই কারণে রাজি হয়েছিল সায়র, বন্ধুরা বলেছিল সঞ্জয় উকিলের মেয়ে নাকি নাচবে, মানে হিমিকা। মেয়েটাকে তার আগে দেখেছে বটে সায়র, ফলো করা বা ওকে নিয়ে কিছু ভাবার সাহস পায়নি। কারণ, সে ডানা লুকিয়ে রাখা পরির মতো সুন্দরী এবং ডাকাবুকো, পয়সাওলা বাবার একমাত্র সন্তান। বইমেলার মাঠে দাঁড়িয়ে স্টেজে সাইকেডেলিক আলোর রঙিন আবছায়ায় চলা গ্রুপ ড্যান্সের মধ্যে হিমিকাকে খুঁজছিল সায়র। পাশ থেকে এক বন্ধু বলেছিল, গ্রুপে তো নেই দেখছি। তবে ওর একটা সোলো আছে বলছিল।

মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা সায়রের বাকি বন্ধুদের সঙ্গে হিমিকার আলাপ ছিল। বন্ধুত্বের ছল করে মিশত ওরা। সকলের মনেই হিমিকাকে পাওয়ার

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বাসনা ছিল। গ্রুপের পর শুরু হল সোলো ড্যান্স, হিমিকাই এল স্টেজে। সায়রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুরা রীতিমতো উত্তেজিত। হয়তো সিটি মেরে দিত। কিন্তু এমন একটা বিষাদভরা গানের সঙ্গে নাচছিল হিমিকা, ওদের ঠোঁটে আঙুল ওঠেনি। মিউজিক সিস্টেমে বাজছিল নুসরত ফতেহ আলি খানের গজল, ফিউশন। স্টেজে দুর্ধর্ষ লাগছিল হিমিকাকে। কিন্তু নাচ আর গানের মধ্যে কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। ঠিকঠাক সিনক্রোনাইজ হচ্ছিল না। হিমিকার সোলো শেষ হওয়ার পর শুরু হল আরও একটা গ্রুপ পারফর্মেন্স। হঠাৎ দেখা গেল নাচের সাজ সুদ্ধু হিমিকা মাঠ ধরে এগিয়ে আসছে। সামনে এসে আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠার সঙ্গে সায়রের পাশে দাঁড়ানো বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল, কেমন হল রে?

দারুণ, সুপার্ব, ইউনিক এরকম আরও কয়েকটা বিশেষণে হিমিকাকে অভিনন্দন জানাল সায়রের বন্ধুরা। সায়র চুপ করে আছে দেখে হিমিকা জানতে চেয়েছিল, তোমার কেমন লাগল, বললে না তো!

সায়র আর্টের ব্যাপারে মিথ্যাচরণ করতে পারে না। তাই বলে দিয়েছিল, নাচের মধ্যে গানের ফিলটা ঠিক আসছিল না।

—কী করে আসবে, আমি কি হিন্দি উর্দু ভালো বুঝি? কাবেরীদি যেমন শিখিয়ে দিয়েছে, সেটাই নকল করলাম। ভনিতা ছাড়াই নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়েছিল হিমিকা।

অ্যাপ্রোচটা পছন্দ হয়েছিল সায়রের। পরামর্শ দেওয়ার সুরে সায়র বলেছিল, গানটা মন দিয়ে বারবার শুনবে, তাহলেই ফিল চলে আসবে। এ গানের মানেও এমন কিছু কঠিন নয়।

—তুমি একটু গাইবে গানটা। গান তো তুমি গাও। বাঙালি উচ্চারণে মানেটা সহজে ধরতে পারব।

হিমিকার আবদারটা সায়রকে বেকায়দায় ফেলার জন্য, বোঝাই যাচ্ছিল। একইসঙ্গে সায়র উৎসাহবোধ করছিল, মেয়েটা তার খবর রাখে। সায়র গান গায়, জানে। ক্লাস ফেরত বলে গিটার সঙ্গেই ছিল, নুসরত ফতেহ আলির গানটাও তার জানা এবং খুব প্রিয় গান। গিটার বাজিয়ে গানটা শুরু করে দিয়েছিল সায়র, সায়া ভি সাথ জব ছোড় যায়ে এইসি হ্যায় তনহাই/রোনা চাহুঁ তো আঁসু না আয়ে এইসি হ্যায় তনহাই...গাইতে গাইতে সায়র দেখছিল হিমিকা কখন যেন নাচতে শুরু করে দিয়েছে। প্রাণ দিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

গানটা গাইছিল সায়র। ওদের ঘিরে ছোটখাটো ভিড় ক্রমশ জমা হচ্ছিল। সায়রের গান শেষ হতেই তুমুল ক্ল্যাপ। হিমিকা নাচ থামিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে ছুটে পালিয়েছিল। যেন সন্ধের আকাশে হাততালি দিয়ে ওড়ানো হল পায়রা।

বন্ধুদের প্রশংসা, উৎসাহপ্রদান কানে নিয়ে বইমেলার মাঠ থেকে বেরোতে বেরোতেই ঘটনাটা ভোলার চেষ্টা করছিল সায়র। একটু আগে যেটা ঘটে গেল, একটা ইমোশনাল ইন্সিডেন্স। এর ওপর ভরসা করে হিমিকাকে নিয়ে কিছু ভাবতে বসে গেলে পরে হতাশ হতে হবে।

দু'দিন যেতে ঘটনাটার জলছাপটুকু লেগেছিল সায়রের মনে। কলেজ থেকে ফিরে কম্পিউটারে বসেছে। নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার পর চোখে পড়ে ছোট্ট একটা মেসেজ, আমি আরও অনেক গানের ফিল পেতে চাই। শোনাবে?—হিমিকা।

সায়র উত্তর দিল, দেখা হলে সারাক্ষণ গান গাইতে হবে নাকি?

উত্তর এল, কিছু গান মনে মনে গাইলেও হবে। আমি ফিল করে নেব।

এইভাবে আলাপ গড়িয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মায়ের গানের ক্লাসে এসেছিল হিমিকা। ওর অনুরোধে সায়রকে নিয়ে আসতে হয়েছিল। মায়ের গানের সঙ্গে হিমিকা নাচল। সেদিন রাতে মা সায়রকে বলেছিল, তোদের মধ্যে প্রেম হয়েছে, না রে? নীরব থেকে মায়ের কথার সমর্থন জানিয়েছিল সায়র। ফের মা বলেছিল, মেয়েটা ভালো। বিয়ে একেই করিস।

—এখনই বিয়ের কথা! ও এখনও কলেজে গেল না, আমি সবে ঢুকলাম! বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠেছিল সায়র।

মা বলেছিল, বিয়ে ওকেই করবি ধরে নিয়ে প্রেমটা করবি। তাহলে রিলেশনের মধ্যে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে।

মায়ের অ্যাডভাইসটা মানসিক স্থিতি দিয়েছিল সায়রের। অন্যান্য কাপলরা যেমন শারীরিক সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়ে, সায়র তা করেনি। হিমিকার থেকে পাওয়া ভালোবাসাটা কৃপণের মতো খরচা করছে। হিমিকা তো আরও স্ট্রিক্ট। সায়র একদিন কিস করতে চেয়েছিল ওঁর ঠোঁটে, রাজি হয়নি হিমিকা। বলেছিল, এত তাড়া কীসের? আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। নাকি স্ট্যাম্প জমানোর মতো কোন কোন মেয়েকে ক-টা করে কিস করলি, ডায়রিতে গিয়ে লিখে রাখবি?

রিলেশনটাকে রেসপেক্ট করার কথা হিমিকাকে কেউ বলেছে কিনা,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জানে না সায়র। হয়তো নিজের অনুভব থেকেই করে। শীতের নলেন গুড় আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে ছোটবেলায় যেমন খেত সায়র, হিমিকা সেইভাবেই খরচ করে ভালোবাসা।

আজ থেকে ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করা যাবে না হিমিকার থেকে। প্রেমিকের বাবা যখন এই কেলো করছে, বউ থাকতে প্রেম। বউ মরতেই অল্পবয়সি প্রেমিকাকে ঘরে তোলার ফিকির। সেই লোকটার ছেলেকে কেন শ্রদ্ধা করতে যাবে হিমিকা। বাবার চরিত্রদোষ যে ছেলের রক্তে বইছে না, কে গ্যারান্টি দেবে ওকে?

চাঁদপাড়ায় ঢুকে পড়েছে সায়র। আধঘণ্টা বলেছিল, একটু বেশিই লাগল বোধহয়। শীতের শুরু, পুরোপুরি সন্ধে নেমে গেছে। মিট করার জায়গা হিসেবে কেন যে মাঠটা বেছে নিল হিমিকা! একা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, সন্ধে নেমে গেলে কোনও মাঠই সেফ নয়। নেশাভাঙ করতে জড়ো হয় চ্যাংড়া ছেলেরা।

বাইক নিয়ে সোজা মাঠে ঢুকে পড়ল সায়র। হেডলাইটের আলোতে দেখা গেল হিমিকাকে। ওকে ঘিরে কুয়াশা। গাড়ির লাইট অফ করে হিমিকার কাছে পৌঁছোল সায়র।

বাইক স্ট্যান্ড করে হেলমেট খুলে ঝুলিয়ে দিল হ্যান্ডেলে। হিমিকার সামনে দাঁড়িয়ে সায়র বলল, বল, কী হয়েছে?

—তুই পিস্তল জোগাড় করেছিস কেন? কাকে খুন করবি? গায়ে গুলি লাগলেও এত সারপ্রাইজড হত না সায়র। বোঝাই যাচ্ছে কথাটা কার থেকে শুনেছে হিমিকা। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সায়র হেসে বলে, ধুর, ওসব ইয়ারকি। জোক করেছি রনোর সঙ্গে। রনোই বলেছে তো তোকে? কীভাবে যোগাযোগ করল?

—যেভাবেই করুক, তোর ভালো চায় বলে করেছে। কেন মিথ্যে বলেছিস ওকে? আমার পিছনে নাকি গুণ্ডা লেগেছে! ব্যাপারটা যে জোকস নয়, রনোর থেকে বেশি বুঝছি আমি। কিছুদিন ধরেই তোর মধ্যে একটা চেঞ্জ এসেছে। স্টাডির ধুয়ো তুলে আমার সঙ্গে দেখা করছিস না। তোর চেঞ্জেস নিয়ে কাকাবাবু এত ওরিড, আমার কাছে খবর নিতে চলে এলেন। কী হয়েছে সত্যি করে বল?

সায়র মাথা নিচু করে নিয়েছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সত্যি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বললে রিলেশনটা থাকবে না কোনওভাবেই। সহ্য করতে পারবে না হিমিকা। রনোটা ভালো করতে গিয়ে কতবড় সর্বনাশটা যে করল...

—স্পিক আউট সায়র। টেল মি ফ্র্যাঙ্কলি। নো নিড টু হেজিটেট। যে কোনও কথা শুনতে আমি রেডি আছি। কিছু লুকোস না প্লিজ।

সায়র বিরক্তি দেখিয়ে বলে ওঠে, বললাম তো ওসব কিছু নয়, জাস্ট শো অফ। বন্ধুদের কাছে হিরোইক ইমেজ তৈরি করা। ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি। পিস্তল-ফিস্তল কিস্যু আমার কাছে নেই।

—তাহলে কন্ট্রাক্ট কিলারের কাছে গিয়েছিলি কেন? কিছু একটা বদ মতলব নিশ্চয়ই ঘুরছে মাথায়।

রনো দেখা যাচ্ছে কিছুই বলতে বাকি রাখেনি। সায়র চুপ করে থাকে। দু'পা এগিয়ে আসে হিমিকা। সায়রের দু কাঁধে নিজের দুটো হাত রেখে বলে, কথায় আছে লাভ ইজ লাইকিং সামওয়ান বেটার দ্যান ইউ লাইক ইয়োরসেল্ফ। আমি আমার থেকেও তোকে বেশি ভালোবাসি। তোর কোনও ক্ষতি হোক কিছুতেই চাই না। তোর মাথায় কী চলছে আমায় খুলে বল।

এতেও কোনও উত্তর না পেয়ে আরও কাছে চলে আসে হিমিকা। বলে, কিস মি। তুই চেয়েছিল আগে, খেতে দিইনি। আজ কিস কর। আমি জানি তুই আমাকে কিস করার পর একটাও মিথ্যে কথা বলতে পারবি না।

অনেক চেষ্টা করেও কান্নাটা আটকাতে পারল না সায়র। দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে ওঠে। হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে সায়রের কান্নার জল লাগা ঠোঁটে ঠোঁট রাখে হিমিকা। অনেকক্ষণ ধরেই থাকে লিপলক অবস্থায়। ঠোঁট ফিরিয়ে নিয়ে হিমিকা বলে, এবার বল।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আট

—দাও। আমি প্যাক করে দিচ্ছি। মেজজেঠু ওপরে তোমায় ডাকছে। বলল সায়র।

আর একটু পরেই আদিত্যর গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে দেবাংশু। ব্যাগ গোছাচ্ছিল। সায়রের কথা শুনে বলল, মেজদার আবার এখন কী দরকার পড়ল! বকিয়ে টাইম খেয়ে নেবে। এদিকে লেট হচ্ছে আমার।

বিছানার ওপর রাখা লাগেজ ব্যাগের কাছে এসে দাঁড়াল সায়র। বলল, শুনে এসো। বলেছি, তুমি বেরোবে।

গোছানো ছেড়ে ঘর থেকে বেরোয় দেবাংশু। সায়র প্যাকিংটা ভালো করে। মায়ের থেকে পেয়েছে স্বভাবটা। দেবাংশু প্যাকিং-এর ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি। সে যতটা সময় নিত তার থেকে অনেক কম সময়ে গুছিয়ে দেবে সায়র।

সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠে এল দেবাংশু। মেজদা ছাদে নেই। তার মানে ঘরে রয়েছে। দেবাংশু দরজা লক্ষ করে এগোয়।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে, মেজদা কাঁচি দিয়ে খবরের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কাগজ থেকে কাটিং বার করছে। পাশে ডাঁই করা কাগজ, ঠোঙা বানানোর। দেবাংশু গলা ঝাঁকি দিয়ে বলে, বলো, কী বলবে? আমি বেরোব এক্ষুনি।

মেজদা কাগজ থেকে কাটা কাটিংটা এগিয়ে দেয়। বলে, পড়ে দেখ।

কাটিংটা নিয়ে চোখ বোলায় দেবাংশু, 'পাত্র চাই বিজ্ঞাপন। পাত্রীর চাহিদার কারণে মেজদা কাটিংটা দেখতে দিল দেবাংশুকে। মোটামুটি যা লেখা আছে, পাত্রী চাকুরিরতা, ডাক্তারের মতামত অনুসারে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা প্রায় নেই। বিপত্নীক, সন্তানসহ সুপাত্র চাই। পাত্রের বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলে ভালো হয়। পাত্রীর বয়স পঁয়ত্রিশ।...পড়া শেষ করে খানিকটা বিরক্তি নিয়ে মেজদার দিকে তাকায় দেবাংশু। অসন্তোষ গায়ে না মেখে মেজদা বলে, তোর দু'বছর বেশি। মনে হয় আটকাবে না। এরকম পাত্র চট করে পাওয়া যাবে না। কাগজটাও বেশি দিনের নয়। ঠোঙা করার জন্য কিনে এনেছিলাম। বল তো যোগাযোগ করি।

—নিজের জন্য করো যোগাযোগ। আমার তো তবু একবার বিয়ে হয়েছে। ঠেস দেওয়ার সুরে বলল দেবাংশু।

মেজদা বলল, অ্যাডটা কি ভালো করে পড়লি না! লিখেছে, বিপত্নীক এবং সন্তান চাই। আমার কোথায় সেসব।

—তোমাকে কি বারণ করা হয়েছিল বিয়ে করতে?

—বিয়ে সবার জন্য নয় রে। সংসার করার আলাদা একটা যোগ্যতা লাগে। আমার সেটা নেই। তুই পরীক্ষিত, সুখে সংসার করতে পেরেছিস। এখনও অনেকটা দিন বাঁচবি। তোর পাশে একটা মেয়ের খুব দরকার। তোর একা থাকাটা ঠিক সম্পূর্ণ নয়, অবলম্বনহীন।

—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে বিয়ে নিয়ে। লোপা যেভাবে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, সংসারের কথা আর মাথায় আসে না।

—এমন ভাবে দোষ দিচ্ছিস, যেন লোপা অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে আছে। ঘটে গেছে, যা ঘটার ছিল। বাকি জীবনটা কি তুই অতীত আঁকড়ে বাঁচবি?

বিজ্ঞাপনের কাটিংটা মেজদার সামনে রাখে দেবাংশু। বলে, দেখতে দেখতে সায়র কত বড় হয়ে গেল। কেরিয়ার কীভাবে গড়বে, সেইদিকেই এখন আমার লক্ষ্য। ওটাই আমার একমাত্র কাজ।

—সায়রের কাছে তোর বিয়ের প্রসঙ্গটা তুললাম।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বিশেষ আগ্রহ ছাড়া সাধারণ কৌতূহলে দেবাংশু জিজ্ঞেস করে, কী বলল সায়র?

—বলল, ওর কোনও আপত্তি নেই। মা বেঁচে থাকতে বাবা তো কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করছে না। ফলে অরাজি হওয়ার কোনও যুক্তি নেই। তবে তোর বিয়ে হলে ও এবাড়িতে থাকবে না। মামার বাড়িতে চলে যাবে। সেটাই স্বাভাবিক, অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে সে। পঁয়ত্রিশ বছরের একটা মেয়েকে মায়ের জায়গা দিতে তার তো অস্বস্তি হবেই।

—তা হলে দেখেছ, সায়র ছাড়া আমি কী করে থাকব!

মেজদার পিছনের জানলাটা পুরো খোলা ছিল না, ঘুরে গিয়ে খুলে দেয় মেজদা। একরাশ সকালের রোদ এসে পড়ে ঘরে। আগের পজিশনে বসে মেজদা মুখ তুলে বলল, প্রত্যেক মানুষের জীবন আলাদা, জগৎ আলাদা। সায়রকে নিজের জগতে ছেড়ে দে। ইন্টারফিয়ার করিস না। নিজেও আর বাঁচিস না অতীতে। মৃত্যু সবসময় ব্যক্তির নিজের। লোপার মৃত্যুতে তুই যেমন মরে যাসনি, তোর মৃত্যুতেও কেউ মরবে না। অথচ তুই মৃতের জগতে বাস করছিস, ছেলেকেও করাচ্ছিস। বেঁচে থাকা বলতে, মানুষের এমন একটা কিছু রয়ে গেছে যা এখনও হয়নি। সেই বাকিটুকু তুই সম্পূর্ণ করতে চাইছিস না। হাসপাতালের ভেন্টিলেশনে শুয়ে নিশ্বাস নিচ্ছিস।

মেজদার কথা শেষ হতেই দরজার দিকে ঘুরে গেল দেবাংশু। এই তর্কের শেষ নেই। মেজদা বলে যাচ্ছে, বিজ্ঞাপনের মেয়েটার কথাও একবার ভাব। দুঃখী মেয়ে, বাচ্চা-কাচ্চা হবে না। কী লক্ষ্মীশ্রী মুখটায়। কার না কার পাল্লায় পড়বে! সে ব্যাটা হয়তো বউকে খুন করে বিপত্নীক সেজে বসে আছে।

শেষ কথাটা কানে লেগে রইল দেবাংশুর। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবে, মেজদা কি কিছু মিন করল? এতক্ষণ তো দেবাংশুর হয়েই কথা বলছিল। মেজদাকে বোঝা মহা ভার।

লোকাল ট্রেন ধরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেছে দেবাংশু। আদিত্যদের গ্রামে যাওয়ার জন্য স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে যেতে হবে। সাউথ ইস্টার্ন লাইনের মেল ট্রেনটা ছাড়বে ওখান থেকেই। হাতে মাত্র

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পনেরো মিনিট। মেজদার কারণেই দেরিটা হল। এমন আবোলতাবোল বকতে শুরু করল বেরোনোর মুখে, মাথা পুরো ঘেঁটে গেল। সায়রটাও বেশ ফাজিল হয়েছে। দেবাংশু ওপর থেকে নেমে দেখে ব্যাগ গোছানো রেডি। ছেলেকে বলেছিল, ভেরি গুড। মনে হচ্ছে পেয়ে যাব মেলটা।

সায়র বলে উঠছিল, কী, রাজি হলে?

মুহূর্তখানেক সময় লেগেছিল কথাটা বুঝতে। তারপর হেসে ফেলেছিল দেবাংশু। বলেছিল, তোর পাগলা জেঠুর কথা বাদ দে তো।

তবে মেজদার বিক্ষিপ্ত কথাগুলোর মধ্যে জীবনব্যাপ্তির একটা ইশারা ছিল। সত্যিই তো দেবাংশু ইদানীং ক্রমশ ছোট হয়ে আসা গণ্ডির মধ্যে বাঁচছে। মরে যখন যাচ্ছে না, বাঁচতেই যদি হয় অনেকদিন, আর একটু খোলামেলা ভাবে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাঁচা ভালো। বেড়াতে যাওয়ার দরকারটা মেজদাই প্রথম মাথায় ঢুকিয়েছিল। আজ তার সঙ্গে জোগান দিল আরও অনেকটা অক্সিজেন। বাড়ি থেকে বেরোনোর পরই বেশ একটা ফুরফুরে ভাব ঘিরে রয়েছে দেবাংশুকে। বেড়াতে যাওয়াটাকে আর একা যাওয়ার মতো লাগছে না। একা অবশ্য থাকতে হবে চার ঘণ্টা। বেলদা স্টেশনে ভাড়া গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে আদিত্য। ট্রেন থেকে নামার পর বাস, ট্রেকার, রিকশার কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। ওদের বাড়ির পাশে একজন নাকি গাড়ির বিজনেস করে, ওটা নিয়েই রিসিভ করতে আসবে। আদিত্যকে ফোনে 'কটা দিন তোর কাছে গিয়ে থাকব ভাবছি' বলতেই ও প্রবল বিস্ময়ে বলে উঠেছিল, সত্যিই আসবি! চলে আয়। ক-টা দিন কেন, বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে চলে আয়। গ্রামের জলহাওয়ায় মোটা করে বাড়ি ফেরাব।

আদিত্যর সঙ্গে অনেক কথাই হল, একবারও কিন্তু লোপার প্রসঙ্গ টানল না। জানে, দেবাংশুর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা এখন ওটাই। দূর থেকে ফোনে ওটার মেরামত করা যাবে না। কাছে গিয়ে পৌঁছলে স্বাভাবিক-ভাবেই লোপার কথা এসে পড়বে। তখন কথাগুলো হবে অনেক আন্তরিক।

অফিস থেকে ছুটি নেওয়ার পর আদিত্যকে যখন যাওয়ার দিন জানাল দেবাংশু, আদিত্য খেয়াল করিয়ে দিয়েছিল, আমার এখানে ফোনের টাওয়ার সহজে পাওয়া যায় না, মনে আছে তো। আমার নাম্বারটা দিয়ে রাখিস বাড়িতে। খোঁজখবর নিতে পারবে।

আদিত্যর ফোনের টাওয়ারই-বা কী উপায়ে পাওয়া যাবে, জানে না

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দেবাংশু। লাস্ট যেবার আদিত্য, মালবিকার সঙ্গে দেবাংশু ফ্যামিলি নিয়ে শশিন্দায় গিয়েছিল। মোবাইল ফোন সঙ্গে ছিল কিনা, মনে করতে পারল না। সায়রকে আদিত্যর নাম্বারটা দিয়ে এসেছে দেবাংশু। কী মনে হতে জয়িতাকেও নাম্বারটা দেওয়ার জন্য ফোন করেছিল। কর্তব্যের তাগিদেই হয়তো দিয়েছে, হঠাৎ যদি দরকার পড়ে দেবাংশুকে, নাম্বারটা থাকলে যোগাযোগ করতে পারবে। নাম্বার নিয়ে জয়িতা ঠাণ্ডা নিরাসক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, কবে যাচ্ছ?

যাওয়ার দিন, কোথায় যাচ্ছে কোন ট্রেনে যাচ্ছে সবই বলেছে দেবাংশু। ফেরার দিনটা শুধু বলতে পারেনি। জয়িতাও চায়নি জানতে। অফিস থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়েছে। দু'দিন থেকে যদি মনে হয়, ফিরে যাই, ফিরে আসবে দেবাংশু। তেমন ভালো লাগলে সাতদিনও থেকে যেতে পারে। সায়রকে সেরকমটাই বলে রেখেছে।

নিউ কমপ্লেক্সে চলে এসেছে দেবাংশু। ডিসপ্লে বোর্ডে দেখে নিয়েছে গাড়ি দিয়েছে বাইশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। বাইশের মুখে পৌঁছোনোর আগেই থমকে গেল পা, হ্যালুসিনেশন নয়তো? শাড়ি পরা জয়িতা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পায়ের কাছে রাখা লাগেজ।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দৃশ্য যখন একই রয়ে গেল, দেবাংশু বুঝল দৃষ্টিবিভ্রম নয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জয়িতার সামনে। বুঝতে পারছে জয়িতা তার সঙ্গে যাবে বলেই বেরিয়ে পড়েছে? শিওর হওয়ার জন্য দেবাংশু জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় চললে?

—তুমি যেখানে যাচ্ছ। বলেছিলে না, দু'জনেরই যখন আউটিং-এর প্রয়োজন, চলো এক জায়গাতেই যাই।

—আর বাড়ি। বাড়িতে কী বললে?

—তোমাকে ভাবতে হবে না। নিজের দায়িত্বে বেরিয়েছি।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

নয়

দশবছর আগে আদিত্যর গ্রামের বাড়িটা যেমন দেখে গিয়েছিল দেবাংশু, তেমনই আছে। অথচ আদিত্য বলছে ইংরেজির এল শেপের মাটির এই দোতলা বাড়িটা দু'বার বন্যায় ভেঙে গিয়েছিল, এল-এর লম্বা দাঁড়ির দিকটা। দু'বার নতুন করে তুলতে হয়েছে। শেষবার লম্বা দাঁড়ি বেশ কিছুটা ছোট হয়েছে, উঁচু হয়েছে দালান। দেওয়াল মাটি কঞ্চিরই আছে, ভিতরে লুকানো সিমেন্টের পিলার। দেবাংশু কিন্তু স্মৃতিতে থাকা বাড়িটার সঙ্গে কোনও তফাত করতে পারছে না। সেই প্রশস্ত উঠোন। ভিটে ঘিরে কোনও বেড়া নেই। উঠোনের ওপর দিয়েই মানুষজন যাতায়াত করছে। পাশেই পুকুর। খুব বড় নয়। তাল, সুপুরি, নারকোল গাছ ঘিরে আছে পুকুরটাকে। বাড়ির কিশোরীকে যেন আগলে রেখেছে। বাড়ি, উঠোন ঘিরে নানান ফুল গাছ। গাঁদাগুলো এখনও বড় হয়নি। দু'একটাতে অবশ্য ফুল এসে গেছে। বাড়ির পিছন দিকটা গোয়াল। গরু এখন একটাই। তারপর আম-জাম-কাঁঠালের বাগান। কোথাও কোনও বদল নেই। বাড়িতে ঢোকার মুখে পুকুরধারে বিশাল বাঁশবনটাও আছে। এল-এর ছোট দাঁড়ির মাথার দিকটায় এখন বসে আছে দেবাংশু। গায়ে চাদর। এখানে বেশ শীত। দালানের

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ওপর কাঠের লম্বা বেঞ্চের পিঠের দিকটায় হাত রেখে দেখছে সন্ধে নেমে যাওয়া বাঁশবন। জোনাকি জ্বলছে বনের ভিতরে, ভেসে আসছে ঝিঁঝির ডাক। বাঁশবনের ওপারে শিয়ালের দল এসে ডেকে গেল দু'বার। নিজেকে কেমন যেন জীবন্ত আয়না মনে হচ্ছে, আয়নার থেকেও আরও উন্নত কিছু, কেননা ছবির সঙ্গে ধ্বনি ধরা পড়ছে অস্তিত্বে। বেঁচে আছি, জানানটা নিজেকেও দিতে হচ্ছে না। প্রয়াসহীন শান্তজীবন। সময়ের সঙ্গে ছুটে যাওয়ার ব্যাপার নেই। দেবাংশুর এরকম একটা ছুটির সত্যিই ভীষণ দরকার ছিল। জয়িতা সঙ্গে না এলে আরও নিখাদ হত ছুটিটা। খানিকটা অ্যাটেনশন তো চলেই যাচ্ছে জয়িতার দিকে। ওর এখানে কেমন লাগছে, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা? যতই হোক জয়িতা এসেছে দেবাংশুর বন্ধুর বাড়ি, অসুবিধের দায় দেবাংশুর ওপর বর্তায়। দুপুরে এখানে আসার পর থেকে এখন অবধি বেশ খুশিই আছে দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে মালবিকার সঙ্গে টিভি দেখছে। মাটির ঘরে বসে টিভি দেখা জয়িতার কাছে প্রথমবার। দুপুরে এদের ভিটেতে পা রেখেই জয়িতা চাপা উচ্ছ্বাসে বলে উঠেছিল, এ তো একেবারে রিসর্ট গো!

দেবাংশু আর বলেনি, এ সবের নকল করেই রিসর্ট বানায়। তুমি এটাকেই রিসর্টের নকল বলছ! মালবিকার সঙ্গে যে এই প্রথম দেখা হল জয়িতার, দুজনকে দেখে সেটা মালুম হওয়ার উপায় নেই। অদ্ভুত আন্তরিকতায় একে অপরকে কাছে টেনে নিয়েছিল। আদিত্যর বেলায় একই ব্যাপার ঘটেছে, স্টেশনে এসে যখন রিসিভ করল দেবাংশুদের, জয়িতার দিকে তাকিয়ে এমন হাসল আদিত্য, যেন সেই কবে থেকে চেনে।

জয়িতার সঙ্গে ট্রেনে উঠে দেবাংশু প্রথমেই ফোন করেছিল আদিত্যকে, আমার সঙ্গে একটা মেয়ে যাচ্ছে, তোদের বাড়িতে কোনও অসুবিধে হবে না তো?

ওপ্রান্ত থেকে বিষম বিস্ময়ে আদিত্য বলে উঠেছিল, তোর এত উন্নতি হয়েছে! মেয়ে ফিট করে বেড়াতে বেরিয়েছিস!

—ফিট করে নয়। জয়িতার সঙ্গে চার বছরের সম্পর্ক। জেদ করে উঠে পড়ল ট্রেনে।

—কোনও প্রবলেম নেই। চলে আয়। জয়িতার গ্রামের পরিবেশ ভালো লাগবে তো? খুব শহুরে মেয়ে কি?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

—মনে হচ্ছে লাগবে। বাকি কথা হবে পরে। বলে ফোন ছেড়ে ছিল দেবাংশু।

আশেপাশের প্যাসেঞ্জারের কানে কথাগুলো যাতে না যায়, সেইজন্যই দেবাংশু ট্রেনের দরজার কাছে গিয়ে ফোন করেছিল আদিত্যকে। দূরে সিটে বসা জয়িতা অনিশ্চয়তার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। দেবাংশু ফিরতে জিজ্ঞেস করল, রাজি হল? আমি গেলে কোনও সমস্যা হবে না তো ফ্যামিলিতে?

—বলল তো হবে না। ফ্যামিলিতে এখন কে কে আছে, তাও জানি না। আমার জানানোর কথা, জানিয়ে দিয়েছি। এরপর আদিত্যর দায়িত্ব। বলেছিল দেবাংশু।

জয়িতার আড়ষ্টতা কাটেনি। গোটা ট্রেন জার্নিতে বেশ চুপচাপ, একটু যেন গুটিয়ে ছিল। দু'জনে বেলদা স্টেশনে নামার পর হইহই করে এগিয়ে এসেছিল আদিত্য। দেবাংশুকে একবার বুকে জড়িয়ে নিয়ে জয়িতাকে বলেছিল, এত ছোট লাগেজ কেন? দশদিনের আগে কিন্তু যেতে দিচ্ছি না।

মুহূর্তে জয়িতার সব জড়তা উধাও। মুখে সহজ হাসি। আদিত্যর সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা ছিল জয়িতার। দেবাংশু আদিত্যর অনেক গল্প করেছে জয়িতার কাছে। দু'জনের আলাপ জমতে সময় লাগেনি। স্টেশন থেকে ভাড়াগাড়িতে ওঠার আগে দরকারি কথাটা জেনে নিয়েছিল দেবাংশু, পাশে জয়িতা ছিল। আদিত্যকে দেবাংশু জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ রে, তোর বাড়িতে জয়িতার কী পরিচয় দেব?

—বাড়ির ভিতরের লোক বলতে এখন তিনজন। আমি, মালবিকা জয়িতার পরিচয় জানি। মালবিকাকে বলেছি জয়িতার কথা। আর রইল ঠাকুমা...

কথা এখানে আসতেই দেবাংশু অবাক হয়ে বলে উঠেছিল, ঠাকুমা এখনও বেঁচে আছেন! আগে যখন দেখেছিলাম পঁচাশি ছিয়াশি...

—বেঁচে আছে, বেশিদিন থাকবে বলে মনে হয় না। চোখ পুরোটাই গেছে। কানেও শোনে না। জয়িতাকে লোপা বলেই চালিয়ে দিস। লোপার খবরটা ঠাকুমাকে দিইনি। কারোর চলে যাওয়ার খবর শুনলে বেশ কিছুদিন মনমরা হয়ে থাকে। ঘুরেফিরে একটা কথাই বলে যায়, আমি ভগবানের এতই অপ্রিয়! একে একে চেনাজানা মানুষদের ডেকে নিচ্ছে, আমায় নিচ্ছে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

না। ঠাকুমার কথা বলার পর আদিত্য বলেছিল, লোপা তো খুব অল্পবয়সে চলে গেল, বেশি কষ্ট হত ঠাকুমার।

দেবাংশুর মনে হয়েছিল, মানুষে মানুষে কী অদ্ভুত সম্পর্ক। লোপাকে আদিত্যর ঠাকুমা একবারই দেখেছে। আদিত্য, দেবাংশুর ঘনিষ্ঠতা ঠাকুমা জানে, সেইসূত্রে লোপা ঠাকুমার কত কাছের হয়ে গেল। এইসব পুরনো মানুষরা জগৎ থেকে যত চলে যাচ্ছে, আলগা হয়ে যাচ্ছে মানুষকে জড়িয়ে থাকা মায়ার বন্ধন।

জয়িতাকে লোপার পরিচয়ে পরিচিত করানো হল ঠাকুমাকে। বিছানায় শুয়ে ছিলেন। চেহারা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। আদিত্য কানের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, ও ঠাকুমা, দেবাংশু, লোপা এসেছে।

মুখের পেশিগুলো কেঁপে উঠেছিল ঠাকুমার। দেবাংশু, জয়িতা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। শুয়ে থাকা অবস্থায় কাঁপা হাত বাড়িয়ে দেন, চিবুক ছুঁতে চাওয়ার ভঙ্গি। দেবাংশুরা মুখ এগিয়ে দিয়েছিল। চুমু খেয়ে খিনখিনে গলায় কী যেন বললেন! কথাটা পরিষ্কার করল আদিত্য। বলল, জিজ্ঞেস করছে, ছেলেকে কেন আনলি না? কীরকম সব মনে রেখেছে দেখ!

একটু গলা তুলে দেবাংশু ঠাকুমাকে বলেছিল, ছেলে অনেক বড় হয়ে গেছে। বাবা-মার সঙ্গে ঘুরতে তার এখন লজ্জা করে।

বুড়ি আদৌ কিছু শুনতে পেল কিনা, কে জানে! এরপর আদিত্য বলেছিল, তোরা এদিক ওদিক একটু ঘোর। আমার একটা মিটিং আছে। দুপুরে খাওয়ার সময় এসে জয়েন করছি।

—কোথায় ঘুরব! সেই দশবছর আগে এসেছিলাম। কিছু মনে আছে নাকি?

—পা চালাতে থাক। দেখবি আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। বলে সাইকেল চড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আদিত্য। জয়িতা মালবিকাকে রিকোয়েস্ট করল, চলো, আমাদের সঙ্গে।

'আপনি' থেকে 'তুমি'তে প্রথম সাক্ষাতে নামিয়ে এনেছিল মালবিকা। ঘোরার ব্যাপারে বলল তার রান্না আরও অন্যান্য কাজ বাকি আছে। দেবাংশুরা যদি বলে, ছোট কোনও ছেলেকে সঙ্গে দিতে পারবে। সে দেখিয়ে আনবে আশপাশ।

দেবাংশু রাজি হয়নি। দুই কিশোর উঠোনের গাছের পরিচর্যা করছিল।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ওদের থেকে বড় একটা ছেলে জাল ফেলছিল পুকুরে। দেবাংশুদের জন্যই হয়তো ধরছে মাছ। আরও দু'জন ঘোমটা দেওয়া মহিলাকে বাড়ির এটা ওটা কাজ করতে দেখা গেল। এরা সব আদিত্যদের প্রায় বাড়িরই লোক। সারাদিন থাকে, খায়দায়। রাতে শুতে যায় নিজেদের বাড়িতে। আগের বার এর চেয়ে বেশি লোক দেখেছিল। এরা এত নিশ্চুপ, নির্বিকার, জয়িতা সত্যিই দেবাংশুর বউ কিনা, তাই নিয়ে মাথাও ঘামাবে না...ওদের কথা বলতে বলতে জয়িতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল দেবাংশু। প্রথমেই গেল কেলেঘাই নদীর খালের দিকে। আদিত্যদের ভিটে ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোলেই খাল। বাঁশের সরু সাঁকোটাও দেখা গেল। খালের জল এখন এতটাই কম, একটা বক জলের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল স্থির হয়ে। বর্ষায় এই খালের জল বেড়ে গিয়ে ভাসিয়ে দেয় গোটা গ্রাম। দু'বার বাড়ির একটা অংশ পড়ে গেছে আদিত্যদের। খালটাকে দেখলে এখন একথা বিশ্বাসই হবে না।

আগেরবার এসে সাঁকো পেরোনো হয়নি। লোপা ভয় পাচ্ছিল। এবার জয়িতাকে নিয়ে পার হল দেবাংশু। খালের ওপারে অন্যগ্রাম শুধু নয় জেলাও পালটে যায়। ওটা পূর্ব মেদিনীপুর। সোহাগপুর গ্রামের নাম। নামটা এমন, জয়িতা বলল, তুমি বানাচ্ছ।

অনেকটা দূর হেঁটে গিয়েছিল দেবাংশুরা। কোনও জনবসতি চোখে পড়ল না। খালটা বেঁকে গিয়ে চলছিল পাশে পাশে। উঁচু নিচু জমি, আবছা পথরেখা। এই পথ ধরে আদিত্যদের ভিটে দিয়ে দু'গ্রামের বা বলা ভালো দুই জেলার মানুষ যাতায়াত করে। হাঁটতে হাঁটতে এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল দুজনে, প্রায় জঙ্গল। আকাশ ছুঁতে চাওয়া সব গাছ, ঢালুতে খালের তিরতির জল। কী ভীষণ নিস্তব্ধ চারপাশ। আড়াল থেকে মাঝে মাঝে কুবো পাখির কুব কুব ডাক। গহিন প্রকৃতি। দাঁড়িয়ে পড়েছিল জয়িতা। আদিত্যদের ভিটে পার হওয়ার পর থেকে হাত তো ছাড়েইনি। তখন দেবাংশুর বুকে রাখল মাথা। দুহাতে দেবাংশুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এখানে কেউ জিজ্ঞেস করতে আসবে না, আমি তোমার কে হই।

ঘুরেটুরে ভিটেয় ফিরতে, দেখা গেল আদিত্যও চলে এসেছে। লুঙ্গি, খালি গা, গামছা ঝোলানো গলায়। বলল, আমি স্নানে যাচ্ছি। তোরাও সেরে নে। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।

পুকুরঘাটে নামার আগে হঠাৎ জরুরি কথাটা মনে পড়েছিল আদিত্যর।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, সায়র ফোন করেছিল তুই ঠিকঠাক পৌঁছেছিস কিনা জানতে।

আশঙ্কার ছায়া নিশ্চয়ই প্রকটভাবে প্রকাশ হয়েছিল দেবাংশুর মুখে। তাই আদিত্য আশ্বাসের সুরে বলেছিল, আর কেউ এসেছে, বলিনি।

আদিত্যদের পাকা বাথরুম টয়লেট আছে। এমনকী শাওয়ার, গিজার, কমোড সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থা মজুত। আদিত্য ফিরে গেছে গ্রামজীবনের অভ্যেসে। পুকুরে চান, যে আদিত্য লুঙ্গি পরা দু'চক্ষে দেখতে পারত না, বন্ধুদের মধ্যে ও ছিল সবচেয়ে ড্রেস কনসাস। বড়লোক মামাদের টাকায় তখনকার দিনে সবচেয়ে নামী কম্পানির জিনস, টি শার্ট পরত। ঘরে দুধসাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, হাওয়াই চটি—সেই আদিত্যর বিপুল চেঞ্জ! পুরো গ্রামের মানুষ হয়ে গেছে। আগের মতো গায়ের রংও আর নেই। তামাটে মেরে গেছে।

স্নান-টান সেরে দুপুরে খেতে বসার সময় দেখা গেল। ঠাকুমাকে দোলনায় বসানো হয়েছে। সকালের মতো অত অসুস্থ লাগছিল না। মালবিকা বলল, দুপুরে স্নান-খাওয়া করিয়ে দোলনায় বসিয়ে দিই। পিঠে রোদটা লাগে। নিজেও কখনও সখনও উঠে এসে বসার চেষ্টা করেন। শুয়ে থাকতে ওঁরও মন চায় না। লোকজন ভালোবাসেন খুব।

দারুণ রান্না করেছিল মালবিকা। বাড়ির পুকুরের টাটকা মাছ। রান্নায় সাবেকি স্বাদ। এমন রান্না কোথায় শিখেছে, জিজ্ঞেস করতে বলল, ঠাকুমা মুখে বলে বলে শিখিয়েছেন। তাছাড়া এখানকার চাল, ডাল, আনাজপাতি, মশলা সব ফ্রেশ, সেই কারণেই স্বাদ আরও ভালো হয়।

খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে ঠাকুমার সামনে দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছে জয়িতা, উনি বললেন, পেট ভরে খেয়েছ মা?

জয়িতার ছায়াশরীর আন্দাজ করেই বললেন। দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট ছিল না। দেখতে পান না চোখে। কথা তখন অনেকটাই স্পষ্ট। জয়িতা বলেছিল, খুব ভালো খেয়েছি। শুনলাম, আপনারই শেখানো সব।

—নাতবউ ওরকম বলে। যাতে সবাই আমার দিকে তাকায়। দেখে, বেঁচে আছে বুড়িটা। একটু দম নিয়ে আদিত্যর ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা কোথায় কোথায় ঘুরলে? জয়িতার সঙ্গে রীতিমতো গল্প জুড়ে দিলেন আদিত্যর ঠাকুমা। আদিত্য, দেবাংশু টান টান হল বিছানায়। দেবাংশু বলেছিল, তোর ঠাকুমার মাথা কিন্তু এখনও দারুণ কাজ করছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

আক্ষেপের সুরে আদিত্য বলেছিল, বয়স শরীরটাকে বুড়িয়ে দিলেও, মাথার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। শরীরটার জন্য একটা তাজা মাথা চলে যাবে।

আদিত্য বেশিক্ষণ শোয়নি। উঠে পড়ে বলল, কাজ আছে রে, বেলদায় যেতে হবে। উকিলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

—তোর কোনও কেস চলছে নাকি? জানতে চেয়েছিল দেবাংশু। আদিত্য বলল, আমার নয়, গ্রামের একজনের। তাকে নিয়ে যেতে হবে। ফিরতে হয়তো সাতটা আটটা, তার বেশি নয়।

ন'টা বেজে গেছে। এখনও ফিরল না আদিত্য। চা না খেয়েই বেরিয়ে গেছে। বিকেলে যখন চা খাওয়া হচ্ছে, দেবাংশু মালবিকাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কী নিয়ে এত ব্যস্ত আছে আদিত্য? আমাকে সময়ই দিতে পারছে না। কোথায় আড্ডা দিতে এলাম ওর সঙ্গে, স্থির হয়ে বসছেই না সামনে।

মালবিকা আদিত্যর কাজের যা খতিয়ান দিল, দেবাংশু শুনে থ। আশপাশের চারপাঁচটা গ্রামের সে এখন মুরুব্বি। সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দল করে না। সকলে ওকে মানে, মধ্যস্থতার জন্য ডাকে। নিজের জমির চাষবাসের ওপর সমান নজর আদিত্যর। চাষে.লাভ হয় খুব সামান্য। জমি বিক্রি করে ব্যাঙ্কে ফিক্স করলে চাষের লাভের থেকে সুদ বেশি পাওয়া যাবে। তবু জমি বিক্রি করবে না। বলে, আমার জমিতে কিছু মানুষ খেটে খাচ্ছে, এটা কি কম বড় সৌভাগ্যের কথা!

দেবাংশু বেশ বুঝতে পারছে, গ্রাম থেকে কেন ফেরেনি আদিত্য। পিতৃত্বের অভাবটা পুষিয়ে নিচ্ছে গ্রামের লোকজন, জমির ওপর অভিভাবকত্ব করে।

মালবিকা বলছিল, বলে গেছে আটটায় ফিরবে, এখন দেখো ক-টা হয়।

আদিত্য না থাকাতে অসুবিধে কিছু হচ্ছে না। চারপাশ ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হলেও, এদের বারান্দায় আলো জ্বলছে। ঘর থেকে ভেসে আসছে টিভি সিরিয়ালের কথোপকথন। আদিত্য থাকলে গল্প-আড্ডা হত। দু'রাতের বেশি থাকা হবে না এখানে। জয়িতা বাড়িতে বলে এসেছে বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছি, রবিবার রাতে ফিরব।

দেবাংশু বলেছিল, তুমি চলে যেও। আমি আরও ক-টা দিন এখানে থেকে যাই।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সবেগে মাথা নেড়ে প্ল্যান নাকচ করে দেয় জয়িতা। বলে আমি কোনও রিস্ক নিতে রাজি নই। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে তুমি এখানে চিরকালের জন্য থেকে যাও, আর আমি ওখানে একা একা কাটাই আর কি!

পায়ের আওয়াজ পেয়ে পিছনে ঘাড় ফেরায় দেবাংশু, চাদরে মাথাসুদ্ধু ঢাকা দিয়ে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়িতা। বলল, বেশ ঠাণ্ডা গো এখানে! মাথা খোলা রেখে বসে আছ কেন তুমি!

গায়ের শালটা দিয়ে মাথাও ঢেকে নেয় দেবাংশু। জয়িতা পাশে এসে বসে। বলে, জায়গাটা কী সুন্দর! আরও ক-টা দিন থেকে গেলে হত।

—থাকো, কে বারণ করেছে!

—একটাই সমস্যা, বাড়ির খবর নেওয়া যাবে না। ফোনের টাওয়ার নেই। বলে দেবাংশুর কনুইয়ের ফাঁক দিয়ে নিজের হাতটা ঢুকিয়ে দিল জয়িতা। ওর বুকের স্পর্শ পাচ্ছে দেবাংশু। এত ঘনিষ্ঠতা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। ফের জয়িতা বলে ওঠে, আদিত্যদার ফোন থেকে অবশ্য করা যায়, মোবাইল ফোন হয়ে এমন অভ্যেস হয়েছে, অন্যের ফোন চাইতে কেমন অস্বস্তি হয়।

একটু চুপ থেকে জয়িতা বলে ওঠে, আদিত্যদা টাওয়ার পাচ্ছে কী করে বলো তো? আমার তো একই কোম্পানির ফোন। তোমারও তাই।

দেবাংশু হাসে। বলে, প্রশ্নটা আমিও করেছিলাম ওকে। বলল, আমার হেঁটে যাওয়াটা লক্ষ করবি। এঁকেবেঁকে কোন কোন জায়গা দিয়ে হাঁটছি। ওটা টাওয়ার পাওয়ার অদৃশ্য মাপ। অজান্তেই আবিষ্কার করে ফেলেছি। তুই এসে যদি থাকবি ঠিক করিস, পায়ের চেটোয় চুন মেখে একদিন হাঁটব, ম্যাপটা পেয়ে যাবি।

হেসে ফেলল দু'জনেই। জয়িতা দেবাংশুর থেকে হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আচ্ছা, আমি রাতে কোথায় শোব?

—এদের ঘরের অভাব আছে নাকি, যে কোনও একটা পছন্দ করে শুয়ে পড়ো। তবে একা লাগতে পারে। ভয় পেতে পারো। নির্জন জায়গা। বলার পর মুহূর্তখানেক ভাবে দেবাংশু। বলে, একটা কাজ করা যেতে পারে। আমি, আদিত্য একঘরে শুই। তুমি মালবিকার সঙ্গে শোও।

একটু চুপ থেকে জয়িতা বলল, স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা শুতে বাধ্য করানো ভালো দেখায় না। আমি একাই শুয়ে পড়ব। অসুবিধে হবে না।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জয়িতা এবার ঘাড় ফেরাল বাঁশবাগানের দিকে। দেবাংশুও ঘুরে বসে। জয়িতা আসার আগে অবধি ওইদিকেই তাকিয়ে ছিল। আবার শিয়ালের দল ডেকে উঠল। ঝিঁঝির কোরাস। জয়িতা বলল, মাঝেমাঝেই তো আমরা এখানে চলে আসতে পারি। এবার এলে টানা সাত দশদিনের ছুটি নিয়ে আসব।

—শহরের লোক গ্রামে এলে এই কথাটা বলবেই। পরে আর আসে না। যদি-বা আসে দু-তিন বছর আগে নয়। আমিও তো এলাম দশ বছর পর।

দেবাংশুর কথার পর জয়িতা বলল, গ্রামটা আমার কেন এত ভালো লাগছে বলো তো?

—কেন?

—তোমাকে এত কাছে, এভাবে তো কখনও পাইনি।

দেবাংশু কোনও কমেন্ট করল না। মিথ্যে বলেনি জয়িতা, প্রসাধন ছাপিয়ে জয়িতার শরীরের গন্ধ সে এখানে এসেই পেয়েছে। কাগজি লেবুর মিষ্টি গন্ধ।

শয্যাকন্টকী বলে একটা রোগ আছে। শরীর বাদ দিয়ে মনেও ঢুকে পড়ে সেই রোগ। সেটা যে কী বিরক্তিকর, আজ রাতে মর্মে মর্মে টের পাচ্ছে জয়িতা। দেবাংশুর কথা মতো জয়িতা নিজের ঘর বেছে নিয়েছে। মালবিকা বউদি যখন বিছানা পাততে সাহায্য করছিল। বলল, রাতে ভয়-টয় লাগলে, আমাকে ডাকতে হেজিটেট করো না। আমরা কোণের ঘরটায় শুই। যে ঘরে টিভি দেখছিলাম, তার পাশে।

ভয় একেবারেই লাগছে না জয়িতার, ঘুম আসছে না। সেই থেকে এপাশ ওপাশ করছে। ইতিমধ্যে দু'বার ঘরের বাইরে গিয়েছিল জয়িতা। দেবাংশুর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছে। বন্ধ দরজা জানলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল আলো। সম্ভবত বই পড়ছে। লাগেজে নিয়ে এসেছে বই, ট্রেনেও পড়ছিল।

ঘরের বাইরে থাকলেও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। দোতলার বারান্দায় একটা আলো জ্বলছে, তাতেই দেখা গেল উঠোন জুড়ে কুয়াশা।

শুয়ে থাকতে থাকতে একবার পায়ের আওয়াজ পেয়েছিল, দেবাংশুর

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কি? মশারি তুলে হাত বাড়িয়ে জানলা ফাঁক করেছিল জয়িতা। দেখেছিল, শাল গায়ে সিগারেট খেতে খেতে নিজের ঘরের সামনে পায়চারি করছে দেবাংশু। সিগারেট কমই খায়। বারণ করার মতো খায় না।

দেবাংশু ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার বাইরে গিয়েছিল জয়িতা। দেবাংশু তখনও ঘুমোয়নি, আলো জ্বলছিল ঘরে। আলো জ্বালা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়ল না তো?

মশারি তুলে বিছানা থেকে নেমে আসে জয়িতা। এখনও দেবাংশুর ঘরে আলো। উঠোনের কুয়াশা উঠে এসেছে দালানে। পায়ে পায়ে দেবাংশুর ঘরের দিকে এগোয় জয়িতা। যদি জেগে থাকে দেবাংশু, খানিক গল্প করা যাবে। কাঁহাতক বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করা যায়। নক করতে হল না, ভেজানো দরজা ঠেলে চৌকাঠ ডিঙোয় জয়িতা। লেপ গায়ে উপুড় হয়ে বই পড়ছে দেবাংশু। জয়িতার পায়ের শব্দে ফিরে তাকায়। ওর সদা নিষেধের দৃষ্টি সহ্য হয় না জয়িতার, ডানহাতি সুইচবোর্ড, জয়িতা নিভিয়ে দেয় আলো।

দুপুরের সেই শান্ত কেলেঘাই খালের জল যেন বর্ষার প্রাণ পেয়েছে, মশারি তুলে জয়িতা সেভাবেই উঠে এল বিছানায়। 'না' বলতে চেয়েও, বলে উঠতে পারছে না দেবাংশু। আজ সকাল থেকেই দুটো শরীরে বোঝাপড়া হয়েছে খুব। মনের কথা শুনছেই না তারা। অনেক আগে থেকেই অল্প ছোঁয়াছুঁয়িতে তেষ্টা সঞ্চিত হচ্ছিলই। আজ এদের বশে রাখা একেবারেই অসম্ভব। দেবাংশু যে এতদিন সতেজ ত্বকের ঝরনা গাছপাতার আড়াল থেকে দেখেছিল কয়েক পলক, আজ তা চোখের সামনে। স্নায়ুর দৃষ্টি দিয়ে দেখছে দেবাংশু। গায়ে, ঠোঁটে জলের ছিটে এসে লাগছে। বয়সের শর্তে এই ঝরনাতলায় আসার কথাই ছিল না দেবাংশুর। কে যেন পথ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে। পুরুষ শরীরের অভিজ্ঞতা জয়িতার নেই, আনাড়ির মতো আদর করছে। যৌনতায় বঞ্চিত থাকা ভালোবাসা ক্ষোভে ফুঁসে উঠছে যেন। অধীর ক্ষিপ্রতায় জয়িতা দুটো শরীরের পোশাক খুলে ফেলতে চাইছে। জয়িতার স্তন, উপত্যকার মধ্যে পেলব পেট, কলাগাছের থোড়ের মতো উরু স্পর্শ করেছে দেবাংশুর নগ্ন শরীর। কী উত্তাপ জয়িতার শরীরে। বেচারি হাতড়ে মরছে সুখ। দেবাংশু জানে নারী শরীরের কোথায় কোথায় থাকে লুকনো সুখ। প্রত্নতাত্ত্বিক নিপুণতায় দেবাংশু জয়িতার শরীরের সেইসব থাক, পরতে,

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বিভাজিকায় পৌঁছে গিয়ে উপহার দেয় চরম সুখানুভূতি। বারবার শিহরিত হয় জয়িতা। ওর প্রতিটি শীৎকারে উত্তেজনার নানান শৃঙ্গে উঠে একসময় আকাশজোড়া প্রশান্তি নেমে নেমে আসে দেবাংশুর মাথায়। ক্লান্ত দেবাংশু নির্জন পর্বত শিরার পাশে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তুষারবৃষ্টি শুরু হয়। পাছে বরফে ঢাকা পড়ে যায়, সেই ভেবে হয়তো জয়িতা তার নগ্ন শরীর দিয়ে আড়াল করে দেবাংশুকে।

শ্বেতপাথরের চাতালের মতো ঠাণ্ডা এখন দেবাংশুর শরীর। চাতালটা কি মন্দিরের? ফুল, ধুপধুনোর গন্ধ আসছে যেন! বিবাহ আয়োজন সেরে ফিরে গেল কি রক্ষণশীল, অভিমানী পুরোহিত? পবিত্র গন্ধ বুক ভরে নিয়ে দেবাংশুর শরীর থেকে সরে আসে জয়িতা।

শাড়ি-টাড়ি পরে চৌকাঠের বাইরে পা রাখতেই চোখ চলে গেল দালানের শেষপ্রান্তে, চাঁদ নেমে এল কি? মুহূর্তে ঘোর ভাঙে, দোলনায় বসে আছেন সাদা থান পরা আদিত্যদার ঠাকুমা। জয়িতা দেখতে পেলেও, তিনি নিশ্চয়ই পাবেন না। দৃষ্টিশক্তি প্রায় নেই। আকাশে আলো ফুটতেও দেরি আছে। ত্রস্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় জয়িতা।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

দশ

রবিবার। বিকেলে জয়িতা নাগের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সায়র যাচ্ছে গরিফায়। আজ আর ট্রেনে যাচ্ছে না, বাইক নিয়েছে। আজ তো আসল পরিচয় দিতেই হবে। না দিলেও উনি চিনে ফেলবেন ঠিক। সায়রের ফটো বাবা দেখিয়েছে ধরে নেওয়া যায়। উনিও উদ্যোগী হয়ে অলক্ষ থেকে সায়রকে সচক্ষে দেখে নিতে পারেন। মেনে নেওয়া আর কি। যাকে বিয়ে করতে চলেছেন, তার সবচেয়ে কাছেরজনকে চোখের দেখা দেখে নেবেন না! তবে সায়র ড্রেস পরেছে আগের দিনের মতোই, সেলসম্যান সুলভ। কারণ, প্রথমে ফেস করতে হবে দোকানি লাল্টুবাবুকে, ওবাড়ির ঘরজামাই। উনি ডেকে আনবেন জয়িতা নাগকে। লাল্টুবাবু যদি সায়রের লুক-এ চেঞ্জ দেখেন, খটকা লাগবে কোথাও। জয়িতা নাগকে ডেকে দেওয়ার ব্যাপারটা সুদ হবে না। দু'চারটে বোকা বোকা প্রশ্ন করে বসলেন হয়তো।

জয়িতা নাগ এলে সায়র কী কী বলবে, হিমিকার সঙ্গে কথা বলার পর মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছে। কিন্তু এখন অন্য প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে মাথায়। চিন্তাটা এল খানিক আগে, জয়িতা নাগ যদি চিনেও না চেনার ভান করেন!

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কী করবে সায়র? উনি হয়তো বললেন, কে ভাই তুমি? আর দেবাংশু চ্যাটার্জি নামের কোনও লোককে আমি চিনি না।

কিছুই করার থাকবে না সায়রের। এই পয়েন্টটা নিয়ে ভেবে দেখা হয়নি। হিমিকার কাছে সব কথা স্বীকার করেছে সায়র। না করে উপায় ছিল না। মিথ্যে বলে প্রেমিকার প্রথম চুমুকে কলুষিত করতে চায়নি। পুরোটা জানার পর হিমিকার কিন্তু কোনও রিঅ্যাকশন হল না। একেবারেই কুল ছিল। বলল, দেখ, আমি তো শুধু তোকে ভালোবাসিনি, তোর গোটা জীবনকেই ভালোবেসেছি। বাবা-মা কী বলল না বলল তার ওপর আমার ভালোবাসা নির্ভর করে না। তুই যদি কাকাবাবুর রিলেশানটা না মেনে নিতে পারিস, ভদ্রমহিলা যদি তোদের বাড়িতে আলটিমেটলি চলেই আসেন, তুই যা ঠিক করেছিস, তাই করবি। থাকবি দাদুর বাড়ি গিয়ে। মাথা থেকে রিভেঞ্জ নেওয়ার আইডিয়াটা তাড়া। আমার কাছে প্রমিস কর, এ ধরনের কোনও কাজ করবি না। করলেই আমি বরং দূরে চলে যাব। প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষকে কী করে ভালোবাসব আমি?

হিমিকার পক্ষে এই কথাগুলো বলা সহজ, কেসটা ওর বাবা কিংবা মাকে নিয়ে নয়। মায়ের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় সায়রের, বেচারি জানলই না তাকে কীভাবে ঠকানো হয়েছে! জেনে গিয়েও সরে যেতে পারে, সায়র শিওর নয়। হিমিকাকে যখন কথা দিয়েছে, রিভেঞ্জ সে নেবে না। নিজের মানসিক অবস্থানটা মহিলাকে বোঝাবে। তাতে ওঁর উপকার করাই হবে। মহিলা হয়তো ভেবে বসে আছেন দেবাংশু চ্যাটার্জির আত্মীয় পরিজনরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে। একজন যে কিছুতেই করবে না, সেটা ওঁর জেনে রাখা ভালো। মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারবেন। বাবার জীবনে জয়িতা নাগের উপস্থিতি সায়র যে মেনে নিচ্ছে না, এই কথাটা প্রথমে বাবাকে বলা যেতে পারত। বাবা শুনে নিয়ে সায়রের মনোভাব রেখে দিত নিজের জিম্মায়, বিদ্বেষটা পৌঁছে দিত না জয়িতা নাগের কাছে। মহিলার প্রতি বাবা মোহমুগ্ধ। উনি বশীভূত করেছেন বাবাকে। সায়রকে যদি না চেনার ভান করেন, সায়র যে এসেছিল বাবাকে নিশ্চয়ই জানাবেন। তাতে দু'জনের কাছেই সায়রের স্ট্যান্ডটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এমনও ঘটতে পারে সায়রের বিতৃষ্ণা উপলব্ধি করে বিয়ের ব্যাপারটা থেকে পিছিয়ে গেল দু'জনে। সম্পর্কটা রেখে দিল আগের মতোই। তাতে খানিকটা হলেও চেনা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পরিচিতদের কাছে অপদস্থ, অপমানিত হওয়া থেকে বাঁচবে সায়র। খানিকটা ভাবছে এই কারণেই, বাবার রিলেশনটা আজ না নয় কাল চেনাজানা পরিমণ্ডলে ছড়াবেই। কেচ্ছা কেলেঙ্কারি বেশিদিন চেপে রাখা যায় না। সেটুকু সহ্য করে নেবে সায়র। মহিলা বাড়ি ঢুকে এলে সায়রের গায়ে আঁচটা লাগবে সরাসরি। সবকিছু তলিয়ে ভেবে দেখলে জয়িতা নাগের সামনে নিজের দাঁড়ানোটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ভুল কিছু করেনি সায়র।

নৈহাটিতে এসে পড়েছে। বাই রোড এই অঞ্চলে প্রথম এল সায়র। গরিফার রাস্তাটা লোকজনের থেকে জেনে নিতে হবে। জয়িতা নাগ এখন হয়তো খাওয়াদাওয়ার পর দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। সুখস্বপ্নে বিভোর। উনি কল্পনাই করতে পারবেন না, আর একটু পরেই কী মারাত্মক চমক অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।

বাবার বেড়াতে যাওয়ার দিন মেজজেঠু পেপারের 'পাত্র চাই'-এর অ্যাড দেখিয়ে বাবার বিয়ের কথা বলল, সায়রের কোনও রিঅ্যাকশন হয়নি। কারণ, সায়র জানে বাবা মোটেই অত লাইট মাইন্ডেড নয়, যে বউ মারা গেছে বলে অচেনা কাউকে বিয়ে করে বসবে। বাবার সঙ্গে একটু ইয়ার্কি মেরে নিল সায়র। আসলে বার্তা দিয়ে রাখল, তোমার বিয়ে নিয়ে আমার আপত্তি নেই। মা বেঁচে থাকতে যে সম্পর্কটাতে জড়িয়েছ তুমি, মোটেই স্বীকৃতি দেব না।

জয়িতা নাগদের দোকানের সামনে বাইক স্ট্যান্ড করছে সায়র। সামান্য নার্ভাস লাগছে। স্ট্যান্ড দু'বারের চেষ্টায় নামাতে পারল। লাল্টুবাবুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল, কোনও উৎসাহ ফুটল না ওঁর মুখে। ব্যাপার কী?

চাতালে উঠে এল সায়র। একজন কাস্টমার জিনিস কিনে চলে যাচ্ছে, কাউন্টার ফাঁকা। সায়র গিয়ে দাঁড়ায়। লাল্টুবাবুকে বলে, আজ আসার কথা ছিল আমার, মনে আছে তো?

হতাশ ভঙ্গি সহ লাল্টুবাবু বলল, আমার মনে থেকে কী লাভ! যাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, তিনিই তো নেই।

—সে কী, উনিই তো আমায় টাইম দিয়েছিলেন। কোনও আর্জেন্ট কাজে বেরিয়ে গেছেন বুঝি?

—বেরিয়েছেন, তবে আর্জেন্ট কিছু নয়। দু'দিনের জন্য বেড়াতে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

গেছেন। আজ রাতে হয়তো ফিরবেন। বলে হাতের কাজ সারতে লাগলেন লাল্টুবাবু।

এর থেকেই মানুষের স্বভাব ধরন চেনা যায়, কথার কোনও দাম নেই মহিলার। ভেবে নিয়ে সায়র বলল, তাহলে! কী ধরে নেব, এজেন্সি নেওয়ার ইচ্ছে আপনাদের নেই?

—না, তা নয়। বড়দি এ ব্যাপারে কথা বলার দায়িত্ব দিয়ে গেছে মেজদির ওপর। তাকেই ডাকি। বলার পর ক্যাশবক্সের উপর রাখা মোবাইল ফোনটা তুলে নেয় লাল্টুবাবু।

সায়র জিজ্ঞেস করে, মেজদি কোথায় থাকেন?

—পিছনে, এই বাড়িতেই। ফোন করে ডেকে নিচ্ছি।

জয়িতা নাগের বাড়ির পরিবেশ দেখার সুযোগটা হাতছাড়া করে না সায়র। বলে, চলুন, বাড়িতে গিয়েই ওঁর সঙ্গে কথা বলি। ভিতরে যেতেই হত, গোডাউন বানাবেন কোন ঘরটা, দেখে নিতে হবে একবার। ঘরটা উপযুক্ত না মনে হলে, নতুন বানাতে হতে পারে।

—আপনাদের ডিলার হতে গেলে কোনও অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে কি? আজকেই লাগবে সেটা?

কথাটা কেন জিজ্ঞেস করলেন লাল্টুবাবু, ধরতে পারল না সায়র। এই লাইনের টেকনিক্যাল প্রশ্ন মনে হচ্ছে এটা। সায়র ইনটিউশন থেকে বলে দিল, অবশ্যই। নয়তো আমি কাজ এগোব কী করে!

—তাহলে ভিতরে গিয়ে লাভ হবে না। ইংরেজিতে অ্যাপ্লিকেশন লেখার ক্ষমতা বাড়ির কারোর নেই। বড়দি ছাড়া হবে না।

জয়িতা নাগের অবর্তমানে বাড়ির পরিবেশ খুঁটিয়ে অবজার্ভ করতে পারবে সায়র, বলে ওঠে, অ্যাপ্লিকেশন আমি লিখে নেব আপনার মেজদি সই করে দিলেই হবে।

—মেজ শালি। সংশোধন করে দিয়ে লাল্টুবাবু অসভ্যের মতো হাসতে হাসতে লাগলেন। বললেন, পায়ের সই আপনাদের কোম্পানিতে চলে তো?

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না সায়র, হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকে। মুখে বিচ্ছিরি হাসির প্রলেপ নিয়েই কাউন্টারের ওপ্রান্তে গিয়ে লাল্টুবাবু পাটাতন তুলে বেরিয়ে এলেন। বললেন, চলুন বাড়ির ভিতরে গেলে সব বুঝতে পারবেন।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

চাতাল থেকে নেমে পাশের সাইকেল সারাইয়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে লাল্টুবাবু বললেন, সুবোধ, দোকানটা লক্ষ রাখিস। আমি এক্ষুনি আসছি।

পা দিয়ে সই ব্যাপারটা এখন ক্লিয়ার। জয়িতা নাগের পরের বোনের দুটো হাত নেই। কাঁধের গোড়া থেকেই নেই। কেন নেই, হাত ছাড়াই জন্মেছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। শাড়ি পরার অসুবিধে বলে পরনে ঝালর দেওয়া ফ্রক। অঙ্গ না থাকার নিঃসহায় ছাপ লেগে রয়েছে মুখে। ওঁর পাশেই প্রসব আসন্ন বিশাল পেট নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর এক বোন। সংসারে দলামোচা হওয়া মা-ও আছেন। বুদ্ধি নেই অথচ সেয়ানার ভাব নেওয়া ঘরজামাই লাল্টুবাবু এখনও দোকানে ফিরে যাননি। সকলের মাঝে চেয়ারে বসা সায়রের অবস্থা বেশ খারাপ। এবাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটাতেই নিশ্চয়ই সায়রকে বসানো হয়েছে। ঘরের সাজসজ্জায় ছিটেফোঁটা বাহুল্য নেই। বোঝাই যাচ্ছে, আয়ে টান পড়লে মধ্যবিত্তের তকমা খসে যাবে এই সংসারের গা থেকে। বিজনেস, ডিলারশিপের নানান শর্ত নিয়ে সায়র এদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে যাচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শুনছে চারজনেই। মাথায় যে কিছুই ঢুকছে না, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অবশেষে সায়র বলে উঠল, আমার মনে হয় এসব বিষয়ে ম্যামের সঙ্গে কথা বলাই ভালো। অফিশিয়াল পার্টিকুলারস্ উনি ভালো বুঝবেন। চাকরি করেন। কোম্পানি থেকে আরও ক-টা দিন আমি বার করে নিচ্ছি। ওঁর ফোন নাম্বারটা দিন, এখনই সামনের কোনও একটা দিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে নিই।

জয়িতা নাগের মা বললেন, ফোনে তো ওকে এখন পাওয়া যাবে না। টাওয়ার থাকে না যেখানে গেছে। একটা নাম্বার অবশ্য দিয়ে গেছে, তাতে পাওয়া যেতে পারে। দাঁড়ান, নিয়ে আসি নাম্বারটা।

সরে গেলেন জয়িতা নাগের মা। দেখা হওয়ার পর থেকেই হাঁটুর বয়সি সায়রকে আপনি বলে সম্বোধন করছেন। যথেষ্ট আন্তরিক ব্যবহার করেও সায়র ওঁর হীনম্মন্যতা কাটাতে পারেনি। বাকি তিনজনও তার দিকে বড় প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে, এক্সট্রা খাতির করছে, চা-বিস্কিট খাওয়ানো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য ডিলারশিপ পেতে এরা

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মরিয়া। অভিনয়টা করতে এখন আর তাই ভালো লাগছে না সায়রের। প্রবঞ্চক মনে হচ্ছে নিজেকে।

জয়িতা নাগের মা চিরকুটে লেখা ফোন নাম্বার নিয়ে ফিরে এলেন। দিলেন সায়রের হাতে। নাম্বারটা প্রথমে চেনা চেনা লাগল, চিনে যখন ফেলল সায়র, মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এগারো

টিফিন আওয়ার্সে রায় কাফেতে এসেছে জয়িতা। বিস্কিট কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভকে এখানেই আসতে বলেছে। একবার ভেবেছিল দেবাংশুকে ডেকে নেবে, কোম্পানির লোকটার সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার পর বাকি সময়টা দেবাংশু আর সে আড্ডা দেবে। দু'দিন একসঙ্গে থেকে এমন স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে, সুযোগ পেলেই কাছে পেতে ইচ্ছে করছে ওকে। বিজনেসের আলোচনায় বোর হবে দেবাংশু, তাই আর ডাকল না। ছুটির পর দেখা তো হবেই।

বিস্কিট কোম্পানির ছেলেটা, নামটা কী যেন, সাম্যব্রত না অর্কপ্রভ, কার্ড দিয়ে গেছে বাড়িতে। বড় তাড়া দিচ্ছে ডিলারশিপ নেওয়ার জন্য। গতকাল রাত আটটা নাগাদ ফোন করেছিল ছেলেটা। জয়িতারা তখন ট্রেনে, শশিন্দা থেকে ফিরছে। ছেলেটা বলল, ম্যাম, বিকেলে আপনাকে তো বাড়িতে পেলাম না, ফ্যামিলির কাউকে ঠিক কমিউনিকেট করে উঠতে পারলাম না ডিলারশিপের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হয় এবং সেটা অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিব্‌ল। কেননা কোম্পানি এজেন্টের নাম পাঠানোর জন্য চাপ দিচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

গরিফায় আপনার দোকানটা লোকেশন ওয়াইজ এত সুটেবল ডিলারশিপ বিজনেসের জন্য, আমি চাইছি এজেন্সিটা আপনি নিন।

—আমি নয়, সব মায়ের নামেই হবে। তবে ছুটির দিন ছাড়া তো দেখা করতে পারব না ভাই। তার মানে সেই সামনের রবিবার। বলেছিল জয়িতা।

ছেলেটা বলল, আপনার অফিসে গিয়েও মিট করতে পারি আমি। ইফ ইউ হ্যাভ নো ট্রাবল। শোরুম তো দেখেইছি, বাড়ির ভিতর গোডাউন স্পেসও হয়ে যাবে দেখছি। শুধু কথা বলাটাই বাকি।

জয়িতা তখন আজ দুপুরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করল। অফিসে নয়, টিফিন আওয়ার্সে রায় কাফেতে। ফোনের কথা যখন শেষ হল, পাশ থেকে দেবাংশু কমেন্ট করল, অফিসেও বিজনেস ডেকে আনছ।

জয়িতা স্মিত হাসি হেসে মন্তব্যটা এড়িয়ে গিয়েছিল। কেন বিজনেসকে অফিসে ডেকে পাঠাচ্ছে, দেবাংশুকে বলা যাবে না। জয়িতা জানে, কোম্পানির তাগাদাটা বিজনেসের ট্যাকটিক্স। এদিকে তারও তাড়া আছে, তাই ছেলেটাকে ডেকেছে আজ। শশিন্দায় দেবাংশুর সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা পৌঁছেছিল শেষ পর্যায়ে। দেবাংশুর ন্যায়নীতিবোধ প্রবল, বিয়ের প্রস্তাব দিতে দেরি করবে না। বিয়ের পর বাপের বাড়ির জন্য এখনকার মতো টাকা দিতে পারবে না জয়িতা। শ্বশুরবাড়িতে অত লোক, কাউকে কিছু কিনে দেওয়ার ইচ্ছে হল, দেবাংশুর কাছে হাত পাতা উচিত হবে না। কারণ, জয়িতা উপার্জন করে। সায়রের সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি ঠিকঠাক হয়, সেও জয়িতার কাছে বায়না আবদার করতেই পারে কিছু কিনে দেওয়ার জন্য। হাতে বেশ কিছু টাকা থাকাটা তাই খুব জরুরি। আবার ওই সংসারে টাকা কমে গেলে চলবে কী করে! সেই কারণেই ডিলারশিপ বিজনেসে ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে জয়িতা। টাকার ঘাটতিটা বিজনেস করে ওরা নিজেরাই পুষিয়ে নিতে পারবে।

ওবাড়ি ছেড়ে আসার কথা ভাবতে গিয়েও মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে জয়িতার। বত্রিশটা বছর কাটিয়েছে। শুধু কাটিয়েছে নয়, রানির মতো থেকেছে। দেখতে শুনতে ভালো, ছোটবেলায় তোলা তোলা করে মানুষ করেছে বাবা-মা। বড় হওয়ার পর সে হয়ে উঠল বাড়ির কর্ত্রী। তার কথায় সংসার চলে। এতটা মর্যাদা দেবাংশুদের বাড়িতে পাওয়া যাবে না, জয়িতা জানে। মেয়েরা পায় না। পেলে সেটা রেয়ার কেস। জয়িতা আবার দ্বিতীয়

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

পক্ষ। নিজেকে টোন ডাউন করে রাখতেই হবে। সায়রকে নিয়ে অ্যাংজাইটিটা বেশি হচ্ছে, মেনে নিতে পারবে তো জয়িতাকে? যথেষ্ট বড় হয়েছে সে। স্টেডি গার্লফ্রেন্ড আছে, দেবাংশুর থেকে শুনেছে জয়িতা। ক-দিন আগে ছেলের উদ্ধত আচরণ নিয়ে টেনশন করছিল দেবাংশু, এখন সব নর্মাল। সায়রের সম্বন্ধে অনেক কথাই দেবাংশুর থেকে শুনেছে জয়িতা, খুবই স্বভাবসুন্দর ছেলে। বাবাকে ভীষণ ভালোবাসে। দারুণ গান গায়। সায়রের ছোট থেকে বড়বেলা অবধি প্রচুর ফটো জয়িতাকে দেখিয়েছে দেবাংশু। খুবই কিউট, ইনোসেন্ট দেখতে সায়রকে। মায়া পড়ে যেতে বাধ্য। বিয়ের আগে দেবাংশু নিশ্চয়ই সায়রের সঙ্গে কথা বলবে, বোঝাবে। তারপরও যদি সায়র জয়িতার সঙ্গে একটু আধটু খারাপ ব্যবহার করে, মেনে নিতে হবে। চেষ্টা করতে হবে বিরূপতা কাটানোর।

বিয়ে থেকে আর পিছোতে পারবে না জয়িতা। শশিন্দাতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে দেবাংশুর কাছে। নিজের সত্তায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে দেবাংশু। সবচেয়ে সারপ্রাইজিং যেটা ঘটেছে, শশিন্দায় প্রথম রাতের পর দুপুরের দিকে উঠোনে এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছিল জয়িতা। আদিত্যদার ঠাকুমা রোদ পোহাচ্ছিলেন দালানের দোলনায় বসে। হাতের ইশারায় ডাকলেন। জয়িতা কাছে যেতে হাতের বেড়ে মাথাটা টেনে নিলেন। নীচু গলায় বললেন, তুমি লোপা নও, প্রথমবার ছুঁয়েই টের পেয়েছি। গলা শুনেও বুঝতে পারছিলাম। নাতবউকে শুধোতে, বলল লোপা মারা গেছে। ভারি ভালো মেয়ে ছিল সে। তুমিও খুব সুন্দর। চোরের মতো কেন ঢুকতে হচ্ছে দেবাংশুর ঘরে? বিয়ে করে নাও।

হকচকিয়ে গিয়েছিল জয়িতা, বুড়ি কি ইচ্ছে করে অন্ধ, কালা সেজে আছেন? দম নিয়ে ঠাকুমা ফের বলতে থাকলেন, আমার শ্বশুরমশাইয়ের প্রচুর জমিজমা আর দু'জন রাখনি ছিল। গরিব মানুষদের ঠকিয়ে বাড়িয়েছিলেন সম্পত্তি। লোভ, লালসা, ভোগের জীবন কাটিয়েছেন। পাপের টাকা পাপেতেই খেয়ে নিল। এই ভিটেটুকুও বন্ধক রেখেছিলেন। একদিন তিনিও চলে গেলেন। আমার কর্তা সৎপথে উপার্জন করে এই জমি-বাড়ি ছাড়ান। ভিটের গাছপালার সঙ্গে শ্বশুরের এক রাখনিও রয়ে গিয়েছিল, চারুবালা। আমার কর্তার দয়ার শরীর। চারুবালাকে তাড়াননি। থাকতে দিয়েছিলেন গোয়ালের পাশে একটেরে ঘরে। বাড়ির বাইরের কাজগুলো

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

করত, ধান শুকানো, গোয়াল দেখভাল, উঠোন পরিষ্কার...। আমি পাকশালার বাইরে ওর রেখে যাওয়া থালায় খাবার ঢেলে দিতাম। নিয়ে চলে যেত। মুখে বিশেষ কথা ছিল না। শেষ দিকে মাথাটা কেমন গোলমাল মতোন হয়ে গেল। শূন্যে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হঠাৎ কাকে যেন গাল পাড়ত। নিজের ভাগ্যকেই বোধহয়।—চারুবালার হয়ে হতাশার শ্বাস ফেলে ঠাকুমা বললেন, পেটভাতের জন্য ও কিন্তু এই ভিটেতে থেকে যায়নি, ওইসব মেয়ে মানুষের ভাতের জোগাড় করতে অসুবিধে হয় না। শ্বশুরমশাইকে ভালোবাসত বলেই শত উপেক্ষা অবজ্ঞা সহ্য করেও মাটি কামড়ে পড়েছিল। ঘরে একসময় ওকে তোলা হত, রাখা হত না।—এরপর হাতের বেড় আলগা করেছিলেন ঠাকুমা। দৃষ্টি ভাসিয়ে রেখে বলেছিলেন, কাউকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজেকে এভাবে ছোট কোরো না। কীসে কম যাও তুমি! পরেরবার যখন আসবে, মাথায় যেন সিঁদুর থাকে। গা থেকে সংসার সোহাগের গন্ধ পেতে চাই। তুমি তো আর দরজা ভেঙে ঢোকোনি, দেবাংশু খোলা রেখেছিল।

কথা শেষ হতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল জয়িতার। জড়িয়ে ধরেছিল ঠাকুমাকে। কাঁদেনি। মনে হচ্ছিল কোনও সনাতন নীতিবোধকে জড়িয়ে আছে, সময় সমাজ যাকে অন্ধ, কালা, অকেজো করে দিতে পারেনি।

ঠাকুমার কারণেই দ্বিতীয় রাতে দেবাংশুর ঘরে যায়নি জয়িতা। আলো কিন্তু জ্বলছিল।

শশিন্দা ছেড়ে যেতে মন খারাপ হচ্ছিল খুব। মোটরগাড়িটা পাওয়া যায়নি। গ্রামের অ্যাম্বুলেন্স হয়ে রোগী নিয়ে সদর হাসপাতালে গিয়েছিল। ভ্যানরিকশায় ফিরছিল জয়িতারা। বিস্তীর্ণ ধানজমি, হলুদ সরষে খেত, ছিটকে উড়ে যাওয়া মাছরাঙা, নীল আকাশে তুলির সাদা আঁচড় সব যেন নানা বিভঙ্গে জয়িতাকে বলছিল, আমাদের মনে রেখো। আমরা তোমার সবচেয়ে মধুর সময়ের সঙ্গী।

ওই গ্রাম চিত্ররেখার দিকে তাকিয়ে গোপনে বারংবার চোখ মুছতে হচ্ছিল জয়িতাকে। আনন্দাশ্রু? একটা কথা ভেবে খারাপ লাগছিল, মধুচন্দ্রিমাটা হয়ে গেল বিয়ের আগেই।

কাফেটেরিয়ার ডিজিটাল ঘড়িতে চোখ যায় জয়িতার, কোম্পানির ছেলেটা আসছে না কেন? সময় শুনতে ভুল করেনি তো? না কি আসবেই

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

না? একবার ফোন করবে কি? ছেলেটার কার্ড রাখা আছে পার্সে। কার্ড বার করার আগে চোখ গেল দরজায়, যেন কারেন্ট খেল জয়িতা, কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে আসছে সায়র!

টেবিলের সামনে এসে হাতজোড় করে নমস্কার জানাল সায়র।

জয়িতা নিজেই জানে না কখন উঠে দাঁড়িয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনওক্রমে বলল, তুমি!

—আপনি তার মানে আমাকে চেনেন। বলার পর হাতের ভঙ্গিতে জয়িতাকে বসতে বলল সায়র। সম্মোহিতের মতো বসে পড়ল জয়িতা। সায়রও বসেছে। জয়িতার সামনে রাখা মগটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে সায়র বলে, আপনার আগেরটা তো শেষ। আর একটা বলি কফি? আমিও নেব।

জয়িতা ঠায় তাকিয়ে সায়রের দিকে। কোনও উত্তর দেয় না। খুবই শান্ত ভঙ্গিতে সায়র বলা শুরু করে, আপনার আর বাবার রিলেশনের ব্যাপারটা আমি জানতাম না। কিছুদিন আগে হিমিকার মা আমায় জানালেন। হিমিকা আমার স্পেশাল ফ্রেন্ড। কাকিমাই বললেন, মা মারা যাওয়ার অনেক আগে থেকে আপনাদের রিলেশন শুরু।

ওয়েটার এসে দাঁড়াল। সায়র বলল, দু'টো কফি। আমারটা ব্ল্যাক, ম্যামেরটা আগের মতো।

ফিরে গেল ওয়েটার। সায়র ফের বলে, বুঝতেই পারছেন, এমন একটা সোর্স থেকে খবরটা পেলাম, প্রচণ্ড অপমানিত লাগছিল। চিন্তার ঝড় বয়ে গেল মাথায়। কখনও খুব রাগ হয়েছে, কখনও বা খুব হতাশা। নিজেকে সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। এখন বুঝেছি, আপনাদের রিলেশনে আমার আপত্তি জানানোর অধিকার নেই। তাই একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে এসেছি।

কী রিকোয়েস্ট জানতে চায় না জয়িতা। ওয়েটার এসে দু'কাপ কফি রেখে গেল টেবিলে। কফিতে চুমুক মেরে সায়র বলল, আমি জানি, মা নেই, ভদ্রস্থ একটা টাইম গ্যাপ নিয়ে বিয়ে করবেন আপনারা। আমার রিকোয়েস্ট বিয়ের পর প্লিজ আপনি আমাদের বাড়িতে উঠবেন না। আমাদের ফ্যামিলি সার্কল বিরাট, বাড়িতেই অতজন লোক। পুরনো বাড়ি হিসেবে এলাকাতেও আমাদের পরিচিতি অনেক বেশি। এতজন মানুষের সামনে মাথা নীচু করে ঘুরতে হবে আমায়। কারোর কাছে হাসির খোরাক, কারোর-বা করুণার পাত্র।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

এছাড়াও একটা বড় সমস্যা আছে, হিমিকার মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, ওবাড়ির ছেলের সঙ্গে মেয়ের রিলেশনটা উনি মেনে নিতে পারছেন না। আমাদের এলাকাতেই ওদের বাড়ি। সম্ভ্রান্ত পরিবার। বাবার বিয়ের মুখরোচক গল্পের মধ্যে জড়িয়ে নিজেদের মর্যাদা নষ্ট করতে চাইছেন না। কেননা, আপনারা বিয়ে করলে কেচ্ছাপ্রিয় মানুষ বলাবলি করবেই, মায়ের মৃত্যুর জন্য আপনি আর বাবা দায়ী।

ঠায় তাকিয়ে আছে বলেই কিনা, কে জানে! জয়িতার চোখ দুটো ভীষণ জ্বালা জ্বালা করছে।

সায়র বলে, অনেক ভাবনাচিন্তা করে আমি একটা উপায় বার করেছি। আপনারা দূরে কোথাও ফ্ল্যাট নিয়ে থাকুন।

বলার পর টি-শার্টের পকেট থেকে এটিএম কার্ড আর একটা চিরকুট বার করে সায়র। দুটো জিনিস টেবিলে রেখে বলে, এটা আমার কার্ড। পিন নাম্বারটাও লিখে দিয়েছি কাগজে। এতে যা টাকা আছে, ফ্ল্যাট কেনা বা সাজানো দুটোই হয়ে যাবে।

—কেপ্ট? অনেক চেষ্টা করে এই কথাটুকু বলতে পারে জয়িতা।

সায়র বলল, আমি তা মিন করিনি। বিয়ে করুন আপনারা। বাবা যেন দু'বাড়িতে যাতায়াত রাখে। যতটা সম্ভব দূরে ফ্ল্যাটটা নেবেন। আমি তা হলে একটু ফ্রি মুভমেন্ট করতে পারব বাড়ি এবং এলাকায়। অতজন লোকের নজরবন্দি হতে হবে না। গসিপ ছড়াবে, ওটুকু এড়িয়ে থাকতে পারব। আপনি আমার হয়ে বাবাকে একটু বোঝান।

—মানেটা কিন্তু একই রইল। বিয়ে মানে তো একজনের সঙ্গে সম্পর্ক নয়। গোটা পরিবারের একজন হওয়া। অবশেষে অনেকটা কথা একসঙ্গে বলতে পারল জয়িতা।

সায়র বলল, আপনি খামোখা সেন্টিমেন্টাল হচ্ছেন! বিয়ে ছাড়াই তো ক-দিন বাইরে কাটিয়ে এলেন দু'জনে। তখন কী পরিচয়ে গিয়েছিলেন?

চেতনায় চাবুক আছড়ে পড়ল। জয়িতা বলে ওঠে, তুমি কি বাবার হয়ে পে করছ?

—না। আমি চাইছি আপনাদের অ্যাফেয়ারের হাত থেকে একটা প্রেমকে বাঁচাতে। আপনি আমাদের বাড়িতে এলে আমি নর্মাল থাকতে পারব না। হিমিকা বাড়ির অমতে গেলেও, খ্যাপাটে অ্যাবনর্মাল ছেলের সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

জীবনকে জড়িয়ে ফেলাটা ওর পক্ষে সুখের হবে না। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না, একটা প্রেমকে হত্যা করে আপনার ভালোবাসার পূর্ণ মর্যাদা পেতে।

বুকে একরাশ হাহাকার ঢুকে গেল জয়িতার। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে নিজের জন্য। একটু সময় নিয়ে সায়র বলল, আমার মনে হয় যে মধ্যপন্থার প্রস্তাব আমি দিলাম, এর চেয়ে ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর হয় না। টাকাটা আমার নয়, মায়ের। সন্তানের ভালোর জন্য যদি খরচ করা হয়, মায়ের প্রতি অবিচার করা হবে না। চলি।

সায়র চলে যাচ্ছে, জয়িতার শক্তি নেই কার্ডটা নিয়ে যেতে বলার। মাথায় শুধু একটা কথাই ঘুরছে, আমার ভালোবাসায় এত বিষ ছিল, যে আর একটা প্রেম মরে যাবে! আমার ভালোবাসায় এত বিষ...

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বারো

আজ একবারও মায়ের নাম ধরে ডাকেনি পাখিটা। সকাল থেকে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে সায়রের। দু'বার খাঁচার কাছে গিয়ে সায়র মায়ের নাম আউড়ে এসেছে। পাখিটার কোনও হেলদোল নেই। যেন ভুলে গেছে নামটা। সায়রের অস্বস্তিটা জাঁকিয়ে বসছে আর একটা কারণে, কাল জয়িতা নাগকে যা যা বলে এসেছে, তার আফটার এফেক্ট জানা যাচ্ছে না। বাবার দিক থেকে কোনও সাড়া নেই। মহিলা তার মানে এখনও কিছু জানাননি বাবাকে। কী সিদ্ধান্ত নিলেন জয়িতা নাগ, জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে সায়র। কালই কথাগুলো বলে এসেছে, আজ ফোন করে জিজ্ঞেস করা যায় না, কী ডিসিশন নিলেন বলুন?—সময় দেওয়া উচিত ওঁকে।

ফোনের কথায় খেয়াল পড়ে গেল, লাল্টুবাবুকে একটা কল করে দেখা যেতে পারে, জয়িতা নাগের মন-মেজাজের আঁচটা পাওয়া যাবে।

ফোনসেট ঘরে আছে। পাখির খাঁচার পাশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সায়র। নিজের ঘরের দিকে এগোতে যাবে, বাবা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল বারান্দায়। মর্নিংওয়াক সেরে ফিরল।

দাঁড়িয়ে গেল সায়র, বাবা কিছু বলে কিনা দেখা যাক।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

বলল, তবে অন্য কথা, উঠে পড়েছিস। দাঁড়া, চায়ের জল চাপাই।

রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল বাবা। সায়র নিজের ঘরে এসে ফোন তুলে নেয়। একটু ইতস্তত করে লাল্টুবাবুর নাম্বারে কল দেয়। রিং হয়ে যাচ্ছে, ঘুমোচ্ছেন হয়তো। না, ধরলেন ফোন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, বাড়িতে বিরাট কাণ্ড হয়ে গেছে! বড়দি শিরা কেটে ফেলেছে হাতের। নার্সিংহোমে নিয়ে এসেছি।

হার্টটা লাফিয়ে এসে গলার কাছে আটকে গেল সায়রের। কোনওক্রমে জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ...?

—কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি তো কিছু হয়নি।

—কোন নার্সিংহোম?

—বাড়ির কাছেই। মাতৃসদন।

লাইন কেটে দিয়ে ফোনসেটটা চেপে ধরেছে সায়র। ইচ্ছে করছে ছুঁড়ে মারে দেওয়ালে। এত বড় ব্লান্ডার করল সে! তার জন্যই তো...সায়র নিজেকে বোঝায়, ঠাণ্ডা রাখো মাথা। এখনও অনেক কিছু ফেস করতে হবে।

বাইরে বেরোনোর ড্রেস পরে নিয়েছে সায়র। টেবিলের ড্রয়ারের থেকে বাইকের চাবিটা নিল। ঘুরে দাঁড়াতে দেখে, বাবা দু'হাতে চা নিয়ে ঢুকছে। বাবার হাত থেকে মগ দুটো নেয় সায়র। টেবিলে রাখে। বাবাকে বলে, জয়িতা ম্যাম সুইসাইডাল অ্যাটেম্পট নিয়েছে। নার্সিংহোমে অ্যাডমিটেড।

কাটা গাছের মতো সায়রের বেডে বসে পড়ল বাবা। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সায়র।

রংচটা দোতলা পুরনো বাড়ি। গরিবদের নার্সিংহোম। বাইকে চেপেই গেট পেরোল সায়র। ছোট মাঠ, বাইক স্ট্যান্ড করে ইতস্তত জমা ভিড়ে চোখ বোলায় সায়র। লাল্টুবাবুকে খোঁজে। দেখতে পায় জয়িতা নাগের হাত না থাকা বোনকে। খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না। তবে হাত না থাকার নিঃসহায় ভাবটা আরও যেন প্রকট হয়েছে। পায়ে পায়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সায়র। জিজ্ঞেস করে, কেমন আছেন এখন দিদি?

—ভালো। ডাক্তার বলেছে, ফাঁড়া কেটে গেছে। আপনি এসেছেন যখন ভালোই হল।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

কীসের ভালো, ধরতে পারে না সায়র। জয়িতা নাগের বোন ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক পাড়লেন, লালি! লালি এদিকে আয় একবার।

ভারী পেট নিয়ে ছোটবোন এসে দাঁড়ালেন। মেজ বললেন, এঁর খামটা দিয়ে দে।

কেমন যেন ধাঁধার মতো লাগছে সায়রের, তার জন্য কোনও বিপদ অপেক্ষা করছে কি? ছোটবোন কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা ব্রাউন খাম বার করে সায়রের হাতে দিলেন। বললেন, মেজদিই বলল, খামটা সঙ্গে রাখতে। খবর পেয়ে আপনি আসতে পারেন।

এবার মেজবোন ধরে নিলেন কথা, বড়দি কাল অফিস থেকে ফিরে খামটা আমায় দিয়ে বলল, আপনি এলে দিয়ে দিতে। যদি না আসেন এদিকে, ফোন করে ডেকে নিয়ে দিতে বলেছিল। তারপর ঢুকল বাথরুমে। দেরি হচ্ছে দেখে আমি গেলাম। দেখি, দরজার তলা দিয়ে রক্ত ভেসে আসছে।

পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সায়রের। কোনও জোর পাচ্ছে না। ছোটবোন বলছেন, বাথরুমে দেরি মোটেই হয়নি। মেজদির ওটা অভ্যেস বড়দি বাথরুমে গেলেই, দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। আমরা কত বকাবকি করি। বড়দিও রাগ করত। আজ ওই অভ্যেসটার জন্যই বেঁচে গেল বড়দি। রক্ত বেশি বেরোয়নি। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা গেছে।

ইতিমধ্যে খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলেছে সায়র। আঠা দিয়ে আটকানো ছিল। হাতে নিয়ে বুঝেছিল এটিএম কার্ডটা আছে, সেটাই বেরোল, আর কিছু নয়। পিন নাম্বার লেখা কাগজটা নিশ্চয়ই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। একটা চিঠি থাকবে ভেবেছিল সায়র। নেই।

কার্ডটা পার্সে রেখে সায়র জিজ্ঞেস করল, ওঁকে একবার দেখা যাবে?

—কোনও ব্যাপার নয়, চার নম্বর কেবিনে চলে যান। এখানে কার্ড, গার্ড কিছু নেই। বললেন লালি।

সায়র নার্সিংহোম বিল্ডিং-এর দিকে এগোয়। কোলাপসিবল গেটের কাছে বেশ কিছু লোকের ভিড়।

ব্লাড, স্যালাইনের ড্রিপ চলছে। পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ খুললেন জয়িতা নাগ। কপালে ভাঁজ পড়ল। নিস্তেজ ঠাণ্ডা গলায় বললেন, চিঠি লিখে তোমাকে দায়ী করে গেছি কিনা দেখতে এসেছ?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় নিল সায়র। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার, নাকি অভিমান? গলার কাছটা ব্যথা ব্যথা করছে কেন? একটু ঝাঁঝ মিশিয়েই বলে ওঠে, আপনার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! নিজের বাড়ির লোকের কথা একবারও ভাবলেন না! হাত না থাকা বোন, ছোটবোনের আর ক-দিন পরেই বাচ্চা হবে, লাল্টুবাবু বেশ বোকা টাইপ, আপনাদের আশ্রিত। আপনার দুঃখী মায়ের আপনিই একমাত্র ভরসা এবং গর্বের সন্তান। সকলে আপনার ওপর নির্ভর করে বাঁচছে, আর আপনিই চলে যাচ্ছিলেন! আপনি চলে গেলে বাবাও ভালো থাকত না। কী জানি, কী হত বাবার! বাবাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি জানেন। বাবা খারাপ থাকলে, আমিও ভালো থাকতে পারতাম না। এতজন লোক আপনার দিকে চেয়ে রয়েছে, আপনি কোন আক্কেলে...কান্না এসে গলা আটকে দিল সায়রের। শেষ কথাটা তাকে বলতেই হবে। কান্নাধরা গলায় বলতে থাকে, আমার আগের দিনের কথাগুলোর জন্য আমি স্যরি, উইথড্র করছি সমস্ত কথা। যত হাজারবার 'স্যরি' চাইতে বলবেন, চাইব। এই কাণ্ড যেন আর কোনওদিন করতে না দেখি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সায়র। জয়িতার দুচোখের কোনা ডিঙোল জল, ফোঁটা দু'টো কোথাও সঞ্চয় করে রাখতে পারলে বড় ভালো লাগত জয়িতার। বুকটা ভরে যাচ্ছে আনন্দে। সায়র আর একটু সময় থাকল না কেন?

খানিক বাদেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো কেবিনে ঢুকল দেবাংশু। বেডের কাছে এসে বিষম বিস্ময়ে জানতে চাইল, হঠাৎ মাথায় এসব ঢুকল কেন?

স্মিত হাসি ফুটে উঠল জয়িতার ঠোঁটে। উত্তর না পেয়ে দেবাংশু চলে গেল অন্য পয়েন্টে, তোমাকে এখনই ভালো নার্সিংহোমে শিফট করার ব্যবস্থা করছি। এটা কোনও নার্সিংহোম! সবই ডেলিভারির পেশেন্ট। বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার জন্যই আসে।

—ভালোই তো, আমারও কেমন জানি বাচ্চা হয়েছে মনে হচ্ছে। মাঝেমাঝেই সদ্যোজাতর কান্না শুনতে পাচ্ছি। কান্নাও যে কত আনন্দের হতে পারে, এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না!

দুশ্চিন্তা ঘনাল দেবাংশুর মুখে। ভাবছে, প্রলাপ। ঠোঁটের হাসি

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সারামুখে ছড়িয়ে জয়িতা বলল, আমার ছেলে হয়েছে। কিছু বুঝলে? সায়র এসেছিল দেখতে। খুব বকাবকি করে গেল। বলে গেল, আর কখনও যেন এমন কাণ্ড না করি।

BALLYGUNGE INSTITUTE LIBRARY

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ জানুয়ারি ১৯৬১, হুগলির উত্তরপাড়ায়। পিতৃপুরুষ বিহারে প্রবাসী। মাতৃবংশ বাংলা দেশের দিনাজপুরে। স্কুল-কলেজের পাঠ উত্তরপাড়ায়। এ ছাড়াও ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এখন একটি ফটোপ্রিন্টিং সংস্থার কারিগরি বিভাগের প্রধান। ছাত্রজীবনে লেখালিখির শুরু। 'দেশ' পত্রিকায় পাঠানো প্রথম গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর বৃহত্তর পাঠক মহলে সমাদর লাভ।

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনার জন্য ১৯৯৯ সালে আনন্দ স্নোসেম শারদ অর্ঘ্য, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ছোটগল্প রচনার জন্য ২০০৩ সালে আনন্দ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স শারদ অর্ঘ্য এবং শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প রচনার জন্য ২০০৬ সালে ডেটল-আনন্দবাজার শারদ অর্ঘ্য পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া ১৯৯৭-এ পেয়েছেন গল্পমেলা পুরস্কার। ২০০১-এ সাহিত্যসেতু পুরস্কার, ২০০৫-এ বাংলা আকাদেমি থেকে সুতপা রায়চৌধুরী স্মারক পুরস্কার, ২০০৭-এ শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ স্মারক পুরস্কার, ২০১৩ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সম্মান।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner

মা কি জানতে পেরে গিয়েছিল বাবার জীবনে দ্বিতীয় নারীর কথা? অথবা জয়িতা নাগই নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন মাকে! শরীরের ওপর অযত্ন করে মা হয়তো স্বেচ্ছায় জীবন থেকে সরে গেল। সদ্য মাতৃহারা সায়র এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। জেগে ওঠে হত্যাস্পৃহা। জয়িতা নাগকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। রুচিশীল, স্নিগ্ধ পারিবারিক মণ্ডলে বড় হওয়া সায়র কি পারবে হত্যার মতো কাণ্ড ঘটাতে?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned by CamScanner